শৈলবালা ঘোষজায়ার কথাসাহিত্য (নির্বাচিত): একটি মূল্যায়ন

যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের অধীনে পিএইচ. ডি উপাধি প্রাপ্তির শর্ত পূরণের উদ্দেশ্যে উপস্থাপিত গবেষণা সন্দর্ভ

গবেষক

রিঙ্কু রায়

বাংলা বিভাগ, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়

তত্ত্বাবধায়ক

ড. পায়েল বসু

বাংলা বিভাগ, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়

বাংলা বিভাগ

কলা অনুষদ

যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়

কলকাতা- ৩২

২০২৫

শৈলবালা ঘোষজায়ার কথাসাহিত্য (নির্বাচিত): একটি মূল্যায়ন

Certified that the Thesis entitled

শৈলবালা ঘোষজায়ার কথাসাহিত্য (নির্বাচিত) : একটি মূল্যায়ন

Submitted by me for the award of the Degree of Doctor of Philosophy in Arts at Jadavpur University is based upon my work carried out under the Supervision of Dr. Payel Basu

And that neither this Thesis nor any part of it has been submitted before for any degree or diploma anywhere / elsewhere.

Countersigned by the

Supervisor: Payel Basu

Dated: 31.07.25

Assistant Professor
Bengali Department
Jadavpur University
Kolkata-700 032

Rinku Roy

Candidate:

Dated: 31.07.2025

মুখবন্ধ

কথা সাহিত্য তার নামের মত প্রকৃতই স্তরে স্তরে কথারই সাজ। বিভিন্ন চরিত্রের মুখে সে সাজ যেন আরও রঙিন হয়ে ওঠে। এই সাজের সৌন্দর্য এতই গভীর যে এর মধ্যে একবার ডুব দিলে কাহিনী গতিময়তা লাভ করে। আর এই কথার বুননে কাহিনী জুড়লেই আসে এরপর কি হবে এমন ধরনের ভাবনা। যার সূত্র ধরেই থাকে শুরু থেকে শেষে পৌঁছানোর যাত্রা এবং থাকে রসাস্বাদন।

এইরকম ভালোলাগার উপর ভর করেই শৈলবালা ঘোষজায়ার কথাসাহিত্য পড়ে নেওয়া। পরবর্তীতে পি এইচ ডি তে ভর্তি হয়ে গবেষণা অভিসন্দর্ভটি লেখার সুযোগ পেয়ে "শৈলবালা ঘোষজায়ার কথাসাহিত্য (নির্বাচিত): একটি মূল্যায়ন" এই বিষয়টি নির্বাচন করেছি।

তাঁর রচনায় সময়, সমাজ ও সমাজের ভিতরে থাকা নানান সমস্যার কথা দেখা যায়। মেয়েদের শিক্ষা লাভ, সাবলম্বী হওয়া ও সেক্ষেত্রে নানান বাধার সম্মুখীন হওয়া, জাত পাত সমস্যা, নারী হরণ, সতীত্ব নষ্ট হওয়ার মত ঘটনা, ধর্মগুরু জাতীয় মানুষের মানবিক অবক্ষয়, প্রভাবশালী মানুষের কুকর্মচাপা পড়ে যাবার ঘটনা, মেয়েদের উপর হওয়া নির্যাতন ইত্যাদি নানান দৃশ্য তাঁর রচনায় লক্ষ্য করা যায়। যেগুলি পরবর্তীতে অভিসন্দর্ভের বিভিন্ন অধ্যায়ের বিশ্লেষণ অংশে বিস্তারিতভাবে জানাতে পারব।

গবেষণার কাজ করতে গিয়ে নানা ভাবে নানা জনের সাহায্য পরামর্শ পেয়ে উপকৃত হয়েছি। এক্ষেত্রে প্রথমে আমি আমার বিভাগকে ধন্যবাদ জানাতে চাই। আমার তত্ত্বাবধায়ক ড.পায়েল বসু দিদিকে জানাই আন্তরিক ধন্যবাদ। গবেষণা পদ্ধতির নানান নিয়মকানুন বুঝিয়ে দেওয়া থেকে শুরু করে বিভিন্ন বিষয়ে তিনি আমাকে সাহায্য করেছেন। এছাড়াও গবেষণা কাজটি সম্পন্ন হতে ছোটো বড় নানান বিষয়ে যাদের কাছে সাহায্য পেয়েছি সকলকে আমার কৃতজ্ঞতা জানাই। সর্বোপরি সম্মান ও ভালোবাসা জানাই আমার মা, বাবা এবং ছোট ভাইকে তাদের সাহায্য ও পাশে থাকা ছাড়া এ কাজ আমার সম্পন্ন হওয়া সম্ভব ছিল না।

আমার এই গবেষণার ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় গ্রন্থ ও তথ্য সংগ্রহের কাজে আমাদের বিভাগীয় গ্রন্থাগার, বিশ্ববিদ্যালয়ের কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগার এছাড়াও জাতীয় গ্রন্থাগার (কলকাতা) থেকে সাহায্য পেয়েছি। তাই এই সমস্ত প্রতিষ্ঠানগুলির প্রতি আমার কৃতজ্ঞতা রইল।

রিঙ্কু রায়

গবেষিকা, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়

গবেষণা অভিসন্দর্ভের গৃহীত পদ্ধতি

আমি আমার গবেষণা কর্মটি সম্পন্ন করতে গিয়ে ভূমিকা থেকে সিদ্ধান্তে পৌঁছানো পর্যন্ত যে পদ্ধতি অবলম্বন করেছি তা হল বর্ণনামূলক পদ্ধতি। ভূমিকা, মূল আলোচনা-চারটি অধ্যায়, উপসংহার ও গ্রন্থপঞ্জি এই চার পর্বে গবেষণাপত্রটি সাজানো হয়েছে। গবেষণাপত্রটি আলোচনা সূত্রে তথ্যগত সাহায্যের জন্য প্রথম পর্যায়ে প্রাথমিক উপাদান উপন্যাস ও ছোটগল্প সংগ্রহ করা হয়েছে যা এই অভিসন্দর্ভে আকরগ্রন্থ হিসাবে ব্যবহৃত হয়েছে। সহায়ক উপাদান সংগ্রহের ক্ষেত্রে বিভিন্ন সমালোচনামূলক গ্রন্থ, পত্র পত্রিকা ও বৈদ্যুতিন মাধ্যম থেকে প্রাপ্ত তথ্য ব্যবহার করা হয়েছে। সমগ্র গবেষণাপত্রটি অভ্র, কালপুরুষ ১৪ ফন্টে মুদ্রিত হয়েছে। শিরোনামের ক্ষেত্রে ১৬ ফন্ট ব্যবহার করা হয়েছে। গ্রন্থপঞ্জি ও তথ্যসূত্রের ক্ষেত্রে ১২ ফন্ট ব্যবহার করা হয়েছে। গ্রন্থপঞ্জির তালিকা নির্মাণের ক্ষেত্রে এ পি এ স্টাইল অনুসরণ করা হয়েছে। এছাড়াও বানান এর ক্ষেত্রে পশ্চিমবঙ্গ বাংলা একাদেমির বানান বিধি মেনেই কাজ করা হয়েছে। এইভাবেই এই কয়েকটি নিয়ম মেনেই আমার গবেষণার কাজটি সমাপ্ত হয়েছে।

সূচিপত্র

অধ্যায়	পৃষ্ঠা
ভূমিকা	১-৫
প্রথম অধ্যায়- লেখিকার ব্যক্তিজীবন ও দেশ-কাল-পটভূমি	৬-৫১
দ্বিতীয় অধ্যায়- সাহিত্য কৃতির দুই ধারা	৫২-১৫৪
তৃতীয় অধ্যায়- শৈলবালা ঘোষজায়ার রচনার গদ্যশৈলী	১৫৫-২৫৫
চতুর্থ অধ্যায়- সমকালীন মেয়েদের লেখালেখির জগৎ ও শৈলবালা ঘোষজায়া	২৫৬-৩১৮
উপসংহার	৩১৯-৩২৩
গ্রন্থপঞ্জি	৩২৪-৩২৯

ভূমিকা

সাহিত্যের নানা ধারার মধ্যে কথা সাহিত্য হল অন্যতম। তার গঠন, বিষয় ইত্যাদি নিয়ে নানা রকম কাজকর্ম হয়েই চলেছে। মানব জীবনের দর্পণই হলো সাহিত্য। এই কথা সাহিত্যের মধ্য দিয়ে মানব জীবনের টুকরো টুকরো ছবি ফুটে ওঠে বিভিন্ন গল্প উপন্যাসের বিষয়ের আনাচে-কানাচে।

বাংলা কথা সাহিত্যের একজন অনুরাগী পাঠক হিসাবে শৈলবালা ঘোষজায়ার লেখা কয়েকটি গল্প পড়তে গিয়ে আমার শৈলবালা ঘোষজায়ার কথাসাহিত্যের প্রতি আগ্রহ তৈরি হয়। সেই সূত্রেই ওঁনার সাহিত্য সম্পর্কে বিস্তারিতভাবে জানতে ইচ্ছে হয়। তারপর পি এইচ ডি-এর গবেষণা অভিসন্দর্ভটি লেখার সুযোগ পেয়ে আমি "শৈলবালা ঘোষজায়ার কথা সাহিত্য (নির্বাচিত): একটি মূল্যায়ন"- এই বিষয়টি নির্বাচন করেছি। তাঁর রচনা পাঠ করে সহজেই বোঝা যায় তিনি নানান সময়ে যেসব অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করেছেন তাই প্রতিফলিত হয়েছে তার বিভিন্ন লেখায়। তাঁর সৃষ্টি করা চরিত্ররা সবই তাঁর নিজের চেনা, জানা বাস্তবের পটভূমি থেকে তুলে আনা। তাঁর রচনা গুলি সময়োপযোগী ও তাৎপর্যপূর্ণ। কিছু কিছু লেখা সময়ের হিসাবে তাঁর সময়ের হলেও বর্তমানেও আমরা যেন সমাজের মধ্যে সেসব ছবি মাঝেমধ্যে উঠে আসতে দেখতে পাই।

শৈলবালা ঘোষজায়ার রচনার একটা বড় অংশ জুড়ে প্রতিকূলতার মধ্যে মেয়েদের শিক্ষা লাভের জন্য কি কি বাধার মধ্যে দিয়ে যেতে হচ্ছে সেই রকম ছবি, শিক্ষার মাধ্যমে সচেতনতার বোধ, সংসারে আবদ্ধ নারীর নিয়মমাফিক জীবন যাপন এবং পুণ্যের জয়, পাপের দন্ড ইত্যাদি বিষয় বিভিন্ন চরিত্রের মধ্যে দিয়ে দেখা যায়।

এর পাশাপাশি জাতপাত প্রসঙ্গ ও জাতির ভিত্তিতে পেশা নির্বাচন, ধর্মানুষ্ঠানের সাথে যুক্ত মানুষের দুর্মতি, স্বার্থপরতা, ভন্ডামী, ডাকাতি, সামাজিক কুসংস্কার, সাধারণ গৃহস্থ জীবনের ছবি, বিজ্ঞান নির্ভর মানসিকতা, নারী হরণ, সতীত্ব নষ্ট ও খুনের দৃশ্য এবং সমাজে পুলিশের শাসনের প্রসঙ্গ প্রভৃতি দেখা যায়। তার এই উপলব্ধি বর্তমান সময়েও তাৎপর্যবাহী। এখন আমরা তার রচনাগুলি (নির্বাচিত) বিশ্লেষণের মাধ্যমে বিষয়গুলিকে দেখতে পাব। আর এই জন্যই তার লেখা রচনায় বিষয় ও সময়কে বুঝে নিতেই আমরা বেছে নিয়েছি এই গবেষণা অভিসন্দর্ভটিকে।

আলোচ্য বিষয়টিকে যেভাবে অধ্যায় ভিত্তিক সাজিয়েছি তা হল- ভূমিকা, লেখিকার ব্যক্তিজীবন ও দেশ-কাল-পটভূমি, সাহিত্যকৃতির দুই ধারা, শৈলবালা ঘোষজায়ার রচনার গদ্যশৈলী, সমকালীন মেয়েদের লেখালেখির জগৎ ও শৈলবালা ঘোষজায়া, উপসংহার ও গ্রন্থপঞ্জি।

এবার এই সমস্ত অধ্যায় গুলি সম্পর্কে সংক্ষেপে বর্ণনা দেবার চেষ্টা করব এই প্রসঙ্গে প্রথমেই 'লেখিকার ব্যক্তিজীবন ও দেশ-কাল-পটভূমি' নামের এই অধ্যায়ের বিষয় সংক্ষেপে আলোচনা করব। এই অধ্যায়ের যে সমস্ত বিষয়গুলি দেখিয়েছি তা হল- রাজনৈতিক পরিসর- ওই সময়ের রাজনীতির বিভিন্ন দিক। রাজনৈতিক ক্ষেত্রে কি কি ঘটছে, মেয়েরা এই ক্ষেত্রে কতটা সক্রিয় ভূমিকা নিচ্ছে এই সমস্ত বিষয়গুলি দেখে নেওয়ার চেষ্টা করব। এছাড়াও সমাজের মধ্যে ঘটে যাওয়া নানান বিষয়গুলিও দেখে নেবার চেষ্টা করব। এখানে হিন্দু মুসলিম দ্বন্দ্ব ও স্বধর্ম প্রতিষ্ঠার তাগিদ লক্ষ করা যায়, শিক্ষায় কার প্রাধান্য বেশি তা হিন্দু-মুসলমান ও নারী–পুরুষ নির্বিশেষে দেখানোর চেষ্টা করেছি। এই শিক্ষাকে কেন্দ্র করে মুসলিমদের এগিয়ে যাওয়ার মতো ঘটনা দেখে

হিন্দুদের ঈর্ষা বোধের বিষয় ও এটাকে নিয়ে হিন্দুদের নিজেদের দুর্বলতা প্রকাশ দেখা গেছে। এছাড়াও ধর্ম নিয়ে বিদ্বেষকে কেন্দ্র করে কিছু মানুষের স্বার্থ সিদ্ধি, কিছু মানুষের হয়রানির ছবি দেখা যায়। সঙ্গে লিগের প্ররোচনা দান যার ফলস্বরুপ দাঙ্গার ভহাবহ পরিস্থিতি, বহু মানুষের মৃত্যু বিছানো পথে ও স্বজন ও আশ্রয় হারানোর ইতিহাস দেশভাগ প্রভৃতির বর্ণনা।

বিশ শতকের শুরুতে মেয়েদের জীবনচর্যা কেমন, কর্মসংস্থান ও আন্দোলনে অংশগ্রহণের ক্ষেত্রে তারা বাইরে বের হচ্ছে কিনা ইত্যাদি প্রসঙ্গ। শিক্ষার উপলব্ধি ও বিকাশ, চেতনার জাগরণে নারীদের ভূমিকা, সমাজের মধ্যে থাকা সমাজবিধান ও যার প্রয়োজনের উপর ভিত্তি করে আইনের গুরুত্ব কতটা তা দেখা, শাসনতন্ত্রে নারীর স্থান প্রভৃতি প্রসঙ্গ দেখানোর চেষ্টা করা হয়েছে।

কৃষি শিল্প সংস্কৃতির পরিচয় বর্তমান, ওই সময়কার অন্যান্য সাহিত্যের বিষয় ও ভাবনা কেমন তার পরিচয় প্রসঙ্গ বর্ণনায় থাকবে। এর সঙ্গেই লেখিকাকে জেনে নেওয়ার তাগিদে লেখিকার জীবনের নানান বিষয় নিয়ে আলোচনা আছে। এই অধ্যায়ের সম্পূর্ণটা জুড়ে উপরে উল্লেখ করা বিষয়গুলি দেখা যাবে সম্পূর্ণ অধ্যায়ের আলোচনার অংশে।

এরপর 'সাহিত্যকৃতির দুই ধারা' নামের এই অধ্যায়ের যে দুটি মূলভাব তা হল- (ক) শিক্ষামূলক রচনা ও (খ) সমাজকেন্দ্রিক রচনা

এখন প্রথমে শিক্ষামূলক রচনার মধ্যে কি কি বিষয় দেখানো হয়েছে তা সংক্ষেপে আলোচনা করব। এই অংশে মেয়েদের লেখালেখির জগতে আসার প্রসঙ্গ, নারীবাদী ভাবনার বিষয় ও শিক্ষালাভের প্রসঙ্গ দেখানো হয়েছে। এখানে শিক্ষার প্রসঙ্গ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। শিক্ষালাভ করতে মেয়েদের কত বাধা পার করতে হয় তার ছবি, শিক্ষার

মাধ্যমে সচেতনতার বোধ, মেয়েদের লেখালেখি করলে এক ঘরে করে দেওয়া ও জাত যাওয়ার প্রসঙ্গও দেখা যায়। এছাড়াও নারীর প্রতিবাদ, যুক্তিপূর্ণ কথা বলা, স্বাবলম্বী হওয়া এ সমস্ত বিষয় দেখতে পাওয়া যায় এর পাশাপাশি নারী শিক্ষিত কর্মজীবী হলেও তার ক্ষেত্রেও নানারকম সমস্যায় পড়ার ঘটনা দেখা যায়। এ সমস্ত কিছু বিষয় হলো শিক্ষামূলক রচনার অংশ।

এরপর সমাজ কেন্দ্রিক রচনা এই অংশে সমাজের নানান বিষয় দেখা যায়। এখানে জাতপাত প্রসঙ্গ, জাতির ভিত্তিতে পেশা নির্বাচন, ধর্মানুষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত মানুষের দুর্মতি, সমাজে ধর্মগুরু স্থানীয় মানুষের কথা মতো চলে বিপদে পড়ার ঘটনা, ডাকাতির প্রসঙ্গ, কুসংস্কার, সাধারণ জীবন যাপন, পাহাড়ি মানুষের জীবনধারা, বিজ্ঞান নির্ভর মানসিকতা, নারী - হরণ, সতীত্ব নষ্ট ও খুনের দৃশ্য, টাকা দিয়ে জমিদার শ্রেণির মানুষের কুকর্ম চাপা পড়ে যাবার ঘটনা, ইমানদারির প্রসঙ্গ, পাপের দণ্ড ও পুণ্যের জয় এবং সমাজে পুলিশের শাসনের প্রসঙ্গ প্রভৃতি দেখা যায়। এই সমস্ত বিষয়গুলি রচনার বিশ্লেষণের মাধ্যমে মূল অধ্যায় বিস্তারিতভাবে দেখা যাবে।

পরবর্তী ‘শৈলবালা ঘোষজায়ার রচনার গদ্যশৈলী’ - অধ্যায়ে ভাষা, মেয়েলি শব্দের ব্যবহার, কথক, কথন, মুখভাষা চরিত্র অনুযায়ী কতটা যথাযথ, শব্দদ্বিত্বের ব্যবহার, প্রশ্ন-উত্তর ধরনের গদ্য আছে কিনা দেখা, ছড়ার ব্যবহার, প্রবাদের ব্যবহার, কবিতা ধরনের গদ্যের ব্যবহার হচ্ছে কিনা দেখা, সমান্তরাল প্যাটার্নের গদ্যের ব্যবহার ইত্যাদি বিষয়গুলিকে মূল পাঠ থেকে দেখানোর চেষ্টা করেছি এই অধ্যায় বিস্তারিত অংশে।

পরবর্তী ‘সমকালীন মেয়েদের লেখালেখির জগৎ ও শৈলবালা ঘোষজায়া’ নামের অধ্যায়ে নারী প্রগতির ইতিহাসে স্মরণীয় কয়েকজন নারীর কথা, যাদের হাত ধরে মেয়েরা

লেখার জগতে প্রেরণা পেয়েছিল ও আত্মপ্রকাশ করার পথ পেয়েছিল। এছাড়াও শৈলবালা ঘোষজায়ার সমকালীন কয়েকজন লেখিকাদের পরিচয় ও তাঁদের লেখালেখির বিশ্লেষণে, তাঁদের অভিজ্ঞতা ও উপলব্ধির বর্ণনার মধ্যে দিয়ে ভাবনাগত তফাৎটা কোথায় সেই দিকটা দেখানোর চেষ্টা করেছি। এ প্রসঙ্গে লেখিকার সমকালীন কয়েকজন লেখিকার কথা উল্লেখ করা হয়েছে। বেগম রোকেয়া, অনুরূপা দেবী, নিরুপমা দেবী, জ্যোতির্ময়ী দেবী, সীতা দেবী, শান্তা দেবী, আশালতা সিংহ তাঁদেরই মধ্যে উল্লেখযোগ্য।

এছাড়াও গিরিবালা দেবী, ইন্দিরা দেবী, স্বর্ণকুমারী দেবী উল্লেখযোগ্য। তবে এতজন নামের উল্লেখ করলেও আলোচনার জন্য এখানে কয়েকজনকে বেছে নিয়েছি। এভাবেই এই অধ্যায়ের ভাবনাগত দিক থেকে কে কোন দিককে প্রাধান্য দিচ্ছে এবং মতামতের তফাত কেমন সেই বিষয়টি দেখানোর চেষ্টা করেছি এই অধ্যায়ের বিস্তারিত অংশে। এছাড়াও সব শেষে থাকছে উপসংহার ও গ্রন্থপঞ্জি অংশ।

প্রথম অধ্যায়

লেখিকার ব্যক্তিজীবন ও দেশ-কাল-পটভূমি

অনন্ত বিস্তৃত এই কথা সাহিত্যের জগৎ, যা নিয়ে পরীক্ষা নিরীক্ষার শেষ নেই। কথাসাহিত্যের পরতে পরতে অর্থাৎ গল্প-উপন্যাসের ক্যানভাসে মানব সমাজ ও জীবনের কথা উজ্জ্বল ভাবে ফুটে ওঠে দর্পণের মতো। এই গল্প-উপন্যাসের বিষয় ও বৈচিত্র বুঝে নেওয়ার চেষ্টায় শৈলবালা ঘোষজায়ার কথাসাহিত্য আমাদের আলোচ্য।

বিশ শতকের প্রথমার্ধে প্রসিদ্ধ অন্যান্য লেখিকাদের মতো শৈলবালা ঘোষজায়ার নামও বাংলা সাহিত্যের সঙ্গে জুড়ে আছে, তবে সেই ভাবে প্রচার পাননি তিনি। শৈলবালা ঘোষজায়ার জন্ম ১৮৯৪ খ্রিষ্টাব্দে চট্টগ্রামের কক্সবাজারে। তাঁর পিতা কুঞ্জবিহারী নন্দী ছিলেন সেনাবাহিনীর অ্যাসিস্ট্যান্ট সার্জন। মা হেমাঙ্গিনী দেবী, তিনি সম্পর্কে শ্রী অরবিন্দ ঘোষের খুড়তুতো বোন ছিলেন, অর্থাৎ ঋষি অরবিন্দ হলেন শৈলবালার মামা। দাদা অশ্বিনী কুমার নন্দী ছিলেন সেনা বিভাগের একজন ডাক্তার। চাকরী থেকে অবসর নিয়ে তাঁর পিতা বর্ধমানে বসবাস করতে শুরু করেন। সংস্কার, সামাজিক প্রথা, রক্ষণশীলতা না থাকায় পরিবার ছিল পড়াশোনার অনুকূল, কোনোরকম বাধা পরিবার থেকে আসেনি, এখানে খোলামেলা পরিবেশে বিচরণ করার সুযোগ পেয়েছিলেন লেখিকা। তিনি বর্ধমান রাজ বালিকা বিদ্যালয়ে পড়াশুনা করেছিলেন। মাত্র ১৩ বছর বয়সে বর্ধমান জেলার মেমারি গ্রামে এক বিশাল একান্নবর্তী পরিবারে, নরেন্দ্রমোহন ঘোষের সঙ্গে বিবাহ হয়ে যায় ১৯০৭ খ্রিষ্টাব্দে (১৩১৪ বঙ্গাব্দে) এবং সেই সময় স্বামী নরেন্দ্রমোহন ঘোষ ইউনান সাহেবের হোমিও কলেজে হোমিওপ্যাথি বিষয়ে পড়াশোনা করতেন। এই বিবাহ সূত্রে লেখিকার সাহিত্য সাধনায় প্রতিকূলতা আসে। বিদ্যালয়ের পাঠ এইখানেই শেষ করতে হলেও পিতার অনুকূল্যে আগে থেকেই তাঁর সাহিত্যরুচি গড়ে উঠেছিল। অবসরপ্রাপ্ত পিতাকে বঙ্কীমচন্দ্র, হেমচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের বই পড়ে শোনাতে হত, পিতা মারা যাবার পর বড় ভাইও পরাশোনায় সাহায্য করেছিলেন তাঁকে। শৈলবালার শৈশব ও বাল্য বয়সের শিক্ষালাভ

ঘটেছে বর্ধমান রাজ বালিকা বিদ্যালয় থেকে। তাঁর লেখা 'পাঠশালার স্মৃতি' নামক লেখা থেকে তাঁর স্কুল, শিক্ষালাভ, ছাত্রীজীবনে সততার ছবি দেখা যায় শিক্ষিকার শৈলবালার উপর ভরসা থেকে। তিনি লিখছেন-

"এদেশের তথাকথিত পাঠশালার গুরুমহাশয়দের স্মৃতি,-অনেক ছাত্রছাত্রীর মনকে বুড়া বয়সেও ক্লান্ত করিয়া তোলে। কিন্তু সৌভাগ্যবশে বর্ধমান রাজবংশের বাদান্যতায় আমরা শৈশবে যে পাঠশালায় পড়িবার সুযোগ পাইয়াছিলাম,-সেখানকার সুমধুর স্মৃতি আজও আমার মনকে শ্রদ্ধাবহ আনন্দ মাধুর্যে পরিপূর্ণ করিয়া রাখিয়াছে।" ১

এখানে লেখিকার বিদ্যালয়ের প্রতি আবেগের ছবি দেখা যায়। এখান থেকে তাঁর পড়াশোনার প্রতি একাগ্রতার কথা ও সত্যিকথা বলার দৃশ্য থেকে তাঁর সৎ মানসিকতার পরিচয় পাওয়া যায়। এছাড়াও তিনি যখন লেখেন-

"আমার পিতৃদেব কথায় কথায় আমাদের উপদেশ দিতেন, 'খুন করে সত্যস্বীকার করে ফাঁসি যেও। তাতে আমি শান্তি পাব। কিন্তু মিথ্যা বলে প্রাণ বাঁচিও না। তাহলে দুঃখিত হব।" ২

এইরকমই সুমধুর কথায় তাঁর সততার প্রতি আসক্তি দেখা যায়। তবে এতো গেল সুন্দর শৈশবের পঠনপাঠনের স্মৃতি। এই সমস্ত কিছুতে বিবাহ পরবর্তী জীবনে কিছুটা ছেদ আসে। জানা যায় বিবাহের পর সংসারের সমস্ত কাজ করে রাতে লুকিয়ে লণ্ঠনের আলোয় লেখালিখি করতেন, তাঁর স্বামী, দু-একজন দেবর ও ভাসুরপো তাঁর পড়াশোনা ও লেখালিখিতে তাঁকে সাহায্য করতেন। তাঁর প্রথম উপন্যাস 'সেখ আন্দু'-র পাণ্ডুলিপি তাঁর স্বামী 'প্রবাসী'র দপ্তরে পৌঁছে দিতেন। এই প্রবাসী পত্রিকার হাত ধরেই শৈলবালা ঘোষজায়ার সাহিত্যের পথে যে যাত্রা তা যথেষ্ট সাড়া ফেলেছিল পাঠক সমাজে। এছাড়া তার 'বীণার সমাধি' বেগমবাহার গল্প প্রতিযোগিতায় দ্বিতীয় পুরস্কার পায়। কবিকঙ্কন চণ্ডীর বিষয়ে গবেষণামূলক প্রবন্ধ লিখে সরস্বতী উপাধি পান এবং নদিয়ার মানদমণ্ডলী তাঁকে

পরে 'সাহিত্য ভারতী' ও 'রত্নপ্রভা' উপাধি প্রদান করেন। এছাড়াও শৈলবালা সম্পর্কে একটু জানা যেতে পারে ১৯৭২ খ্রিষ্টাব্দের ২৬ নভেম্বর রবীন্দ্রসদনে দেওয়া ছয়জন লেখিকার সম্বর্ধনা অনুষ্ঠান থেকে। সেদিন ইউনিভার্সিটি উইমেন্স এসোসিয়েশন এর উদ্যোগে অনুষ্ঠানে ছয়জন লেখিকার আলোক চিত্র সহযোগে একটি বই প্রকাশিত হয়েছিল, সেখানে লেখিকাদের পরিচিতি দিয়েছিলেন মহাশ্বেতা দেবী। তিনি সেখানে শৈলবালা ঘোষজায়া সম্পর্কে যা বলেছিলেন, তা সবটা শৈলবালা ঘোষজায়ার চিঠিতে জানানো বিষয়েরই অংশ। লেখিকার সম্পর্কে বলতে গেলে যা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এইভাবেই নানান সম্মান ও মর্যাদা প্রাপ্তির মধ্যে দিয়ে তিনি সাহিত্যের পথে এক উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছেন।

এরপর যদি তাঁর বিবাহিত জীবনের দিকে চোখ রাখি সেখানে দেখা যাবে স্বামী মাত্র কয়েক বছর ডাক্তারি পড়ার পরই তাঁর বিবাহিত জীবনে অন্ধকার নেমে আসে ১৩২৬ বঙ্গাব্দে স্বামী নরেন্দ্রমোহনের উন্মাদ হয়ে যাওয়ার ঘটনায়। এই উন্মাদ অবস্থায় দীর্ঘ ১০ বছর ভোগেন তা তরুণী শৈলবালার জীবনের এক শোচনীয় অধ্যায়। এরপর ১৩৩৬ সালে তাঁর স্বামী মারা যান। এইভাবে ১৩ বছরে বিয়ে, কয়েকবছরের দাম্পত্য জীবন, ১০ বছর অসুস্থ স্বামী নিয়ে সংসার করা, চিকিৎসা করা এবং বৈধব্য জীবনে প্রবেশ ইত্যাদির দ্রুত সংযোজন শৈলবালা ঘোষজায়ার জীবনে নতুন মোড় নিয়ে আসে। নিঃসন্তান শৈলবালার জীবন পরিবারের নানান চাপ ও আঘাতে বিপর্যস্ত হতে থাকে। পরিজনদের প্রতারণা, নিরাপত্তাহীনতা, আর্থিক অনিশ্চয়তার মতো পরিস্থিতিতে ডুবে যাওয়া জীবনে লেখালিখি হল একমাত্র সম্বল। এভাবেই সাহিত্যে রেখে গেছেন অসংখ্য গল্প ও উপন্যাসের সম্ভার। এই সমস্ত রচনা থেকেও তাঁর বাস্তব জীবনের ছাপ লক্ষ্য করা যায়, যেমন 'তেজস্বতী' উপন্যাসে শিক্ষিতা তৃপ্তির জ্যোতিষ বিদ্যার উপর ভরসা যা শৈলবালার ভাবনারই

প্রতিফলন, এই জন্যই তাঁর পরিবারের কোন এক সদস্যের ঠিকুজি তৈরী করার কথা জানা যায় অরুণ মুখোপাধ্যায় সংকলিত ও সম্পাদিত শৈলবালা ঘোষজায়ার 'সেরা পাঁচটি উপন্যাস' নামক বইয়ের ভূমিকা অংশে ভারতী ঘোষের দেওয়া তথ্য থেকে।

তিনি ১৯৫৩-৫৪ সাল নাগাদ শ্বশুর বাড়ি ছেড়ে পুরুলিয়ার রামচন্দ্রপুরে শ্রীশ্রীবিজয়কৃষ্ণ আশ্রমে স্বামী অসীমানন্দ সরস্বতীর কাছে আশ্রয় নেন। এভাবেই জীবনের শেষ দিকের বেশ কিছুটা সময় এখানে কাটিয়েছিলেন। তবে ভারতী ঘোষের দেওয়া তথ্য থেকে জানা যায় আমৃত্যু আসানসোলে ভাসুরের বাড়িতেই ছিলেন তিনি। এছাড়াও জানা যায় বৈধব্য জীবনে নানান ছুঁৎমার্গ মেনে চলতেন তিনি। তাই নিজে রান্না করে খেতেন, চপ কাটলেট খাওয়াকে মদ মাংস খাওয়া ভাবতেন এবং ক্যাডবেরিতে খুব আপত্তি ছিল, সেই জন্য 'বিদেশী পাটালি' বলে ক্যাডবেরি দেওয়া হত তাঁকে। এইভাবেই তাঁর ব্যাক্তিজীবনের কিছু বিবরণ আমরা দেখতে পেলাম তাঁর রচনা ও উপরিউক্ত দেওয়া তথ্য থেকে। শৈলব্‌লা ঘোষজায়ার রচনা সংখ্যা ৫০ এর মতো, তা স্বত্বেও তিনি বাংলা সাহিত্যে একটা অনালোচিত দিক হয়েই রয়ে গেছেন, যা অত্যন্ত বেদনাদায়ক। 'শেখ আন্দু', 'নমিতা', 'মিষ্টি সরবত', 'মহিমাদেবী', 'সই', 'জন্মপরাধী', 'জন্মঅভিশপ্তা', 'মঙ্গল মঠ', ইমা্‌নদার', 'অবাক', 'রঙিন ফানুস', 'বিভ্রাট', 'অরু', 'গঙ্গাপুত্র', 'ঘৃণাহতা', 'তেজস্বতী', বিনীতাদি' ইত্যাদি উপন্যাস ও কিছু গল্পসঙ্কলন, নাটক, শিশুদের সাহিত্য এই সমস্ত কিছু মিলে বাংলা সাহিত্যকে তিনি সমৃদ্ধি দান করেছেন। এই দীর্ঘ যাত্রাপথ পার করে ১৯৭৪ খ্রিষ্টাব্দে তাঁর জীবন অবসান ঘটে।

শৈলবালা ঘোষজায়ার জন্ম ১৮৯৪ খ্রিষ্টাব্দে। তাঁর বেড়ে ওঠা ও লেখালিখি যে সময়ে, তখনকার রাজনৈতিক ও সামাজিক পরিস্থিতি কেমন ছিল তা আলোচনার মাধ্যমে

দেখে নেওয়ার চেষ্টা করব। ওই সময়ের সমাজ কোন ইঙ্গিত লেখিকার মনে জাগিয়েছে, কোন পরিস্থিতির চিহ্ন হৃদয়ে রেখাপাত করেছে তা নিয়েই সাহিত্য সম্ভারকে বুঝে নেওয়ার চেষ্টা করব। কারণ সময়ের পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে চিন্তা চেতনার বদলের ছাপ পড়ে সমাজ ও সাহিত্যে। তাই ওই সময় পর্বের সঙ্গে পরিচিতি স্থাপন দরকার কারন সাহিত্যই সমাজের দলিল।

বিশ শতকের শুরুর দশকে শৈলবালা ঘোষজায়ার বেড়ে ওঠা ও লেখালিখির শুরুয়াত। এই সময় ইতিহাস, রাজনীতি, সমাজে যে পরিবর্তন তা থেকে সাহিত্য আলাদা নয়, এই সমস্ত কিছুর অভিঘাত সাহিত্যেও পড়েছে। এই সময়ের রাজনীতির যে ধারা সেখানে আছে বহু ঘটনা। যুদ্ধকালীন পরিস্থিতি, নানান সভা ও চুক্তির পরিস্থিতি আর এর সঙ্গে জুড়ে থাকে স্বাধীনতা লাভের প্রসঙ্গ যা জাতির ইতিহাসে একটা বিরাট আধ্যায়ের সূচনা করে। ইতিহাসের এই সমস্ত বিষয় দেখে নেওয়ার চেষ্টা করব ইতিহাসের ঘটনা বিশ্লেষণের মাধ্যমে।

বাংলা সাহিত্য সূচনা লগ্ন থেকেই যুগ ও কালের সঙ্গে একই সূত্রে গাঁথা। যুগ ও কাল এর উপর নির্ভর করে গড়ে ওঠে পরিবর্তনের ধারা। তাই শৈলবালা ঘোষজায়ার জন্ম থেকে সাহিত্য সাধনা যে সময়কালের উপর গড়ে উঠেছে তাতে সমাজের কোন কোন বিষয় লেখিকার হৃদয়কে স্পর্শ করেছে তা আমরা দেখতে পাব, তার জন্যই এখন আলোচনা করে দেখে নেওয়ার চেষ্টা করব ওই সময়কাল এর রাজনৈতিক পরিমণ্ডল, সামাজিক প্রেক্ষাপট, সামাজ বিধান ও আইন ইত্যাদি বিষয়।

উনিশ শতকের শেষ ও বিশ শতকের শুরু এই সন্ধিক্ষণে জন্ম শৈলবালা ঘোষজায়ার। এক স্বাধীনতা আন্দোলনের আধ্যায়ে তাঁর জন্ম। এই জন্ম লগ্নেই বঙ্গে নারীর

উত্থান ও শিক্ষা আন্দোলনের নানান বিষয়ের শুরু যার সঙ্গে ওতপ্রোত ভাবে জড়িত মার্গারেট এলিজাবেথ নোবেল্ (ভগিনী/নিবেদিতা)। তিনি স্বদেশের ছেলেমেয়েদের মধ্যে বিপ্লবী চেতনা জাগিয়ে তোলার জন্য ১৮৯২ খ্রিষ্টাব্দে 'রাস্কিন স্কুল' স্থাপন করেন। তিনি যখনই প্রচলিত ধর্ম ও জীবন সম্পর্কে সংশয়ে পড়েন তখন ইংল্যান্ড গামী স্বামী বিবেকানন্দের বাণী শুনে তিনি মুগ্ধ হন এবং স্বামীজীর মৃত্যুর পর ভারতের মুক্তি আন্দোলনে অংশগ্রহন করেন। তাঁর স্বপ্ন ছিল অখণ্ড ভারতবর্ষ। ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনের আধ্যায়ে তিনি এক স্মরনীয় নাম। এর পাশাপাশি বাংলার নারী মুক্তির জন্য শিক্ষার উপযোগিতা বুঝিয়ে তিনি ছাত্রী আনতেন। নারী মুক্তির জন্য তাঁর দেখানো পথ খুবই গুরুত্বপূর্ণ। তাঁর দেখানো পথেই বাংলার নারীরা সাহস ও আত্মত্যাগের প্রেরনা পেয়েছে। অনেকে সামনে না এসেও আড়াল থেকে বিপ্লবীদের সাহায্য করে গেছেন। জাতীয় আন্দোলনের মূল স্রোতের সঙ্গে ওতপ্রোত জড়িয়ে থেকে বাংলার নারী তাদের গৌরবজনক ভূমিকা পালন করছেন। সরোজিনী নাইডু, নেলী সেনগুপ্তা, অরুনা আসাফ আলী, সুচেতা কৃপালনির মতো নেত্রী স্থানীয়া স্বাধীনতা সংগ্রামীর নাম ইতিহাসে মর্যাদার সঙ্গে উল্লিখিত আছে। এর পাশাপাশি উল্লেখযোগ্য নাম সরলাদেবী চৌধুরানী ইনিই সেই তেজস্বী নারী যিনি প্রথম বন্দেমাতরম সঙ্গীত গেয়ে স্বাধীনতা সংগ্রামীদের উদ্বুদ্ধ করেছিলেন। নারীশক্তিকে যথাযথভাবে দেশের মুক্তি আন্দোলনের উপযোগী করে তোলার জন্য তিনি বিশেষ কিছু কাজ করেছিলেন স্বদেশী আন্দোলনের সময় থেকেই। বাংলার নারীদের সাহায্য ছাড়া গণ- আন্দোলন ও বিপ্লবীদের আন্দোলন এত ব্যাপক হতে পারত না। সমস্ত শ্রেণীর নারীই সেদিন সাম্রাজ্যবাদী শোষকদের বিরুদ্ধে তাঁদের তীব্র প্রতিবাদ জানিয়েছেন, কোনোরকম ত্যাগ স্বীকার এর ভয়ে তাঁরা সেদিন তাদের পিছনে হঠে যায়নি। এই হল উনিশ শতকের শেষ দশকের অধ্যায়ের অল্প বিস্তর বর্ণনা।

এরপরে বিশ শতকের প্রথমার্ধ বিশ্ব ইতিহাস তথা ভারতের ইতিহাসে এক গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়। অসংখ্য রাজনৈতিক ঘটনার স্বাক্ষ্য ধারন করে আসছে এই অধ্যায়। এই শতকে ঘটা স্বাধীনতা আন্দোলনে ঔপনিবেশিক শক্তির স্বার্থ সিদ্ধি করার যে প্রয়াস তার থেকেই এই সময়ে নানান আন্দোলন, বিপ্লবী কার্যকলাপ ও নানান চুক্তির আবির্ভাব, এই সমস্ত কিছুর সমন্বয়ে এই অধ্যায় বৃহত্তর আকার ধারন করে যার প্রভাব সুদূর প্রসারী ও প্রতিক্রিয়াশীল। ইতিহাসের পটে আজও যে সমস্ত ঘটনা লিখিত আছে তাই দেখে নেওয়ার চেষ্টা করব।

বিশশতকের প্রথমার্ধ বিপ্লববাদের কাল হিসাবে পরিচিত এই বিপ্লব বাদের সূচনা উনিশ শতকের শেষের দিকে ১৮৯৭ সালে যখন মহারাষ্ট্রে চাপেকর ভায়েরা মিঃ র‍্যান্ড ও লেফটেন্যান্ট আয়ার্স্টকে হত্যা করেন তখন থেকেই। বরোদা থেকে অরবিন্দ ঘোষ প্রথমে বারীন্দ্র কুমার ঘোষ ও যতীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়কে কলকাতায় পাঠান বিপ্লবী দল গড়তে, পরে অরবিন্দ আন্দোলনের নেতৃত্ব গ্রহন করেন। এই প্রয়োজনেই কলকাতায় প্রথম আনুশীলন সমতি নামে একটি দল বিপ্লবী দের প্রয়োজনে প্রতিষ্ঠা হয় ২৪ শে মার্চ ১৯০২। পরে ঢাকায় পুলিনবিহারী দাসের নেতৃত্বে তা ব্যাপক প্রসার লাভ করে। পরে এল বঙ্গভঙ্গের ভাবনা এই ঘটনার সঙ্গে শুধু রাজনীতির সম্বন্ধই ছিল না, ছিল সমাজ, অর্থনীতি ও সংস্কৃতির যোগ। শুরু হল ১৯০৫ এ বঙ্গভঙ্গের ভাবনা। প্রথম বঙ্গভঙ্গের প্রস্তাব ইংরেজ সরকার ১৯০৩ খ্রিষ্টাব্দে দেয়। এই বঙ্গভঙ্গের ভাবনা সকলে মেনে নিতে পারেনি তাই কিছু প্রতিরোধ মূলক আন্দোলনও দেখা দিয়েছিল। এই আন্দোলন শুরুর দিকে পুরোপুরি অহিংস ছিল। প্রথমে এর বিরোধিতা করে অসংখ্য সভা সমিতি, মৌখিক প্রতিবাদে শান্তিপূর্ণ বিক্ষোভ ছিল। পরে কার্লাইল সার্কুলার জারি হওয়ার পর অ্যান্টি সার্কুলার সোসাইটি অবশ্য তরুন ছাত্রদের উত্তেজনাকে সংযত রাখতে পারেনি। যার ফলস্বরুপ

অরবিন্দ ঘোষ এর সম্পাদনায় যুগান্তর ও বন্দেমাতরম পত্রিকায় স্বরাজ্যের দাবি উচ্চারিত হল। সরকারের অত্যাচার, নিপীড়নে বিপ্লবীদের মধ্যে প্রতিবাদ যতই ভয়ংকর রূপ ধারন করল ততই আন্দোলন গণ আন্দোলনের রুপ নিতে লেগেছিল। ভারতের সঙ্গে সঙ্গে বাংলা দেশেও বিপ্লবী কার্যসিদ্ধির জন্য প্রতিষ্ঠিত হল আত্মোন্নতি সমিতি, সুহৃদ সমিতি, স্বদেশ বান্ধব সমিতি, ইত্যাদি। ১৯০৮ – ০৯ সালে ব্রিটিশ সরকার অনুশীলন সমিতি ও বিপ্লবী দল গুলিকে নিষিদ্ধ ঘোষণা করে। এর মধ্যে মানিকতলা বাগান বাড়ি বোমা নির্মাণ কারখানা, গোপনে পিস্তল সংগ্রহ, সাহেব নিধনের পরিকল্পনা, ভারতবর্ষ ও ভারতবর্ষের বাইরের বিপ্লবী কার্যকলাপ প্রভৃতি অন্তর্গত। এই সময় গান্ধীজীর নেতৃত্বে যখন অসহযোগ আন্দোলনের কর্মসূচী চলছে তখন যুগান্তর ও অনুশীলন দলের বিপ্লবীদের মধ্যে কেউ কেউ কংগ্রেসের মাধ্যমে সশস্ত্র বিপ্লবের ডাক দেবার কথা ভাবে। তবে নানা রকম বিক্ষোভ ও আন্দোলন মূলত পরিচালনা করত ভারতের জাতীয় কংগ্রেস। ১৮৮৫ তে এই জাতীয় কংগ্রেস দলের প্রতিষ্ঠা এবং নরমপন্থী যে ভাবনা সেটাকে কেন্দ্র করেই এর বিকাশ। ভারতের স্বাধীনতা লাভের জন্য ব্রিটিশ সরকারের যে সমস্ত রাজনৈতিক কর্মকাণ্ড ও ভারতের জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের বিরুদ্ধে যে দমন মূলক ব্যবস্থা এই সমস্ত কিছুর উপর উদার পন্থীরা বিমুখ হয়ে পড়ে। তারা সশস্ত্র বিপ্লবের দ্বারা সাম্রাজ্য বাদী ব্রিটিশ শাসনের উচ্ছেদ ঘটাতে চেয়েছিলেন। এই সশস্ত্র বিপ্লবকে কেন্দ্রকরে ঐতিহাসিকদের মধ্যে মতের মিল ছিল না। বিভিন্ন জন বিভিন্ন নামে দেগে দেন এই বিপ্লবকে। যাই হোক এই হল ঐ সময়কার পরিস্থিতি ও গুপ্ত সমিতির মাধ্যমে গড়ে ওঠা কার্যকলাপের পরিচিতি। এর পাশাপাশি ছিল ১৯০৫ এ বঙ্গভঙ্গ প্রতিরোধ এর বিষয়। যেখানে ছিল বিদেশি পন্য বর্জন, স্বদেশী কারখানা স্থাপন ও জাতীয় শিক্ষা প্রচার কে গুরুত্ব দেওয়ার মানসিকতা। রবীন্দ্রনাথের উদ্যোগে রাখি বন্ধন ও রামেন্দ্র- সুন্দর ত্রিবেদির প্রস্তাবে অরন্ধন এবং বিভিন্ন

সভা-সমিতি প্রতিবাদে মুখর ছিল সেদিন। এই সময় কংগ্রেসের মধ্যে দুই দলের প্রভাব দেখা দেয়। একদল বয়কট পন্থী তারা চরমপন্থী (একসট্রিমিষ্ট) আর যারা সরকার এর সঙ্গে সবরকম বিরোধ পরিহরণে রাজি তাঁরা নরমপন্থী (মডারেট) নামে পরিচিত। এইভাবে কংগ্রেসের মধ্যে দলাদলি চলছে দীর্ঘদিন। ১৯২০–১৯৪৭ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত গান্ধীজি সব গুলি দল উপদল কে নিয়ে চলার চেষ্টা করেন এবং লবন সত্যাগ্রহ আন্দোলন, আইন অমান্য আন্দোলন, ভারত ছাড়ো আন্দোলন প্রভৃতি আন্দোলনে অংশ গ্রহন করেন সক্রিয় ভাবে। তবে যাইহোক এতো আন্দোলনের মাধ্যমে সকলকে একত্রিত করতে পেরেছেন কিনা সে সংশয় থেকেই যায়। হরিপুরা কংগ্রেসের পর ত্রিপুরী কংগ্রেসের সভাপতির পদে সুভাষ চন্দ্র বসুকে নিয়ে নানান জল্পনা শুরু হয় যার ফলে সুভাষ চন্দ্রের দলত্যাগ করা আরও সহজ হয়ে যায়। এভাবে কংগ্রেসের ভাঙন শুরু হয়। জীবন সায়াহ্নে ১৯৩৯ সালে রবীন্দ্রনাথ তাই মনে করেছিলেন-

> "সমস্ত বাংলাদেশের সঙ্গে কংগ্রেসের বন্ধনে টান পড়েছে ছেঁড়বার মুখে।" ৩

আসলে এতো গেলো দলাদলির কথা পাশাপাশি ভারত বর্ষে ঘটে গেছে এমন ঘটনা যার প্রভাব অত্যন্ত ভায়াবহ। এ প্রসঙ্গে প্রথমেই আসি প্রথম বিশ্ব যুদ্ধের ঘটনায় (১৯১৪-১৯) যা ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামে এক নতুন দিকের সূচনা করে। ভারত ও ভারতবাসীর স্বার্থ জড়িত না থাকলেও ভারতবাসী এ যুদ্ধে যুক্ত হয়ে পড়ে বাধ্য হয়েই। যুদ্ধের যে ব্যায়ভার তা বহন করতে হয়েছিল ভারাতবাসীকেই। ভারত সমস্ত শক্তির মূল আধার, যেটা সাম্রাজ্য বাদী শক্তি ব্রিটিশ উপলব্ধি করতে পেরেছিল। ভারতের যা কিছু প্রাচুর্য খাদ্যশস্য, পণ্য, অর্থ–সম্পদ এবং মানব–সম্পদ সবকিছুর প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধী করতে পেরেছিল। পুর্বেই স্বাধীনতাকে কেন্দ্র করে যা আন্দোলনের কর্মসূচী হয়েছিল তাতে ব্রিটিশ সরকার কিছুটা বিব্রত হয়েছিলেন। ভারতবাসীর ক্ষেত্রে ব্রিটিশদের পক্ষে যোগদান অতটা

সহজ হবে না এটা তারা প্রচার চালায় এ যুদ্ধ গনতন্ত্রের যুদ্ধ। ভারতের সেক্রেটারি স্টেট কমান্ড সভায় ঘোষণা করে, ভারতে দায়িত্বশীল সরকার প্রতিষ্ঠা করার লক্ষ্যে তাদের এই পদক্ষেপ। মন্টেগু ঘোষণা করেন ভারতবাসী যাতে করে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত থেকে স্বায়ও শাসনের অধিকার পায় তাই বিবেচনা করে সরকারের নীতির প্রচলন হবে। এই কথা মাথায় রেখে তৎকালীন কংগ্রেসের নেতারা ভারতবাসী কে ইংরেজের সঙ্গে যুদ্ধে যোগদান করতে উৎসাহ দান করে। কিন্তু যুদ্ধের শেষে সমস্ত প্রতিশ্রুতি মিথ্যায় পর্যবসিত হল এবং ব্রিটিশ সরকার তাঁর স্বার্থ সিদ্ধি করল। এভাবেই ব্রিটিশ সরকারের প্রতি আস্থা হারিয়ে রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক উভয় কারণেই ব্রিটিশ সরকারের প্রতি ভারতবাসীর অসন্তুষ্টি আরও তীব্র আকার ধারন করেছিল।

এই পরিস্থিতিতে আর এক গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা হল আইরিশ সমাজ সংস্কারক অ্যানি বেসান্ত এর ভারতের রাজনীতিতে যোগদানের বিষয়। ১৯১৫ খ্রিষ্টাব্দে আয়ার ল্যান্ডের হোমরুল লিগের মডেলে ভারতে হোম রুল লিগ পরিকল্পনা করে ১৯১৬ খ্রিষ্টাব্দে হোম রুল লিগ প্রতিষ্ঠা করেন, যেটা ভারত ও ভারতের বাইরে সাড়া ফেলে। এখানে আন্দোলনের চাপে পড়ে ব্রিটিশ সরকার মন্টেগু চেম্‌স ফোর্ড সংস্কার সাধন করতে তৎপর হন। এই আন্দোলনের মাধ্যমে ভারতের বিভিন্ন এলাকার মানুষের গনচেতনা বাড়ে। যুদ্ধকালীন পরিস্থিতিতে জাতি যখন দিশেহারা এবং কংগ্রেসের পুরানো নেতৃত্ব যখন তাঁর কার্যকারিতা হারাচ্ছিল তখন বিপ্লবী নেতৃত্ব কিছুটা দানা বাঁধলেও লক্ষ্যে পৌঁছানো সন্দেহজনক হয়ে দাঁড়ায় তখনই ভারতীয় রাজনীতিতে আবির্ভাব ঘটেছে মোহনদাস করমচাঁদ গান্ধীর (১৮৬৯- ১৯৪৮)। স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাসে তাঁর আত্মত্যাগ জনগণকে এক আদর্শ পথে চালিত করে। ১৯১৯ খ্রিষ্টাব্দে গান্ধীজি রাওলাট সত্যাগ্রহের হাত ধরে সর্বভারতীয় রাজনীতিতে কাজ শুরু করেন।

প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পরে ভারতের জাতীয়তাবাদী আন্দোলন দমন করার জন্য নিপীড়নমূলক রাওলাট আইন তৈরীর কথা ভাবা হলে এই আইনের বিরুদ্ধে মানুষের নানান ভাবনাচিন্তা গড়ে ওঠে। এই পরিস্থিতিতে গান্ধীজি প্রথম সর্বভারতীয় ক্ষেত্রে সত্যাগ্রহ আন্দোলনের সিদ্ধান্ত নেয়। ১৩ এপ্রিল ১৯১৯ খ্রিষ্টাব্দে ঘটে যায় জালিয়ানওয়ালাবাগের হত্যাকাণ্ড। এই দুটি আন্দোলনের প্রতিবাদে দেশজুড়ে বিক্ষোভ, প্রতিবাদ, ধর্মঘট, শুরু হয়। এরপরে গান্ধীজি অসহযোগ আন্দোলন কর্মসূচির পরিকল্পনা করেন। এর নেতিবাচক দিক হল সরকারী খেতাব ও সম্মানসূচক উপাধি ত্যাগ, যার অন্যতম উদাহরণ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের নাইট উপাধি প্রত্যাখ্যান। এর সঙ্গে ছিল সরকার অনুমোদিত স্কুল-কলেজ বয়কট, বিচারালয় ও বিদেশী পন্য বর্জন। এছাড়া এর একটা ইতিবাচক দিক ছিল তা হল চড়কা ও তাঁতের পুনরুজ্জীবন, অস্পৃশ্যতা দূরীকরণ, হিন্দু-মুসলমান ঐক্য স্থাপন প্রভৃতি। ১৯২০ খ্রিষ্টাব্দে গান্ধীজির নেতৃত্বে গড়ে ওঠা অসহযোগ আন্দোলন ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনে গতি দান করেছিল। এই গতির প্রবাহমানতার বিশেষ কয়েকটি ধারা হল- ১) বামপন্থি দল ও গোষ্ঠীর উন্মেষ ২) রাজনৈতিক আন্দোলনের পাশাপাশি শ্রমিক আন্দোলনের ক্রমবিকাশ ৩) কৃষক আন্দোলনের ব্যাপ্তি।

পূর্বোক্ত প্রথম বিশ্ব যুদ্ধের ঘটনার পাশাপাশি ১৯১৭ খ্রিষ্টাব্দে রাশিয়ার বলশেভিক বিপ্লবের পর পৃথিবীর অন্যান্য দেশের মতো ভারতেও সমাজতান্ত্রিক ভাবধারার প্রভাব চোখে পড়তে লাগল। এ সময়ে রাশিয়ার সাম্যবাদী ভাবধারায় ভাবিত হয়ে বিশ্বব্যাপি শোষিত মানুষ বাঁচার জন্য লড়তে শেখে। এইভাবেই ভারতীয় আন্দোলনে বিক্ষুব্ধ সমাজ সাম্যবাদী ধারণাকে স্বাগত জানিয়েছিল।

১৯২০ খ্রিষ্টাব্দের জুলাই আগস্ট মাসে মস্কোতে কমিউনিস্ট ইন্টার ন্যাশানালের দ্বিতীয় কংগ্রেসের অধিবেশনে লেনিনের একটা উপনিবেশকেন্দ্রিক নিবন্ধ গ্রহন করা হয়। এখানে পরাধীন দেশের স্বাধীনতা প্রাপ্তির উপর গুরুত্ব দেওয়া হয়েছিল যার দ্বারাই ভারত অনুপ্রাণিত হয়ে সাম্রাজ্যবিরোধী আন্দোলনের ডাকে সাড়া দিয়েছিল। এই সময়েই ভারতীয় যুগান্তর দলের বিখ্যাত বিপ্লবী মানবেন্দ্রনাথ রায় (আসল নাম নরেন ভট্টাচার্য) ১৯২০ খ্রিষ্টাব্দের অক্টোবর মাসে রাশিয়ার তাসখন্দে ভারতীয় কমিউনিস্ট পার্টি গঠন করেন। পরে তার বিস্তার ভারতেও ঘটান। এইভাবে সাম্যবাদী ভাবধারায় অনুপ্রাণিত হয়ে সাম্রাজ্যবাদী আন্দোলন যাতে এগিয়ে যায় তাতে তিনি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিলেন।

এরপর কমিউনিস্ট গোষ্ঠী ১৯২০-১৯২৪ খ্রিষ্টাব্দের মধ্যে ভারতে বিস্তার লাভ করলে তাদের উপর দমনমূলক নীতি চাপিয়ে দেওয়ার চেষ্টা চলে তখনই চারিদিকে ছড়িয়ে থাকা কমিউনিস্ট গোষ্ঠীদের নিয়ে সর্বভারতীয় কমিউনিস্ট পার্টি গঠন করার উদ্যোগ নেওয়া হয়েছিল। ১৯২৫ খ্রিষ্টাব্দের ডিসেম্বর মাসে প্রথম সর্বভারতীয় কমিউনিস্ট সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। এইভাবেই বিপ্লবী, অসহযোগী, খিলাফতি, শ্রমিক ও কৃষক কর্মীরা রাজনৈতিক ও সামাজিক মুক্তির জন্য আন্দোলনে নেমে মুক্তির পথ সন্ধান করেছিলেন। তবে ১৯২৯-৩৫ খ্রিষ্টাব্দের মধ্যেই এই আন্দোলনের গতি ঝিমিয়ে পরে।

এরপর দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ, দাঙ্গা এসব হওয়ার আগে সমাজটাকে যদি একটু আলোচনার কেন্দ্রে আনি তাহলে দেখতে পাব কিভাবে এই পরিস্থিতির সম্মুখীন হয়েছিল ভারতবাসী। প্রথমেই বিশশতকের বাঙালি সমাজের দিকে চোখ রাখলে দেখতে পাওয়া যায় হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে দন্দ্বের বিষয়। তখনকার কোনো এক খবরের মাধ্যমে জানা মুসলিম জমিদারের প্ররোচনায় প্রতিমা বিসর্জনের সময় হিন্দুদের সঙ্গে দ্বন্দ্বের কারণে

শাস্তিস্বরূপ কারাদণ্ড হয়। তবে হিন্দুদের এ বিষয়ে বাক্যবাণ থাকলেও পরে ঘটনা আর বেশি এগোয়নি। এই ঘটনা দেখা দিয়েছিল ১৩ জানুয়ারী ১৮৫৭ তে। কিভাবে একটু একটু করে ধর্ম বিদ্বেষ জাগছে সেই বিষয়ে অবগত হওয়ার খাতিরেই বহু পূর্ববর্তী কয়েকটা ঘটনার উল্লেখ।

এর পাশাপাশি হিন্দু-মুসলিম দুই সম্প্রদায়ের মধ্যেই চলতে থাকে কে বেশি শ্রেয় তা বহিঃপ্রকাশের চেষ্টা। তবে এই প্রয়াস মুসলমানদের মধ্যে তীব্র ছিল। তাই জন্য তারা তাদের সমস্ত সংগঠনের আগে মুসলিম শব্দ ব্যবহার করত (যেমন দ্য স্পিরিট অফ ইসলাম)। হিন্দুদের এই প্রবনতা ছিল না তাইত তাদের সভার নাম ভারত সভা। স্বধর্ম শ্রেষ্ঠত্বের অহংকার থাকলেও জাতিগত বিদ্বেষ ততটা দেখা যায়নি। এর পাশাপাশি দেখা যায় হিন্দুরা হিন্দু ধর্মের সঙ্গে সঙ্গে মুসলমান ও অপরাপর ভারতীয় জাতিদের তাদের সংগঠনে যোগ দিতে বাধা দান করেনি কিন্তু অন্য দিকে মুসলিমরা তাদের স্বার্থরক্ষার জন্য মহামেডান অ্যাসোসিয়েশন গঠন করেছিলেন তবে তারাও সেখানে অমুসলিম সহযাত্রীদের কথা উল্লেখ করতে ভুল করেনি। স্বধর্মের শ্রেষ্ঠত্ব রক্ষা করার জন্য হিন্দু ধর্মের শ্রেষ্ঠ উপাদান গ্রহন করতে তাদের দ্বিধা হয়নি (তাই হিন্দুদের আচার, রীতি-নীতি গ্রহণ করতে দেখা যায়)। তবে স্বতন্ত্র চেতনা মুসলমানদের মধ্যে বেশি ছিল তাই সংগঠন গুলোর নামের সঙ্গে মুসলিম শব্দের ব্যবহার লক্ষ করা যায়। অন্যদিকে হিন্দুদের লক্ষ্য ছিল সর্বভারতীয় আন্দোলনের কেন্দ্র হয়ে উঠতে পারা। এছাড়াও হিন্দু পুনরুত্থানবাদীদের একটা বড় অংশ কংগ্রেসের সঙ্গে যোগ দিয়ে আন্দোলনে অংশ নেয়। অন্যদিকে মুসলমান পুনরুত্থানবাদীরা তার থেকে দূরে থাকে। বিশ্ব ইসলামের আকর্ষণই তাদের কাছে প্রবল। এরই ফলস্বরুপ ১৮৭৭ সালে রাশিয়া-তুরস্ক যুদ্ধের সময় মুসলমান সমাজ তুরস্ককে

সমর্থন করেছিল। এই ঘটনার ২৭ বছর পর রুশ-জাপান যুদ্ধে হিন্দু জাতীয়তাবাদীরা জাপানকে সমর্থন করেছিল।

এইভাবে ধীরে ধীরে স্বধর্মের সঙ্গে পরধর্ম বিদ্বেষ যুক্ত হয়ে সাম্প্রদায়িকতা দানা বাঁধে। দেখা যায় শিক্ষাক্ষেত্রে সুযোগের বৈষম্য। শিক্ষার ধারে কাছে উচ্চ ও মধ্যবৃত্ত ঘেঁষতে পারত। এইভাবেই সরকারী কাজ ও শিক্ষায় মুসলিমদের পিছিয়ে পড়ার ছবি দেখা যায় (ইংরাজি শিক্ষার প্রতি উদাসীনতা বশত এই হাল)। জাতীয় বিদ্যাশিক্ষার প্রতি আনীহাই ছিল মুসলমান সমাজের দুর্দশার অন্যতম কারণ। তবে যখন তাঁরা এটা উপলব্ধী করতে পেরেছিল তাতে তাদের অবস্থার উন্নতি হয়েছিল। এইভাবেই নানান উত্তেজনা বশে তাদের মধ্যে বিভেদের লক্ষণ ফুটে উঠতে দেখা যায়।

এইরকম স্বার্থ সংঘাতের পাশাপাশি এসে হাজির হয় ধর্মীয় সংঘাতের প্রসঙ্গ যার ফলস্বরুপ গোহত্যা বন্ধ করার নির্দেশ জারি হয় এমনকি গরুর দেহ খোলা অবস্থায় নিয়ে যাওয়া নিষিদ্ধ করা হয়, কিন্তু মুসলমানরা তা মেনে চলেনি। এর সঙ্গে সঙ্গে হিন্দুরাও মসজিদের সামনে ঢাক বাজাতে ব্যাস্ত থাকত। এই রকমেই দুজন দুজনার মোকাবিলায় তীব্র ভাব দেখায় যা ক্রমশ দ্বন্দ্বের আকার নেয়।

এইভাবেই বিশশতকের শুরুতেই হিন্দুদের মধ্যে একটা জাতীয় বোধের জাগরণ ঘটে। ১৮৭০ এর সময়ে জাতীয় ভাব, মানসিক প্রকৃতি, আচার প্রণালীর মতো ধারনার মাধ্যমে হিন্দুত্ব বা হিন্দু জাতির তত্ত্ব গড়ে তুলতে চাইছিল হিন্দুরা। এই একই ভাবনা উনিশ শতকের শেষ ও বিশ শতকের প্রথম ভাগে দেখা দিয়েছিল মুসলমানদের মধ্যে। এই ভাবেই আপন ধর্মের শুদ্ধতা রক্ষার যে ভাবনা তার সঙ্গে এক পরিপূর্ণ মতাদর্শ বা আইডিওলজির জন্ম হয়েছিল। এর পাশাপাশি অর্থনৈতিক সংঘাত একটি সম্প্রদায়কে

প্রতিদ্বন্দ্বী করে তুলছে অন্য সম্প্রদায়ের কাছে। এই ভাবে ধর্মের বিভিন্ন বিষয়কে ব্যবহার করা হল শ্রেণী স্বার্থে।

এরপর বঙ্গভঙ্গের প্রসঙ্গে মতভেদ দেখা যায়, হিন্দু ভূস্বামীরা বঙ্গভঙ্গ চায়না অন্যদিকে মুসলমানরা ভেবেছিল এটাই তাদের আত্ম প্রতিষ্ঠার সুযোগ। তখনই ব্রিটিশ মদতে ১৯০৬ খ্রিষ্টাব্দে তৈরী হল মুসলিম লিগ। বঙ্গভঙ্গ চলাকালীন দাঙ্গা হয় পূর্ব বঙ্গে। মুসলমানদের প্রভাব প্রতিপত্তি প্রতিষ্ঠিত হতে চলেছে এই ভাবনার কারনে সেদিন চলল হিন্দু গৃহ লুণ্ঠন, হিন্দু বিধবাদের নিকা করা, হিন্দু রমণীর সতীত্বনাশ করার মতো ঘটনা। ১৮৫৭-১৯০৭ পর্যন্ত হিন্দু মুসলমান সম্পর্কের বিষয়টাতে কয়েকটা জিনিস নজরে পড়ার মতো যেমন- হিন্দুদের মধ্যে জাতপাত বিভাজন ছিল সেখানেও মুসলমানদের ম্লেচ্ছ বলেই দেখত উচ্চ স্তরের হিন্দুরা; যার ফলে খাওয়া- দাওয়া, আদান- প্রদান হিন্দু নিম্ন জাতি ও মুসলমানদের মধ্যে হত না। এই ভাবনাই প্রথমে আঞ্জুমান সংগঠন ও পরে মুসলিম লিগের প্ররোচনায় সংঘর্ষের ভূমিতে পৌঁছায়। এই ধারণা আরও উগ্র হয় ১৯০৭-৪৭ এই চল্লিশ বছরে। হিন্দুদের উন্নতিতে মুসলমানরা ঈর্ষান্বিত, মুসলিমরাও তবে হিন্দুদের উন্নতি সুনজরে দেখেনি। এইভাবেই দুই সম্প্রদায়ের ঈর্ষার মনোভাব প্রত্যক্ষ আক্রমণের মুখোমুখি দাঁড় করালো যার ফলস্বরূপ হল বঙ্গভঙ্গ। মুসলমানদের এই ব্রিটিশ মুখিনতা হিন্দুদের চোখে ভাল ঠেকেনি সেদিন। যেমন বিদ্যা শিক্ষায় মুসলিমদের সংখ্যা বাড়ে এবং এদের উন্নতি হয়, যাতে হিন্দুরা ঈর্ষা বোধ করে। এই দুর্দিনের কারণ মুসলমানদের জনসংখ্যা বৃদ্ধি এবং হিন্দুদের এই সময় নানান রোগের কারনে জনসংখ্যা হ্রাস (ম্যালেরিয়ায় বর্ধমান জেলার হিন্দু প্রধান এলাকার জনসংখ্যা কমতে থাকে)।

উনিশ শতকের শেষ ও বিশ শতকের প্রথমে মুসলমানরা তাদের দুরবস্থার জন্য ইংরেজ ও হিন্দুদের দায়ি করে, অনুরূপে হিন্দুরাও তাদের দুর্দিনের জন্য মুসলমান ও ইংরেজদের দায়ি করে। তাই তারা হিন্দুমহাসভা তৈরী করেছিল। এই সভা সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথ বলেছিলেন-

> "আমরা সঙ্ঘবদ্ধ হতে চাইলে মুসলমানরা কেন বাধা দেবে ?
>
> নিজেদের জনসংখ্যা বাড়ছে এবং হিন্দুদের ইচ্ছেমত ইসলাম ধর্মে
>
> দিক্ষিত করছে। এই দুটি বিষয় জানা যায়।" ৪

এর পাশাপাশি বিভিন্ন লেখা থেকে সব সম্প্রদায়ের নারীর সম্মানহানি হওয়ার ছবি ভেসে ওঠে।

এখানে লিগের প্ররোচনা, দাঙ্গা, সাম্প্রদায়িকতা এসব ঘটনার সঙ্গে সঙ্গে রাজনীতির দিকে তাকালে নানান ঘটনা দেখা যাবে সেগুলোই একটু আলোচনার চেষ্টা করব। দেশভাগ ও দাঙ্গার ভোগান্তি বিবরণের আগে এই অধ্যায়টা একটু তুলে ধরার চেষ্টা করব। এ প্রসঙ্গে প্রথমেই ১৯১৯ সালে ঘটা সংস্কার আইনের দিকে চোখ রাখলে দেখা যাবে কমিশন গঠনের প্রসঙ্গ। তখন ভারতে ১৯২৬ খ্রিষ্টাব্দে লর্ড আরউইন ভাইসরয় হয়ে আসার পর দেখলেন শাসনতন্ত্র ও সংবিধানের নানান সংস্কারের প্রয়োজন। এইজন্য ভারতীয় জনগণের নির্ধারিত সময়ের আগেই ১৯২৭ খ্রিষ্টাব্দে স্যার জন সাইমনের নেতৃত্বে এক কমিশন গঠন হয় তা সাইমন কমিশন নামে পরিচিত। রাজনৈতিক পরিস্থিতিকে সামাল দিতে এই কমিশন গঠিত হয়। এখানে ভারতীয়দের প্রাধান্য না থাকায় তাঁরা ক্ষুব্ধ হয়েছিল। এখানে ভারত সচিব বারকেনহেড মন্তব্য করেছিলেন-

"কোনো কার্যকর রাজনৈতিক-কাঠামোর ব্যাপারে একমত হওয়ার ক্ষেত্রে ভারতীয়রা একেবারেই অপারগ।" ৫

এই মন্তব্য ক্ষুব্ধ পরিবেশে অগ্নিসংযোগ করে। ফলত কংগ্রেস, হিন্দু মহাসভা, মুসলিম লিগ প্রভৃতি রাজনৈতিক দল একত্রিত হয়ে সাইমন কমিশনের বিরোধিতা করে। এখানে বিভিন্ন সামাজিক, অর্থনৈতিক পরিবর্তনের মধ্যে দিয়ে পূর্ণ স্বরাজের দাবি থাকে।

এইভাবে একটা সর্বব্যাপী আন্দোলন দানা বেঁধে ওঠে। আইন অমান্য আন্দোলনের কর্মসূচী প্রনয়নের জন্য গান্ধীজিকে আহ্বান করা হয়। ব্রিটিশরা রাজনৈতিক, সামাজিক, সংস্কৃতিক সব দিক থেকে ভারতকে শেষ করে দিচ্ছে তাই বয়কট পর্যায়ের আইন অমান্য আন্দোলনের সুচনা হয়। এখানে ডান্ডিতে যাত্রা করে সমুদ্র থেকে লবণ সংগ্রহ করে লবণ আইন ভঙ্গ করলেন। এরই পাশাপাশি ৯ এপ্রিল গান্ধীজি জনসাধারণের উদ্যেশ্যে বয়কট করার নির্দেশ দেন। সেখানে মদের দোকান ও বিদেশী বস্ত্রের দোকানের সামনে অবস্থান, বিক্ষোভ, স্কুল-কলেজ বয়কট করা, সরকারী চাকরি থেকে পদত্যাগ করা, অস্পৃশ্যতা দূর করা, সাম্প্রদায়িক ঐক্য স্থাপন করা এগুলির জন্য নির্দেশ দেন। ১৯৩০-৩৪ খ্রিষ্টাব্দে নারী-পুরুষ নির্বিশেষে ব্রিটিশ সরকারের এই নীতির বিরুদ্ধে সংঘবদ্ধভাবে আইন অমান্য আন্দোলনে সামিল হয়েছিল। যা অত্যন্ত সাহসের বিষয়।

এরই মধ্যে এই আইন অমান্য আন্দোলনের জন্য বড়লাট কড়া ব্যবস্থা গ্রহণে ব্যস্ত, অন্যদিকে ভারতের শাসনতান্ত্রিক কাঠামো নতুন করে গড়ে তোলার পরিকল্পনায় ব্রিটেনে ব্যস্ত ব্রিটিশ সরকার। ১৯৩৫ খ্রিষ্টাব্দে ভারত শাসন আইন দুটি দিক নিয়ে অনুমোদন লাভ করে। একদিকে থাকে ব্রিটিশ ভারতীয় প্রদেশ ও দেশীয় রাজ্যগুলিকে নিয়ে একটি সর্বভারতীয় যুক্তরাষ্ট্র গঠন এবং অন্যদিকে প্রাদেশিক স্বায়ত্ত শাসন। ভারতশাসনের চূড়ান্ত

নিদর্শন যুক্তরাষ্ট্রীয় বিচারালয় স্থাপন। এর আগে কোর্ট ছিল সর্বপ্রধান ক্ষমতার অধিকারী। যাইহোক ভারত শাসন আইন ১৯৩৭ খ্রিষ্টাব্দে কার্যকরী হয়। এর আগেই কংগ্রেসের রাজনৈতিক নীতির পরিবর্তন ঘটে যায়। গান্ধীজি সত্যাগ্রহ ও আইন অমান্য আন্দোলন শেষে স্থগিদ রাখলেন। তিনি আইন অমান্য আন্দোলনের পরিবর্তে ব্যাক্তিগত প্রতিরোধ আন্দোলনের ডাক দিলেন। এইভাবে হতাশায় ভরে যায় রাজনীতি। ফলস্বরূপ দল বিভাজন হয়ে দক্ষিনপন্থী ও বামপন্থী দুই ধরনের দলের প্রবণতা দেখা যেতে থাকে। বামপন্থী কংগ্রেসকর্মী ও নেতারা মিলে ১৯৩৪ খ্রিষ্টাব্দে কংগ্রেস-সমাজতন্ত্রী দলের প্রতিষ্ঠা হতে দেখা গিয়েছিল।

এর পাশাপাশি ১৯৩৫ খ্রিষ্টাব্দে ভারত শাসন আইন প্রনয়নের পর মুসলমান সম্প্রদায় তার অধিকার সুরক্ষার বিষয়ে বিচলিত হন। ১৯৩৫ এর এই ভারত শাসন আইনে যে স্বায়ত্ত শাসনের অধিকার দেওয়া হয়েছিল তার ফলে ১৯৩৭ এর নির্বাচনে কংগ্রেস ভালো ফল করে। পাশাপাশি মুসলিম লিগের ফলাফল মুসলিম অধ্যুষিত এলাকাতেও আশাতীত নয়। এই সায়ত্ত্বশাসন ও যুক্তরাষ্ট্র গঠনকে কেন্দ্র করে মুসলিম লিগ সক্রিয় রাজনীতিতে অংশগ্রহন করে। ১৯৩৩ খ্রিষ্টাব্দের পর মুসলিম লিগ জিন্নার নেতৃত্বে সক্রিয় হয় এবং কর্মসূচী গ্রহন করে।

এইভাবে হিন্দু-মুসলিমের এই সম্প্রদায়গত ভাবনা ও ভেদাভেদ পর্ব ইতিহাসে অজানা নয় তবে তা জাতিয়তাবাদকে ছাপিয়ে যায়নি। কিন্তু স্বতন্ত্র নির্বাচন, সংরক্ষণ ইত্যাদি সাম্প্রদায়িক স্বার্থ ও অধিকার রক্ষা করার দাবি সেদিন পৌঁছে যায় দেশভাগ এর দোরগোড়ায়। ১৯৩০ খ্রিষ্টাব্দে উর্দু কবি মহম্মদ ইকবাল -এর নেতৃত্বে মুসলমান অধ্যুষিত এলাকা উত্তর-পশ্চিম ভারতে একটি স্বায়ত্ত শাসিত এলাকা গঠনের দাবি জানায়। এখানে

ভারত বিভাগ বা আলাদা করে পাকিস্তান রাষ্ট্রের কোনো আভিপ্রায় তাঁর ছিল না। এরই সূত্র ধরে পাঞ্জাবি মুসলমান ছাত্রদের একটি গোষ্ঠী চৌধুরী রহমত আলির নেতৃত্বে পৃথক পাকিস্তান রাষ্ট্রের দাবি জানায় ১৯৩৩ ও ৩৫ খ্রিষ্টাব্দে। ঠিক এমন সময়ই লিগের প্ররোচনায় কংগ্রেস হিন্দুত্ববাদীদের প্রাধান্য দিচ্ছে এই ভাবনা জাঁকিয়ে বসে। যার ফলস্বরূপ দেশভাগের ভাবনা। এখান থেকেই জিন্না দ্বিজাতি তত্ত্বের ভাবনাকে সুদৃঢ় করেন। এরপর ১৯৪০ খ্রিষ্টাব্দে লাহোরে মুসলিম লিগের অধিবেসনে পৃথক পাকিস্তান রাষ্ট্রের দাবি ওঠে। এই দ্বি জাতি তত্ত্বের ভাবনা বিভেদের রাজনীতিকে উস্কে দেয়। এইভাবেই ক্রমাগত আপত্তিকর রচনা, কোন শোভাযাত্রা, ধর্মীয় অনুষ্ঠান ইত্যাদি নিয়ে বিরোধ কে কেন্দ্র করে হিন্দুদের ভদ্র ডাকাত বলা ও মুসলিম দের হাঙ্গামাবাজ (হুলিগ্যান), ব্রিটিশের ভাড়া করা গুন্ডা ইত্যাদি বলার মধ্য দিয়ে এক প্রত্যক্ষ সংঘর্ষের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে ছিল দুই সম্প্রদায়, ফলে ভারতে ঘটল দাঙ্গা, প্রয়োজন হল দেশ ভাগের। দেশ ভাগের আগে লিগ প্রথমে ফজলুল হকের সঙ্গে যৌথ ভাবে এবং পরে একক ভাবে শাসন কার্য পরিচালনা করেছে। এইভাবেই সংরক্ষণ আইন কে হাতিয়ার করেই মুসলিম অধিপত্য স্থাপনের লক্ষ্যে এগিয়ে চলে লিগ। এই ঘটনার ফলে হিন্দু প্রতিক্রিয়া তীব্র হয়। হিন্দুদের মধ্যে চাকরি না পাওয়ার ভয়, ভাষা সংস্কৃতি-ধর্ম না থাকার ভয় জাগরিত হয়। এর পরই লিগের প্রত্যক্ষ সংগ্রামের ডাক শুরু হয়। দুই সম্প্রদায়ই বিনা যুদ্ধে সূচাগ্র ভূমি ছাড়তে রাজি নয়। এদিকে বাংলায় লিগের শাসনে হিন্দুরা অতিষ্ঠ হয়ে ওঠে। হিন্দুদের শিক্ষা নিয়ে আগে থেকেই অসন্তুষ্টি ছিল সেটা আরও ভয়াবহ রূপ নেয়। পাঠ্যপুস্তকে মুসলমান পুনরুত্থানবাদ আর সাম্প্রদায়িকতা প্রচারের কেন্দ্রে যখন মাদ্রাসা গুলির হাত থাকে তখন এই দৃশ্য দেখে হিন্দুদের ভাবনা হতে থাকে যে লিগের হাতে পড়ে শিক্ষা ব্যবস্থার ইসলামীকরণ হয়ে যাবে। এমনকি মুসলমান কৃষকদের পাকিস্তান রাষ্ট্রের লোভ ও প্রাথমিক

শিক্ষার প্রতিশ্রুতি দানের মাধ্যমে হিন্দুদের প্রতি বিরুদ্ধ মনোভাবের সৃষ্টি করে। তাই তেভাগা আন্দোলনে মুসলমান কৃষকদের যোগদান কম ছিল।

এইভাবেই লিগের প্ররোচনা পর্ব ও স্বার্থ সিদ্ধির চেষ্টার প্রসঙ্গ দেখতে পেলাম। এছাড়াও এই অধ্যায়ের আরও এক গুরুত্ব পূর্ণ ঘটনা হল – দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ। ১৯৩৯ এর ১ লা সেপ্টেম্বর এই দ্বিতীয় বিশ্ব যুদ্ধের সূচনা হয়। এই পরিস্থিতি ভারতীয় রাজনীতিতে এক গভীর সংকট সৃষ্টি করল। বিভিন্ন দলের অনিচ্ছা সত্ত্বেও জনমত যাচাই না করে ভারতবর্ষ কে যুদ্ধে সামিল করা হয়। এই যুদ্ধে ব্রিটিশ সরকার বিরোধী দলগুলিকে প্রশ্রয় দিতে শুরু করে, যার প্রধান কেন্দ্রে থাকে মুসলিম লিগ যাকে ব্রিটিশ সরকার তার প্রয়োজনে ব্যবহার করে নিজ স্বার্থে। এইভাবে রাজনীতিতে সাম্রাজ্যবাদ ও জাতীয়তা বাদী শক্তির মধ্যে দ্বন্দ্ব বৃদ্ধি পায়, যার ফলস্বরূপ সাম্প্রদায়িকতা বৃদ্ধি পাওয়ায় ঐক্যবদ্ধ জাতীয় আন্দোলন ব্যাহত হয় যা ভারতীয় রাজনীতিকে জটিলতায় ভরে তোলে।

আমরা আগেই দেখেছি কংগ্রেসের মধ্যে মতের পার্থক্য যার ফলে নরমপন্থী, চরমপন্থী, সোশালিস্ট প্রভৃতি মতাদর্শ গত ভাগ তৈরীর কথা। ১৯৩৪ খ্রিষ্টাব্দে গান্ধিজী আইন অমান্য আন্দোলন প্রত্যাহার করার পর কংগ্রেসে দক্ষিণ পন্থী ও বামপন্থী প্রবণতা প্রকট হয়। এরই মধ্যে পণ্ডিত জহরলাল নেহেরু ও সুভাষ চন্দ্র বসু বামপন্থী চেতনার পরিপন্থী ছিলেন। ১৯৩৮ সালে সুভাষ চন্দ্র বসু কংগ্রেসের সভাপতির পদে নিযুক্ত হয় এবং সুভাষ চন্দ্র ফরওয়ার্ড ব্লক নামে নতুন দল গঠন করেন এবং গান্ধী ও সুভাষ চন্দ্র বসুর মধ্যে মতবিরোধ ঘটে।

এরপর ১৯৪০ খ্রিষ্টাব্দে কংগ্রেস ওর্য়াকিং কমিটিতে গান্ধিজীর নেতৃত্বে ব্যক্তিগত সত্যাগ্রহ আন্দোলনের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। ১৯৪২ খ্রিষ্টাব্দে ব্রিটিশ শাসনের অবসানের

প্রস্তাব নেয়। এসময় ‘ভারতছাড়ো’ আন্দোলন বা অগাস্ট আন্দোলন ২ বছর স্থায়ী ছিল। প্রথমে এই আন্দোলন শহর কেন্দ্রিক ছিল পড়ে বিস্তার লাভ ঘটে। এই ঘটনার এক বছরের মধ্যে ভয়াবহ দুর্ভিক্ষ দেখা দেয়। প্রায় ৩০ লক্ষ লোক খাদ্যাভাবে মারা যায়। এতে গ্রামাঞ্চলের ক্ষেতমজুর ও খুদ্র কৃষক সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হয়। ১৯৪২ এ নভেম্বের-ডিসেম্বর মাস অগাস্ট বিদ্রোহের ইতিহাসে এক নতুন পর্যায়ের উদ্ভব হয়। এই সময় সরকারী দমন নীতির চাপে গণ আন্দোলন বিস্তার লাভ করতে পারেনি এবং বিচ্ছিন্ন গুপ্ত সন্ত্রাসবাদী আন্দোলন আত্মপ্রকাশ করে। ১৯৪৫ খ্রিষ্টাব্দের মে মাসে জার্মানি এবং অগাস্ট মাসে জাপানের আত্মসমর্পণের মধ্য দিয়ে এই দ্বিতীয় বিশ্ব যুদ্ধের পরিসমাপ্তি ঘটে। যুদ্ধের অবসান হলেও ১৯৪৫-৪৭ এই অধ্যায় স্মরনীয় হয়েই রয়ে গেল। দেশ জোড়া ধর্মঘট, হরতাল, শ্রমিক-অসন্তোষ, তেভাগা আন্দোলন, দাঙ্গা দেশে অসন্তোষের পরিবেশ তৈরী করল। এই সময়ে নাবিক গনের মধ্যে নিকৃষ্ট মানের খাদ্য দান, বেতন বৈষম্য, জাতিগত বিদ্বেষ ও বৈষম্য মূলক আচরণের জন্য রুষ্টতা দেখা যায় যার ফলস্বরুপ বোম্বাইয়ে নৌ বিদ্রোহ দেখা দেয়। এই দাঙ্গা ও নানান আন্দোলনের কারনে ব্রিটিশ সরকার বিভ্রান্ত হন এবং দেশের আইন শৃঙ্খলার পরিস্থিতিও অবনতি হতে দেখা যায়। ১৯৪৭ খ্রিষ্টাব্দের ২ মে লর্ড মাউন্ট ব্যাটেন ভারত বিভাগের খসড়া পরিকল্পনা করে ব্রিটিশ মন্ত্রী সভায় অনুমোদনের জন্য পাঠিয়েছিলেন। এই প্রস্তাবে- হিন্দুদের একটা বড় অংশের তাতে সম্মতি থাকে। মুসলমান ব্যাবসায়ীরাও দেশভাগ চায়, কারন তারা বাংলায় টাটা-বিড়লা-ডালমিয়াদের সঙ্গে পেরে উঠবে না। তাই ৩রা জুনে বেতারে সন্ধ্যায় দেশভাগ ঘোষিত হওয়ার পর হিন্দুরা হর্ষধ্বনি করেছিল, আর স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলেছিল মুসলমান ব্যাবসায়ীরা। এইভাবে নানান তর্ক-বিতর্ক, বাদ-বিবাদ, আলাপ আলাচোনার মধ্যে দিয়ে ১৯৪৭ খ্রিষ্টাব্দে ১৫ই অগাস্ট এল ভারতের দেশভাগ করা স্বাধীনতা।

এই দেশভাগের পরিনতি নিজেদের জীবন দিয়ে বুঝেছে মানুষ। বাঙালি মুসলমানকে আবার সংগ্রাম করতে হয়েছে স্বাধীনতার জন্য। বাঙালি হিন্দুর পূর্ববঙ্গ ছেড়ে পশ্চিমবঙ্গে চলে আসার প্রসঙ্গ দেখা যায়। দেশ বিভক্ত হলেও এখনও দুই খণ্ডেই দুই সম্প্রদায় বাস করছে। তাই মনে হয় তখন দাঙ্গা না করে সহিষ্ণু হয়ে পরিস্থিতি বুঝে এগিয়ে চলতে হত, একে অন্যের প্রতি শ্রদ্ধাশীল হতে হত ঈর্ষা না করে। এই ভাবেই জাতির জীবনে দেশ ভাগ হওয়া স্বাধীনতা এক অনন্য নজির স্থাপন করেছে।

উপরে দেওয়া বর্ননায় আমরা স্বাধীনতা আন্দোলনের অধ্যায়ের ভয়াবহ বর্ণনা পেলাম। এখন এই ভয়াবহতার ফলে সমাজে কি প্রভাব পড়ল আর এই সময় কৃষি, শিল্প ও নারীর অবস্থান কেমন ছিল তা একটু দেখে নেওয়ার চেষ্টা করব। এই স্বাধীনতার অধ্যায়ে ঘটা দুই বিশ্ব যুদ্ধের ফলে ভারত অর্থনৈতিক সংকটে পড়ে। যা জনজীবনে প্রভাব ফেলে। এই সংকটে পড়ে কৃষি শিল্পের ক্ষতি হয়। যুদ্ধের পরিস্থিতিতে বৈদেশিক বানিজ্যের ঘাটতির কারনে বস্ত্রশিল্প, লৌহ-ইস্পাত শিল্প, তুলা ও পশম শিল্প ইত্যদি ব্যাহত হয়। কিছু শিল্পের দ্রব্য যুদ্ধকালীন পরিস্থিতিতে ব্রিটিশ সরকার তাঁর বিভিন্ন খাতে সরবরাহ করতেন। এমনকি ভারতের কাঁচামাল বিশ্ব বাজারের তুলনায় অনেক কম দামে যুদ্ধের প্রয়োজনে ব্রিটেনে রপ্তানি হত। এছাড়াও কাগজ ছাপিয়ে মুদ্রা সরবরাহের জন্য মুদ্রা স্ফীতি যথেষ্ট বৃদ্ধি পায়। যার ফলে শ্রমিক ও মধ্যবিত্ত শ্রেণী নিদারুন সংকটের সামনে পড়ে। ঠিক একই রকমভাবে ভারতীয় কৃষিতেও সংকটের ছবি দেখা গেছে। পাট, তুলা, তৈলবীজ ও অন্যান্য কৃষিপণ্যের রপ্তানি কমে যাওয়ায় কৃষক দের অর্থনৈতিক সংকট দেখা দেয়। এমনকি ভূস্বামী ও বণিকদের দ্বারা চাষিরা নানা ভাবে শোষিত হত। ফলে জমি বন্ধকি ও বিক্রির বিষয় দেখা দিয়েছিল। এভাবেই কৃষি ও শিল্প বিপন্নতার পথে বসেছিল। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের প্রতিক্রিয়ায় হস্ত শিল্পের ও ক্ষুদ্র শিল্পের উৎপাদন কমতে থাকে। এই

শিল্পের সাথে যুক্ত মানুষরা অভাবের মুখোমুখি হয় এবং বেকারত্ব বাড়ে। জীবন যাপনের প্রয়োজনে যখন অর্থ একটা গুরুত্ব পূর্ণ সম্বল তখন মানুষ সহায় সম্বল হীনতা অনুভব করেছে এবং ধীরে ধীরে সেখান থেকে সরে আসতে লাগল, দেখা দিল এক পরিবর্তনশীল সমাজ।

কৃষি প্রধান ভারতবর্ষ, সাম্রাজ্য বাদী শক্তির সর্বগ্রাসী কবলে পড়ে তার কৃষির ভিত্তি দুর্বল হয়ে পড়ল। একদিকে প্রথম বিশ্ব যুদ্ধ এবং অন্যদিকে কৃষির সঙ্গে পুঁজিবাদী সম্পর্কের সূচনা হল এই দুই ঘটনা থেকেই ভারতীয় কৃষি সমস্যা প্রকট রূপ নিল। আগে পরিবারে যৌথ ভাবে জমি চাষ করত এই ব্যবস্থায় বহির্মুখী প্রবণতার কারণে জমির বণ্টন বিভাজন শুরু হতে দেখা যায়। এভাবে খণ্ড বিখন্ড জমিতে উন্নত বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি ব্যবহার করে চাষাবাদ সম্ভব ছিল না ফলে চাষ বাস অলাভজনক হয়ে পড়ে সেদিন।

এইভাবে অন্যদিকে দেখা যায় পুঁজিবাদী বৃহৎ শিল্পের সঙ্গে প্রতিযোগিতায় না পেরে ওঠা মানুষ কৃষিকে অবলম্বন করেছিল সেদিন। শহর থেকে উৎখাত হওয়া শতশত হস্তশিল্পী, কর্মী, শ্রমিক শ্রেনীর একটা বিশাল অংশ কৃষিকে জীবিকা সংস্থানের উপায় হিসাবে গ্রহন করে। ফলে শিল্প থেকে চাপ কৃষিতে স্থানান্তরিত হয়। জমির বিভাজন আরও ভয়ংকর রূপ নেয়, কৃষকদের অর্থনৈতিক কাঠামো ক্রমশ ভেঙ্গে পরতে থাকে। এই অর্থনীতির ভাঙনের ফলে জমি এক শ্রেণীর বিত্তবান মানুষের কাছে চলে যেতে লাগল, উদ্ভব হল জমিদার নামক এক শ্রেণীর। এইভাবে সমজে এক শ্রেনী বিভাজন দেখা দিল যার একদিকে জমিদার- মহাজন- বণিক অন্যদিকে সর্বহারা কৃষক সম্প্রদায় ও ক্ষুদ্র ভাগ চাষি। এইভাবে গ্রামীণ যৌথ পরিবারের ভাঙন দেখা দিল এবং শহর অভিমুখে ভিন্ন পেশার আকর্ষণে মানুষ অগ্রসর হল।

এর পাশাপাশি শিল্প ব্যবস্থাও ভারতীয় অর্থনীতির একটা প্রাণকেন্দ্র ছিল। এই প্রাণকেন্দ্রেও ভাটা পড়তে থাকে ঔপনিবেশিক শাসনের কাল থেকে যার ফলে হস্ত শিল্প, গ্রামীণ কারিগরি শিল্প, তাঁত শিল্প প্রভূতি ধ্বংসের মুখে পড়ে। এর অন্যতম কারন ছিল ঔপনিবেশিক স্বার্থে নতুন শিল্পের ক্রমাগত বৃদ্ধি, প্রশাসনিক স্বার্থে প্রাশ্চত্য শিক্ষা প্রবর্তন, ব্রিটিশ সরকারের দ্বারা কৃষিতে পুঁজিবাদী অর্থনীতির বিস্তার, বানিজ্যিক শক্তির আগমন, আধুনিক যানবাহনের ব্যবহার (রেল পথ) প্রভৃতির আগমন জাতীয় অর্থনীতিকে মজবুত করে। এই শহুরে শিল্প নগরগুলোই আধুনিক সংস্কৃতি ও গণতান্ত্রিক সামাজিক জীবনের ধারক ও বাহক হয়ে উঠেছিল। এইভাবে আধুনিক শিল্পের অগ্রগতির কারনে সমাজে দুই শ্রেণীর জন্ম নিয়েছিল তা হল বুর্জোয়া ও শ্রমিক বা মজুর শ্রেনি। এই পুঁজিবাদী অর্থনীতিতে প্রতিযোগিতার বাজারে টিকে থাকতে না পেরে মধ্য শ্রেণীর ছোটো কারিগরদের মজুরে পরিণত হতে দেখা গেছে। এই কৃষি ও শিল্পের ভাঙনে বিভিন্ন শ্রেণী মাথা চারা দিয়ে ওঠায় কৃষকরা সর্বহারা হয়ে পড়ে এবং নানা বিপর্যয়ের সম্মুখীন হয়ে পড়ে। তখনই পিছিয়ে পড়া শ্রেণীর মধ্যে সচেতনতার বোধ জাগল এবং দেখা গেলো শ্রমিক ও কৃষক আন্দোলন। এই সময় থেকে প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময় পর্যন্ত কোনো নেতৃত্ব ছাড়া সংস্কার পন্থী কাজের মধ্যে দিয়ে চলেছিল এই আন্দোলন। এইভাবে ১৯২০ খ্রিষ্টাব্দে সারাভারত ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেসের জন্ম হয়। ১৯২৭ খ্রিষ্টাব্দের পর ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেসের মধ্যে বামপন্থী নেতৃত্ব গড়ে উঠেছিল। এইরকমভাবে বিশশতকে অনেক স্বতঃস্ফূর্ত ও আকস্মিক আন্দোলনের মধ্যে দিয়ে সার্থক আন্দোলনের জন্ম নেয় এবং তা আরও জোড়ালো হয় বিশ শতকের তিরিশের দশকে। এইভাবেই ১৯৩৮ খ্রিষ্টাব্দে ভারতীয় কিষান স্কুল স্থাপিত হয়। ১৯৩৭ খ্রিষ্টাব্দে ম্যাড্রাস প্রেসিডেন্সী এগ্রিকালচারিস্টস এসোসিয়েসন গঠিত হয়। ১৯৩৫ খ্রিস্টাব্দে প্রথম সারা ভারত কিষান সভা সম্মিলিত হয়।

এরপর সমাজের আরেকটি দিক উঠে আসে তা হল জাতিভেদ প্রসঙ্গ। প্রাচীন কাল থেকে নানান বিধি, প্রথা ও রীতির চল ছিল সমাজে। তখন জাতিগত ভেদের উপর নির্ভর করে পেশা নির্ধারিত হত। জাতিগত ভেদের কারনেই নানারকম সুযোগ সুবিধা পাওয়ার ক্ষেত্রেও বৈষম্য দেখা দিত। জন্মের দ্বারাই যোগ্যতা, মর্যাদা ও গুন, সামাজিক ভূমিকা নির্ভর করত। এই প্রথায় ব্যাক্তির মেধা ও যোগ্যতার স্বাভাবিক বিকাশ হত না। সমাজ সংস্কারকেরা এটার মধ্যে সমতা আনার প্রয়াসী ছিলেন। এই উপলব্ধী থেকে সমাজে নতুন ভাবধারার জাগরণ যার হাত ধরে মানুষ আধুনিক মনস্ক হতে পারবে। তাই ইউরোপীয় উদারনৈতিক ভাবধারার সঙ্গে মানুষ যুক্ত হতে চেয়েছিলেন। যার ফলে সমাজের নানান রীতি নীতি রেওয়াজ ইত্যাদিকে কেন্দ্র করে যে সমস্ত ধারনা মানুষের মনে জায়গা করে বসে আছে সেই সব ধারণা থেকে বেরিয়ে মন হবে সংস্কারমুক্ত এই ভাবনা মানুষের মনে স্বাধীনতার পর্ব থেকেই দানা বাঁধতে থাকে। স্বাধীনতার পর্ব থেকেই সেখানে যে নানান আন্দোলন বিশেষ করে ১৯২০ খ্রিষ্টাব্দের অসহযোগ আন্দোলন ও ১৯৩০ খ্রিষ্টাব্দের আইন অমান্য আন্দোলন এগুলোতে অংশগ্রহন থেকেই জাতপাতের বিধিনিষেধ অনেক কম প্রভাব ফেলেছিল। ধীরে ধীরে এই সচেতনতা আরও বাড়তে থাকে। এইভাবে শিক্ষার সান্নিধ্য ও আইন প্রনয়ন ইত্যাদির মাধ্যমে এই জাতিভেদ ভাবনায় অনেকটা শিথিলতা আসে এরই সুত্র ধরে 'স্পেসাল ম্যারেজ এ্যমেন্ডমেন্ট অ্যাক্ট' (special marriage amendment act)-এর নাম বলা যায় যার দ্বারা জাত ব্যাবস্থার কাঠামোর পরিবর্তন সম্ভব হয়েছিল।

প্রাক ব্রিটিশ যুগে কিছু সম্প্রদায়কে অস্পৃশ্য বলে চিহ্নিত করে তাদের সবরকম অধিকার থেকে যেমন মন্দিরে প্রবেশ, কূপ ব্যবহার ইত্যাদি নানান জায়গার ব্যবহার থেকে তাদেরকে বঞ্চিত করা হত। এই অস্পৃশ্যতার বিরুদ্ধে ভাবনা গণতান্ত্রিক চেতনা জাগরণের

মধ্য দিয়েও বিকশিত হয়। এর মধ্য উল্লেখযোগ্য গণতান্ত্রিক মাধ্যম গুলো হল- ব্রাহ্ম সমাজ, আর্য সমাজ, সোশ্যাল রিফর্ম কনফারেন্স এমনকি গান্ধী নেতৃত্বাধীন জাতীয় কংগ্রেস, গান্ধী প্রতিষ্ঠিত নিখিল ভারত হরিজন সংঘ, অল ইন্ডিয়া ডিপ্রেসড ক্লাসেস ও অল ইন্ডিয়া ডিপ্রেসড ফেডারেশন অন্যতম। এছাড়া এই বিষয়ে সর্বাগ্রে যিনি স্মরণীয় তিনি হলেন ড. বি আর আম্বেদকর। ১৯৩২ খ্রিষ্টাব্দে নিখিল হারিজন সেবক সংঘের মাধ্যমে সমাজ সংস্কার ও শিক্ষা প্রসারের ব্যাপক প্রয়াস চলতে থাকে। এই সূত্র ধরেই মানুষের সহায়তার জন্য বোম্বায়ের কংগ্রেস সরকার 'বম্বে হরিজন টেমপিল্ ওরশিপ অ্যাক্ট [Bombay Harijan Temple worship Act (Removal of Disabilities)] পাশ করেন। এর ফলে মধ্যপ্রদেশ ও বিহার সরকার প্রাথমিক থেকে বিশ্ববিদ্যালয় পর্যন্ত হরিজনদের জন্য অবৈতনিক শিক্ষার ব্যবস্থা করেন। এইরকমে এইসমস্ত সংগঠন গুলোর মাধ্যমে নানান বাধা কাটতে থাকে এবং যে সমস্ত জায়গায় তাদের বিচরনে বাধা ছিল সেই অস্পৃশ্যতার বিষয়গুলো কিছুটা কমেছিল সেদিন।

এইভাবেই শিক্ষার প্রসারেও নানান বিধি নিষেধ ছিল। প্রাক ব্রিটিশ যুগে শিক্ষা কেবল ব্রাহ্মন সম্প্রদায়ের মধ্যে প্রচলন ছিল। সে সময় আধুনিক শিক্ষার প্রসারে যারা ব্রতী ছিলেন তাঁরা হলেন খ্রিস্টান মিশনারীগণ, পাশাপাশি ব্রিটিশ সরকারেরও এই সমস্ত কাজের সঙ্গে যোগ ছিল। যা ভারতীয়দের চেতনার জাগরণে কাজেই এসেছিল। আর পাশাপাশি জাতীয় উত্তালের যে সময় ভারতবাসী পার করেছে সেখানে বঙ্গভঙ্গ আন্দোলন, খিলাফৎ আন্দোলন, অসহযোগ ও আইন অমান্য আন্দোলন এই সমস্ত আন্দোলন রাজনৈতিক সচেতনতা বৃদ্ধিতে সহায়ক ছিল। এইভাবেই ভাল-মন্দ বিবেচনা করার ক্ষমতা থেকে এল ব্রিটিশ সকারের প্রতি সমালোচনার মনোভাব। দ্বৈতশাসনের সময়ে ১৯৩৫ খ্রিষ্টাব্দে শিক্ষার ভার ভারতীয় মন্ত্রীদের হাতে আসে। সেখানে জানানো হয় শিক্ষামন্ত্রী

প্রাদেশিক আইনসভার কাছে শিক্ষার জন্য যাবতীয় দায়িত্ব নেবেন ও সমস্ত দায়িত্ব পালন করবেন। যার ফলস্বরূপ ১৯২১-৩৭ খ্রিষ্টাব্দ এই যে সময় সীমা এখানে শিক্ষার অগ্রগতি হয়। এইভাবেই কুসংস্কার বা নিরক্ষরতা যা কিছু জাতীয় জীবনে বাধা সৃষ্টি করে তা দূরীকরণের উপায় হিসাবে এবং চেতনার জাগরণের উপায় হিসাবে শিক্ষা হল একমাত্র পথ যা জনগণের পাথেয় হল। তখনই হল যুক্তি সচেতন মানসিকতার জন্ম, যা বিচার বিবেচনা করে গ্রহন এবং বর্জনের ক্ষমতা রাখে। এইভাবে এসময়ে বিভিন্ন প্রদেশে শিক্ষা সংক্রান্ত আইন পাস হয়েছিল। ১৯১৬ খ্রিষ্টাব্দে মদন মোহন মালব্যের প্রচেষ্টায় ভারতে প্রথম আবাসিক বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়। ১৯১৭ খ্রিষ্টাব্দে পাটনা ও মহীশূরে, ১৯১৮ খ্রিষ্টাব্দে হায়দ্রাবাদে ওসমানিয়া বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়। এইভাবে লক্ষৌ, ঢাকা ও আলিগড়ে বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপিত হতে দেখা যায়। এছাড়া বাঙালি হিসাবে আমাদের সকলের প্রিয় শান্তিনিকেতনে বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয় সেদিন (১৯২১ খ্রিষ্টাব্দে) রবীন্দ্রনাথের প্রচেষ্টায় প্রতিষ্ঠিত হয়। এমনকরেই এক এক করে সেই সময়ে ভারতের বিভিন্ন প্রান্তে বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল।

এইভাবে শিক্ষার প্রসার হতে শুরু করল এই প্রসঙ্গে নারী শিক্ষার বিষয় একটু আলোচনায় উঠে আসবে। এখানে নারীর শিক্ষা এবং ভারতের নূতন শাসন তন্ত্রে নারীর স্থান ও সমাজে তাদের বিচরনের ক্ষেত্র ও তাদের কার্যক্রম একটু দেখে নেওয়ার চেষ্টা করব। প্রথমেই দেখা যায় নারী শিক্ষা বিস্তারের ফলে ভারতীয়রা পশ্চিমি বিজ্ঞান, দর্শন, সাহিত্য, ইতিহাস প্রভৃতি সম্পর্কে জ্ঞান অর্জনের সুযোগ পায়। এই সূত্র ধরেই যুক্তিবাদী মন পরাধীনতার গ্লানি মোচনের জন্য আগ্রহী হয়ে ওঠে। শিক্ষা, ধর্ম ও রাজনৈতিক আন্দোলন এবং সংস্কারের পাশাপাশি প্রগতির উপলব্ধী থেকে সেদিন নারী শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধী করে মানুষ, তাইতো সেদিন নারী পরাধীনতার গন্ডি অতিক্রম

করে, অন্তঃপুরের সংস্কার ভেঙে শিক্ষার ব্রতী হয়েছিলেন। উনিশ শতক থেকে এই শিক্ষার সূচনা হলেও তা ছিল উচ্চবৃত্ত, অভিজাত ও ব্রাহ্ম- সম্প্রদায়ের মধ্যে সীমাবদ্ধ। বিশ শতকেই প্রথম নারী শিক্ষা সর্ব স্তরের মধ্যে প্রসার লাভ করে। সাধারণত ব্রাহ্ম সমাজ, আর্য সমাজ, রামকৃষ্ণ মিশন এবং বিভিন্ন বিদেশী মিশন প্রভৃতি ধর্মীয় সংস্কার সংস্থা গুলো নারী শিক্ষার অগ্রগতির কাজে সেদিন বিশেষ ভূমিকা গ্রহন করেছিল। এই নারী শিক্ষা প্রসঙ্গে বিশেষভাবে উল্লেখ করতে হয় ১৯১৬ খ্রিষ্টাব্দে অধ্যাপক কার্ভে কর্তৃক নারী শিক্ষা প্রদানের জন্য প্রতিষ্ঠিত ভারতীয় মহিলা বিশ্ববিদ্যালয়ের নাম।

এই ভাবেই বিশ শতকের প্রথমে নারীর রাজনৈতিক আন্দোলনে বিচরন দেখা যায়। ১৯১৭ খ্রিষ্টাব্দে চম্পারন আন্দোলনের সময় নারী তাঁর চেতনার জাগরণ ঘটিয়ে বৃহত্তর রাজনৈতিক ক্ষেত্রে নেমে এসেছে। এই রকম ভাবেই বঙ্গভঙ্গ ও স্বদেশী আন্দোলনে নারীর অংশ গ্রহণ দেখা গেছে। এরপর যদি ভারতের নতুন শাসনতন্ত্রে নারীর স্থান দেখি একইরকম ভাবে ভোটাধিকার ও শিক্ষার প্রসঙ্গ এসে পড়বে। আইন সংস্কারের পর নারীরা নির্বাচনের অধিকার পাবে এই আশা ছিল। পাশাপাশি পুরুষদের সমান যোগ্যতা বিশিষ্ট নারীরাও সভ্যপদ প্রার্থী হতে পারবে এবং নির্বাচিত হলে তারা ব্যাবস্থাপক সভার সভ্যও হতে পারবে। যার ফলে পুরুষরা সময়ের অভাবে যে সমস্ত কাজ করে উঠতে পারে না নারীরা সেই সমস্ত বিষয়ে মনোযোগী হলে জাতির কল্যান সাধিত হবে। যাই হোক এই নতুন সংস্কার সাধনের কাজ হয় ১৯২৭ খ্রিষ্টাব্দে সাইমন কমিশনের আগমনে। শাসন ব্যাবস্থার উন্নতিকল্পে সংস্কারসাধনের কাজ করেছিলেন এই কমিশন যার হাত ধরেই ভারত-সংস্কার বিল পাস হয়ে আইনে পরিণত হয়।

পূর্বে পুরুষই হন বা মহিলাই হন সম্পত্তি যাদের আছে ভোট দেবার অধিকার ছিল তাদের, এখানে নারী-পুরুষে ভেদ ছিল না। সম্পত্তির হিসাবে যখন নিয়ম বেঁধে দেওয়া হয় তখন এই রকম মানুষের সংখ্যা কম থাকায় ভোট দাত্রীর সংখ্যা কম ছিল কারণ আমাদের দেশে তখন অল্প সংখ্যক মেয়েই সম্পত্তির অধিকারী ছিল। তবে নতুন সংস্কার আইনে এল বদল। সম্পত্তিগত গণ্ডি অতিক্রম করে অন্যান্য উপায় ভোটদানের যোগ্যতা নির্ধারিত হল। সেখানে ট্যাক্স দেবার প্রসঙ্গ গ্রাহ্য হল ভোটদানের ক্ষেত্রে। কোন পুরুষ বা নারী নূন্যতম ট্যাক্স বা ইউনিয়ন বোর্ডের ট্যাক্স বা মিউনিসিপাল ট্যাক্স বা ইনকাম ট্যাক্স দিতে পারলেই ভোটদানের অধিকার পাবেন। যার ফলে গরীব গ্রামবাসীদের অনেকেই ভোট দানের সুযোগ পাবে। ভোটদাত্রীর সংখ্যা বাড়ানোর উদ্দেশ্যেই এই সমস্ত সংস্কার সাধনের চেষ্টা। এর সঙ্গে মেয়েদের শিক্ষার বিষয় ভোটদানের যোগ্যতার বৃত্তে স্থান পেল। বাংলাদেশে তখন ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষা বা গভর্নমেন্টের অনুমোদিত অনুরূপ কোনো পরীক্ষায় পাশ করলে একুশ বছর বয়সের মেয়েরা ভোটের অধিকার পায় কিন্তু আমাদের দেশে এই নিয়ম ধার্য হলে তার সংখ্যা নগন্য হবে তাই লিখতে পড়তে পারলেই যাতে করে ভোট দেবার অধিকার পায় তা নিয়ে বিভিন্ন আন্দোলনের জাগরণ হয়। মেয়েরা নানান সঙ্ঘ ও সমিতির সঙ্গে একত্রিত হয়ে আবেদন জানানোর পরে এই আবেদন মঞ্জুর হয়ে লিখতে পড়তে পারা মেয়ে ভোটদানের আধিকার পেয়েছিল। এইভাবেই শাসন ব্যাবস্থায় মেয়েদের মতামত গ্রাহ্য হওয়ার লক্ষ্যে তাদের শিক্ষার কথা ভেবে বিভিন্ন স্কুল গড়ার উদ্যোগ নেয়। শিক্ষা বিস্তার তখন প্রধান লক্ষ্যে পরিণত হয়। ফলসরূপ শহরে শহরে, গ্রামে গ্রামে মেয়েদের জন্য বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা ও সেজন্য অর্থসংগ্রহ ইত্যাদি নানা কাজে সাহায্য করতে উদ্যোগী হয় গণতান্ত্রিক মানুষজন। এইভাবেই মেয়েরা ভোটদানের অধিকার পাবে এই সংকল্পে শিক্ষার আওতায় আনে, তবে কেন মেয়েদের ভোট দেওয়া

দরকার ছিল সেকথা প্রসঙ্গে একটু আসা যাক। দেশের বিপুল সংখ্যক জনগনের সঙ্গে একত্রে সমবেত হয়ে সুবিধা-অসুবিধা বিবেচনা করা এই জনবহুল দেশে সম্ভব নয়। তাই ক্ষুদ্র বিভাগে ভাগ করে এক এক নির্বাচক মণ্ডল (constituency) গঠিত হয়। এই নির্বাচক মণ্ডল থেকে কাউন্সিল বা ব্যাবস্থাপক সভায় প্রতিনিধি ঠিক করার কাজ চলত। নির্বাচক মণ্ডলের লোকেরাই তাদের প্রতিনিধি নির্বাচন করে। তাই নিজের নির্বাচকের প্রতি কর্তব্যে অবহেলা করলে ভবিষ্যতে তারা পুনঃনির্বাচিত না হওয়ার আশঙ্কা থাকে। তাই মেয়েদের ভোট দেবার প্রয়োজন আছে। যত ভোটদাত্রীর সংখ্যা বাড়বে প্রতিনিধিদের উপর মেয়েদের প্রভাব ততই বাড়বে। এই প্রতিনিধিদের মধ্যস্থতায় দেশের শাসনতন্ত্রে মেয়েদের প্রভাব পরোক্ষ ভাবে দেখা যায়। ভারতের নতুন শাসনতন্ত্রে মেয়েদের সম্প্রদায়ভাগ আছে নির্বাচনের সিটের ক্ষেত্রে। এর মধ্যে হিন্দুদের জন্য দুটি, মুসলমানদের জন্য দুটি এবং অ্যাংলো ইন্ডিয়ানদের জন্য একটি ধরা হয়েছিল। এক সম্প্রদায়ের ভোটাধিকারীরা কেবল নিজের সম্প্রদায় থেকেই প্রতিনিধি নির্বাচন করতে পারবে। একইভাবে পুরুষদের জন্যও একই নিয়ম দেখা গেছে। মেয়েদের ভোটারের সংখ্যা যত বাড়ানো হবে নির্বাচিত প্রার্থী তাদের কাছে ভোট প্রার্থী হওয়ার দরুন তাদের আশা, আকাঙ্ক্ষা, সুবিধাকে প্রাধান্য দিতে থাকবে। এইভাবে শিক্ষার উন্নয়নের হাত ধরে কলকাতা মিউনিসিপালিটিতে মহিলা কাউন্সিলর নির্বাচিত হয়, তিনি বাংলার প্রথম মুসলমান মহিলা কাউন্সিলর, নাম বেগম সাকিনা ফারুক সুলতানা মুয়াইদেজাদা। এইভাবেই বাংলা থেকে বিস্তৃতি লাভ করে মহিলাদের প্রাধান্য।

প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময় থেকেই জাতীয় স্তরে তিনটি মহিলা সংগঠন তৈরী হয় সেগুলি হল- উইমেন্স ইন্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশন (WIA), ন্যাশানাল কাউন্সিল অফ উইমান ইন ইন্ডিয়া (NCWI), এবং অল ইন্ডিয়া উইমেন্স কনফারেন্স (AIWC)। এগুলি ১৯১৭-২৭

খ্রিষ্টাব্দের মধ্যে তৈরী হয়। ১৯৩৭ খ্রিষ্টাব্দে কংগ্রেস সরকারের প্রবর্তনের পর ভারতীয় মহিলাদের প্রাদেশিক বিধানসভায় মন্ত্রী, আন্ডার সেক্রেটারি, ডেপুটি স্পিকারের পদে উত্তীর্ণ হতে দেখা গিয়েছিল। এছাড়া স্থানীয় পর্ষদ ও পৌরসভার সভ্যও হয়েছিলেন। এদের মধ্য সরোজিনী নাইডু, কমলাদেবী চৌধুরানী, বিজয়লক্ষ্মী পন্ডিত প্রভৃতি আন্তর্জাতিক খ্যাতি-সম্পন্না মানুষের নাম বিশেষভাবে উঠে আসে। এইভাবেই ভারতবর্ষের নারীরা শিক্ষা, স্বাস্থ্য, অর্থনীতি সমস্ত ক্ষেত্রে তাদের ভূমিকার গুরুত্ব বুঝতে পারে। তাইতো বহু আন্দোলন পর্বে যোগ দিয়ে নারী পেয়েছিল তার ভোটাধিকার। এখানে যারা সেদিন অগ্রনী ভূমিকা নিয়েছিলেন তাঁরা হলেন-বাংলার কুমুদিনী বসু, কামিনী রায়, অবলা বসু, মৃণালিনী সেন, সরলা দেবী চৌধুরানী, জ্যোতির্ময়ী গাঙ্গুলী প্রভৃতি প্রতিভাময়ী ব্যক্তিত্ব। এইভাবেই ১৯২৬ খ্রিষ্টাব্দে সর্বপ্রথম বাংলার মেয়েই এই অধিকার প্রয়োগ করেন। ফলে নারীরা পেল ধীরে ধীরে অন্তঃপুর থেকে বের হবার স্বাধীনতা। তাদের এই যাত্রায় উদারমনস্ক কিছু পুরুষের সহায়তা তারা সেদিন পেয়েছিলেন। সমাজে ভালো মন্দ বুঝে নেবার তাগিদ লক্ষ করা যায়। তাই বিভিন্ন কাজের জন্য আইন পাশ হয়। যেমন ১৯২৯ খ্রিষ্টাব্দে বাল্যবিবাহের ক্ষতিকর দিক চিন্তা করে Child marriage Restraint Act পাশ হয়। এখানে মেয়েদের বিয়ের বয়স ১৪ বছর ও ছেলেদের ১৮ বছর ধার্য করা হয়। পর্দা প্রথা ও দেবদাসী প্রথার বিরুদ্ধেও সেদিন মানুষকে আওয়াজ তুলতে দেখা গিয়েছিল। বরোদার মহারাণী অল ইন্ডিয়া উইমেন্স এডুকেশনাল কনফারেন্স, ১৯২৭ (All India Women's Educational Conference, 1927)- এ পর্দা প্রথার বিরুদ্ধে সোচ্চার হয়েছিলেন। ডঃ মুথুলক্ষী রেড্ডি ও তাঁর সহযোগী আন্দোলনকারীদের প্রচেষ্টায় ১৯২৫ খ্রিষ্টাব্দে একটি আইন চালু হয় যার দ্বারা নাবালিকাকে নীতি বহির্ভূত কাজ করানো অপরাধ বলে ঘোষণা করা হয়। এইভাবে এক এক করে স্বাধীনতা লাভের সঙ্গে সঙ্গে নারীর মধ্যে সচেতনতা বোধ জাগে, স্বনির্ভর

হওয়ার তাগিদও বাড়ে। এই তাগিদ পূরণের লক্ষ্যে নারীকে দেখা যায় অন্য ভূমিকায়, অন্যরূপে।

বিশশতকের শুরুতে মেয়েদের শ্রমের কেন্দ্র ছিল চা, পাট আর কয়লা (১৯১১ খ্রিষ্টাব্দে)। ১৯০১ খ্রিষ্টাব্দে ২৯ শতাংশ থেকে ১৯২১ খ্রিষ্টাব্দে ১২ শতাংশে দাঁড়িয়েছে এই প্রবণতা। ১৯৬১ খ্রিষ্টাব্দে এই প্রবণতা ধীরে ধীরে কমতে থাকে, সঙ্গে সঙ্গে কৃষিকাজ ও বাইরে গৃহভৃত্যের কাজের প্রাধান্য বাড়ে। এইভাবে বাড়ির মহিলারা নিজেদের কাজ ছোটো বাচ্চাদের সামলাতে দিয়ে এক ঘর থেকে অন্য ঘরের কাজ করত। এরপরে প্রবণতাগুলো ধীরে ধীরে অন্য মাত্রা পেতে থাকে। তাই নুডলস বানানোকে অবলম্বন করে উপার্জন করতেও দেখা গিয়েছিল (বেলঘরিয়ার স্মৃতি শীলের চাউ তাঁর উদাহরণ)। এইরকম করে পেশার মধ্যে বিচিত্রতা লক্ষ্য করা যায়। নুডলস- এরপর মৎস্য শিকারকেও উপার্জনের পাথেয় করেছিলেন মেদনীপুরের মীনাক্ষী মান্না। তাইতো বড়ি বানানো, পাঁপড়, কাসুন্দী ইত্যাদিও তখন উপার্জনের আওতায় আসে। বিশশতকে জাগরণ হওয়া আত্মবিশ্বাস ও আত্মপরিচয়ের অন্বেষণে অর্থনৈতিক স্বাবলম্বনকে গ্রহণ করতে দেখা গেছে। এছাড়াও আইনগতভাবেও আসে বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ যেমন-বিবাহ আইন, উত্তরাধিকার আইন, পণপ্রথা বিরোধী আইন, এমনকি গর্ভপাত আইনও সেদিন সম্মত হয়েছিল। সতীদাহ রুখতে কমিশন বসানো হয় স্বাধীনতার পর পাঁচের দশকে। এইভাবে এই শতকে নারী স্বনির্ভর হচ্ছে, শিক্ষার স্বাধীনতা পাচ্ছে, শিক্ষিকা বা সেবিকার কাজে বাঙালি মেয়ের যোগদান দেখা গিয়েছিল।

সমাজ, রাজনৈতিক পরিমণ্ডল, শিক্ষা, মেয়েদের অবস্থান এগুলোর যে ছবি বর্ণনা থেকে পেলাম তার সঙ্গে সঙ্গে ঐ সময়ে সংস্কৃতিতে কেমন প্রভাব পড়েছিল তা দেখে

নেওয়ার চেষ্টা করব। এই সংস্কৃতির আলোচনায় সাধারণ জীবনের পরিবর্তমান সমাজ পরিস্থিতি ও তার প্রতিক্রিয়ার কথা অবশ্যই মাথায় রাখতে হবে। ইতিপূর্বেই আমরা দেখেছি দেশের বুকে ঘটে গেছে নানান যুদ্ধ, আন্দোলন, ধর্মঘট, দুর্ভিক্ষের পরিস্থিতি। এই সমস্ত ঘটনার প্রেক্ষিতে প্রতিক্রিয়ার পরিস্থিতি দেখে নেওয়ার চেষ্টা করব। এই ঘটনাগুলি থেকে কি আমাদের প্রতিক্রিয়া সে সমস্ত বিষয় চলচ্চিত্রে উঠে আসে। এই দেশের যে উত্তাল ছবি আমরা দেখলাম সেখানে দুর্ভিক্ষকে কেন্দ্র করে কালো বাজার দেখা যায় আর দেখা যায় ভুখা মানুষের কান্না ও মৃত্যু। 'নবান্ন' নাটকের মাধ্যমেই এই সময়ের চিত্র বাস্তবতার ডাকে মানবিক ও শৈল্পিক দিক থেকে সাড়া দিতে গিয়ে তৈরী হয়ে গেল পরবর্তী গ্রুপ থিয়েটারের উপক্রমণিকা পর্ব। ১৯৪৮ খ্রিষ্টাব্দে গঠিত হল বহুরূপী। যুদ্ধের খবর পাঠের আগ্রহে সংবাদপত্রের পাঠক সংখ্যা বৃদ্ধির কারণে রিডিং পাবলিক গড়ে উঠতে লাগল। এই রিডিং পাবলিককে বিনোদিত করেছে যাযাবরের দৃষ্টিপাত। যামিনী রায়ের মতো চিত্রকরদের লোকশিল্পবোধ চিত্রপটে ও ভাস্কর্যে ধরে দিতে থাকল। এইভাবে এইসময়ে গণনাট্য, গণচেতনা, গণবিক্ষোভ শব্দগুলো দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের কালে গুরুত্বপূর্ণ। গণ-শব্দটি পিপল শব্দের সঙ্গে সম্পর্কিত, মাস (Mass)-জনমণ্ডলী, মব (Mob)- হল জনযূথ। 'জনযূথ' শব্দটি আমরা সুমন্ত বন্দ্যোপাধ্যায়ের লেখায় পাই। শ্রমিক জনতা, কৃষক জনতা এই সমস্ত শব্দও লেখকের ব্যাবহারের দ্বারা আলাদা আলাদা ব্যাঞ্জনা পায়। তাই কি আমাদের প্রতিক্রিয়া এই সমস্ত শব্দ ব্যবহারে সেটাই বিষয়। এই শিল্প নগরীতে শ্রমিক সংঘবদ্ধভাবে আন্দোলন করে, তা গণরূপ ধরে। Mass বা জনতা চিন্তা করে, চিন্তার আভিঘাতে সাড়াও দেয়। Mob বা জনযূথ তা দেয় না। জনযূথ জনসাধারণের অংশ কিন্তু জনসাধারণ জনযূথ নয়। সেদিনের রেলওয়ের কামরার মতো সংস্কৃতির ইন্টারক্লাসও বিদায় নিল, সবই গণমুখি ধারায় প্রবাহমান। তাই বেস্টসেলার, আর্টফিল্ম এবং বানিজ্যিক

ফিল্ম সবদিকেই হল রুচিবিভাজন। তপন সিংহ বা তরুণ মজুমদার এবং আরও কয়েকজন পরিচালক শেষোক্ত পর্যায়ে পড়ে না। এনারা জনযূথকে ভাবেনি গণমাধ্যমকে ব্যবহার করেছেন। উপন্যাসের ক্ষেত্রেও বিভাজন দেখা যায় পাঠক মহলে। অভিজাত ও শিল্পজ্ঞ পাঠক অমিয়ভুষণ বা কমলকুমার পড়েন। একেবারে সাধারণ পাঠক বিমল মিত্র পড়েন। কলেজস্ট্রীট ও পাড়ার লাইব্রেরীতে নারায়ণ সান্যাল, বুদ্ধদেব গুহ, শংকর, নিমাই ভট্টাচার্য অপ্রতিরোধ্য। এভাবেই নজরে পরে বুদ্ধদেব দাশগুপ্ত, গৌতম ঘোষ, উৎপলেন্দু চক্রবর্তীর শিল্পসিদ্ধ ফিল্ম প্রেক্ষাগৃহে খুব কম দিন চলে অন্য দিকে অ্যাকশনে ভরা বোম্বে ফিল্ম প্রেক্ষাগৃহে দারুন চলে। এইরকম ভাবেই কমলকুমার মজুমদারের উপন্যাসের বা গল্পের পাঠক কমে। এই কারণে মুক্ত ভাবে একটা প্রতিযোগিতার বাজারের ছবি আছে। পাঁচের দশকে গ্রুপ থিয়েটারের পাশাপাশি লিটল ম্যাগাজিন ও বেশ জায়গা জুড়ে নিল পাঠক মহলে। আর্ট ফিল্ম ও আধুনিক কবিতার বিষয়ও দেখা যায়।

একইভাবে দূরদর্শন ও বেতারের প্রসঙ্গ আসছে। দুটিই জণগনের সঙ্গে সংযোগের মাধ্যম। কালের নিয়মে বেতার খালি কণ্ঠের মাধ্যমেই জণগনের সঙ্গে সংযোগ করতে পারে। দূরদর্শন দৃশ্য, স্বর এর মাধ্যমে সংযোগ সাধন করে। তবে কিছু ক্ষেত্রে বেতারের কাছে দূরদর্শন মলিন হয়ে যায়- যেমন মহালয়ার সকালবেলায় বেতারে প্রোগ্রামের কাছে দূরদর্শন ফিকে এছাড়াও দূরদর্শনের উচ্চারনেরও কিছু ত্রুটি থাকে খবর পাঠে। আবার রবীন্দ্রনাথের গোরার যে চিত্র দূরদর্শনে দেখানো হয় তা 'সিলি' প্রমান হয় বরং তা শ্রুতির আখড়ে বেতারের পাতায় তা উজ্জ্বল। আবার দুর্গা পূজাকে কেন্দ্র করেও ১৯৩৮ খ্রিষ্টাব্দে যে পারিবারিক পূজা, পট পূজা, সবই আজ হারিয়ে গিয়ে ক্লাব কেন্দ্রিক সার্বজনীন দুর্গাপূজায় পরিণত হয়েছে। এখানে মন্ত্র থেকে যন্ত্র বেশি প্রাধান্য পায়। তাই পূজাকে কেন্দ্র করে যে জনস্রোত তা পূর্ব কথিত mob নয়। মব একটা মানসিক বিকারের

কদাকার মূর্তি জনস্রোত একটা সবলীলতা। এছাড়া নারীবাদের বিষয়টিকেও পুরুষের প্রশ্রয়ের দৃষ্টিতে দেখার দরুন নারীবাদ বিষয়টা জমকালো হচ্ছে না। এখন আসি ভাষার প্রসঙ্গে ধীরে ধীরে বাংলার ব্যবহার কমছে। তাই মানুষের মুখে টেগোরস্ বার্থ ডে শোনা যায়। তখন পাঠশালায় বাংলা বই পড়ত পরে হিন্দি আরও পরে জানা যায় গল্প পাঠে উদাসীনতা। বিভিন্ন গানেও সমাজের বিভিন্ন ছবি উঠে আসতে দেখা গেছে। আর বিশ শতকে যে জাগরণ সেখানে সত্যজিৎ রায়ও ছিলেন একজন অসীম তারকা। যাই হোক সাহিত্য, সংস্কৃতি আলোচনার মধ্যে দিয়ে দেখা গেল পালটে যাওয়ার গতি। সাজা, রাঁধা, বিয়ে বাড়িতে খাবারের যে ধরন তাও বদলাতে দেখা গেছে। তাইত বিভিন্ন লেখিকাদের লেখাতে যে খাবারের বিবরণ পাওয়া যায় তা সময়ের সঙ্গে সঙ্গে পরিবর্তমান। এখন বিজ্ঞাপনের আওতায় ম্যাগি, চাওমিন, নুডলস -এর মত খাদ্যের যোগ হয়েছে খাদ্য তালিকায়। সংস্কৃতির মধ্যে অনেক পরিবর্তন এলেও সংহতিই একমাত্র কাম্য। সাধারনের জন্য সমাজ ও সংস্কৃতি এই ভাবনা আমাদের সর্বদা মনে রাখতে হবে। যেটা আমাদের উন্নত সংস্কৃতির পরিচয় দেয়।

কৃষি, শিল্প সংস্কৃতি সম্পর্কে একটু পরিচিত হবার পর সমাজ ও বিভিন্ন বিধান এইগুলো একটু দেখে নেওয়ার চেষ্টা করব। ব্যক্তি বা গোষ্ঠী তাদের পারস্পরিক মেলবন্ধনের সূত্রেই সমাজকে বেঁধে রেখেছে, ক্রমাগত মানুষ -এর চলে অস্তিত্ব রক্ষার লড়াই। মানবিক আবেগ, বিশ্বাস, কামনা- বাসনা, চাহিদা প্রভৃতিতে বাঁধা মানুষের জীবনে গূরুত্ব লাভ করেছে সাধারন প্রয়োজন, সামগ্রিক সমস্যা, মানব জাতির অগ্রগতি, সভ্যতার বিকাশ, মানবিক মূল্যবোধের প্রসঙ্গ। সমাজে বসবাস করতে গেলে একে অপরের সঙ্গে কথপোকথন, কাকে মান্যতা দেবে, কিভাবে সম্বোধন করবে তার জন্য বেশ কিছু রীতি-রেওয়াজ আছে বা ধাঁচ আছে। সমাজের মানুষ তা পালন করে চলে। এইভাবে গোষ্ঠীবদ্ধ

ভাবে বসবাসের ফলে বেশ কিছু রীতি নীতি, প্রথা, বিধান গড়ে ওঠে যাকে মেনেই মানুষ দিনযাপন করে। সমাজ সম্পর্কে ম্যাক্ আইভারের বক্তব্য উদ্ধার করা গেল –

"Society is a system of usage and procedures, of authority and mutual aid of many groupings and divisions, of controls of human behaviours of fiberties." ৬

অর্থাৎ সমাজ হচ্ছে প্রথা পদ্ধতি মিশ্রিত, পারস্পরিক সহযোগিতা আশ্রিত, আচার, নীতি নিয়ন্ত্রিত, স্বাধীন ভাবে এগিয়ে চলার একটি মাধ্যম।

এই সমাজে মানুষের অবয়বে কিছু মিল-অমিল থাকেই। সব থেকে বেশি পার্থক্য ভাবনায়। তাই বুদ্ধি, যুক্তি, বিবেচনায় যে দক্ষ সেই মানুষই সমাজে স্বতন্ত্র্যতা লাভ করে। এইভাবেই সে সবার কাছে মান্যতা পায় যার সূত্র ধরেও আসে সংঘাত। এই মান্যতার প্রসঙ্গ থেকেই আসে দলপতি ভাবনার বিষয়। এই দলপতি যখন নেতৃত্ব দান করতে থাকে তার নেতৃত্ব নিয়েও বাধে সংঘাত। এই দলপতি তার প্রিয় পাত্রকে নেতৃত্ব দান করতে বলে এইভাবেই চলে বিষয় গুলো। যা নানান সমস্যার উদ্রেক করে। যাই হোক তবু দলপতির নির্দেশেই চলত সমাজ।

সভ্যতার আদিযুগে যখন বিজ্ঞানমনস্কতা বাড়েনি তখন থেকেই রোগ, নানান সমস্যা সব কিছুরই রক্ষা কর্তা ধর্ম গুরু জাতীয় ব্যক্তিরা, তখন নানা বিধান প্রবর্তিত হতে দেখা গিয়েছিল। যা লিপিবদ্ধ হত না সবই থাকত মৌখিক আকারে। মানুষের চিন্তা পরিবর্তনশীল তাই সামাজিক বিধানে যাতে সংশয় না আসে তার জন্য বিধান লিখিত না হওয়ায় তাকে দেবতার বানী বলে মানার নির্দেশ থাকত। তারপর লীপির আবিষ্কার হলে লিখিত রূপ পায় যার ফলে এর বিশ্বাসযোগ্যতা আরও বৃদ্ধি পেল। এই ভাবে সমাজের প্রেক্ষিতে এই বিধানের রূপেভেদ দেখা যেত। কখনও কখনও বিধান আইনগত ভাবে স্বিকৃতি পেত।

একই রকমভাবে মৌখিক ও লিখিত বিধানের স্থায়ীত্বের কম বেশি ব্যাপার লক্ষ্য করা যায়। অতীতে আইন মানে প্রথা ধর্মকে বোঝাত পরে একাদশ শতকে ইউরোপের বিভিন্ন আইনে রোমান উপাদনের খণ্ড খণ্ড ভাব দেখা গেছে, রোমান আইনের দুর্বলতা দেখিয়ে আইনের একটি ধারা প্রতিষ্ঠার ঝোঁক দেখা যায়। ফলত জাস্টিসিয়ান আইনের ধাঁচে এক আইন দেখা গেল। প্রথা, ধর্ম, ন্যায়বিচার ইত্যাদির উৎস থেকে আইন প্রণয়নের বিষয়টি গুরুত্ব পূর্ণ হয়ে ওঠে। প্রাচীনকালে সমাজে রাজতন্ত্র জিনিস টার প্রাধান্য ছিল, তাই মনু সংহিতার রাজ ধর্ম নামক সপ্তম অধ্যায়ে রাজার উৎপত্তি সম্পর্কে বলা হয়েছে-

" অরাজ্কে হি লকোহস্মিন্ সর্বতো বিদ্রুতে ভয়াৎ।

রক্ষার্থমস্য সর্বস্য রাজানমসৃজৎ প্রভুঃ ।।

ইন্দ্রখানিলয়মাকাণামগ্নেশ্চ বরুনস্য চ।

চন্দ্র বিত্তেশয়োশ্চৈর মাত্রা নিহৃত্য শ্বাশ্বতীঃ ।।" ৭

অর্থাৎ রাজশূন্য এজগতে চারিদিকে ভয়ে জগতের রক্ষার জন্য ঈশ্বর ইন্দ্র, বায়ু, অগ্নি, বরুণ, চন্দ্র ও কুবেরের শাশ্বত অংশ গ্রহণের মাধ্যমে রাজাকে সৃষ্টি করেছিলেন। যেহেতু বিভিন্ন দেবগনের অংশ থেকে রাজার সৃষ্টি তাই সকল জীবকে তেজে অভিভূত করাই রাজার কাজ। তাই রাজা ও দেবতাকে একই আসনে বসানো হয়।

উপরোক্ত আলোচনায় ক্ষমতা কার হাতে থাকবে তা দেখা গেল। এছাড়াও সমাজে জাতিভেদ ছিল এবং সমাজ বিধানে এর মাত্রা ছিল। এর পাশাপাশি শাস্তি দানের মধ্যেও প্রভেদ দেখা যেত যেমন-

১। নিম্ন বর্ণের লোক উচ্চ বর্ণের কন্যার কাছে গেলে দণ্ড হবে বধ। সম বর্ণের কন্যা গমনে বধদণ্ড হবে না, কন্যার পিতা চাইলে শুল্ক ধার্য হবে।

২। উচ্চ বর্ণের নারীর সঙ্গে মিলনের ফলে নিম্ন বর্ণের মৃত্যু দণ্ড ছিল কিন্তু ব্রাহ্মনরা সেই একই কাজ করলে তার জন্য হত জরিমানা। মনুসংহিতায় বলা আছে–

"অগুপ্তে ক্ষত্রিয়াবৈশ্য শূদ্রাং বা ব্রাহ্মণো ব্রজন্ ।

শতানি পঞ্চ দন্ড্যঃ স্যাৎ সহস্রন্ত্বন্ত্যজস্ত্রিয়ম্ ।।" ৮

অর্থাৎ অরক্ষিতা ক্ষত্রিয়া, বৈশ্যা বা শূদ্রার কাছে ব্রাহ্মন গেলে পাঁচ শত পণ দণ্ড হিসাবে ধার্য হবে, চন্ডালী গমনে এক হাজার পণ দণ্ড হবে। এই ভাবেই বিভিন্ন নিয়মে তফাৎ দেখা যায় জাত পাত ভেদে। পৃথিবীর সর্বত্রই প্রাচীন কালে রাজতন্ত্র ও যাজক তন্ত্রই প্রধান ছিল। প্রাচীনকালে তবে কিছু ক্ষেত্রে নারীর বিভিন্ন অধিকার ছিল কিন্তু মধ্যযুগীয় পুরুষতান্ত্রিক সভ্যতায় নারীকে তার সমস্ত অধিকার থেকে বঞ্চিত করা হয়। শুধু তাই নয়, পুরুষ শাসিত সমাজে সামাজিক ও ধর্মীয় বিধানের ক্ষেত্রে নারীর অধিকার সঙ্কুচিত করা হয়। সমাজ সংস্কার আন্দোলনে নারীর অধিকার বিষয়টি নজরে আসে। নারী বিধবা হলে বিধান, পর্দা প্রথা সবই প্রচলিত ছিল সমাজে এমনকি ইংরেজ শাসনকালে ইংরেজ ও ভারতীয় অপরাধী একই অপরাধের জন্য ভিন্ন শাস্তি পেতে দেখা গেছে। যাইহোক এ সমস্ত কিছুরই পরিবর্তন সাধিত হয় রোমক সাম্রাজ্যের হাত ধরে। খ্রিষ্ট আবির্ভাব থেকে সমাজ বিধান এ এল সীমারেখা, ধর্মীয় বিধানের নিয়ন্ত্রক হল ধর্মগুরু।

অন্য দিকে যখন আইন প্রণয়ন হচ্ছে তখন আদালতের উপর আস্থা রাখছে মানুষ। ধর্মীয় বিধান ও আইন ভিন্ন দুটি বিষয়। যাই হোক বিচার, বিবেচনা, যুক্তির উপর ভিত্তি করে এক এক করে ভিন্ন ভিন্ন আইন পাশ হতে থাকল যেমন পণপ্রথা সংক্রান্ত আইন, গর্ভপাত ও কন্যাভ্রূণ হত্যা সংক্রান্ত আইন প্রভৃতি। তবে যাই হোক সমস্ত আইনই সময়ের সঙ্গে প্রয়োজনে পরিবর্তিত হয়েছে। এ প্রসঙ্গে ওই সময়কাল ছাপিয়ে কিছু এগিয়ে

কয়েকটা আইনের কঠোরতর সিদ্ধান্তের হদিশ পাওয়া যায় তা হল – ১৯৯৪ খ্রিষ্টাব্দে কেন্দ্রীয় সরকারের ভ্রূণ হত্যা নিয়ে নিষিদ্ধতার নিয়ম উল্লেখ ছিল, সেটা ২০০৩ খ্রিষ্টাব্দে কিছুটা পরিবর্তিত করে আরও কঠোর করা হয়েছে। অতি সম্প্রতি কালে বৃদ্ধ পিতামাতার দেখাশোনার জন্যও আইন (২০০৮) প্রণয়ণ করার কথা ভাবা হচ্ছিল রাষ্ট্রের পক্ষ থেকে।

এরপর সামাজিক অনুশাসনের কথায় আবারও আসি যা কিন্তু আইন নয়। তবে সামাজিক বিধানও পরিবর্তনশীল। বিভিন্ন সমাজের সামাজিক বিধানও ভিন্ন। তাই মুসলমান ও আদিবাসী সমাজের সমাজ বিধান ভিন্ন। সমাজ বিধান পরম্পরায় বাহিত অভ্যাস তাই ব্যাক্তি ও সামাজিক অনুশাসনের মধ্যে সংঘাত তৈরী হতে দেখা যায়। তাই ধীরে ধীরে আইন সমাজ বিধানের পরিবর্তন সাধন করে।

তাইত একটা সময় ছিল যখন বিলাত গেলে অর্থাৎ সাগর পাড়ি দিলে তাকে ম্লেচ্ছ বলা হত এবং এক ঘরে করে দেওয়া হত। সেকালে সাহিত্যের মধ্যে তার প্রভাব আছে। দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের ‘একঘরে’ প্রহসন-এ সেই চিত্রই পরিলক্ষিত হয়। এছাড়া সেই ভাবনা ধীরে ধীরে পরিবর্তিত হয়ে এখন বিলাত যাত্রা একটা রেওয়াজ-এ পরিণত হয়েছে। এইভাবেই সমাজের সমস্ত কিছুই সাহিত্যের আধারে পরিণত হয়। এছাড়াও দেখা যায় বিচার -এর ক্ষেত্রে সমাজ বিধান দাতা যা মত প্রকাশ করবেন তার বৈধতা অবৈধতা বিচারের সাধ্য মানুষের থাকবে না। সমাজ বিধানের সঙ্গে সাহিত্যেরও যোগ আছে। মানুষের কষ্ট, নাপারা, সবই সাহিত্যে স্থান পায় সাহিত্য মানব মনের সচেতন জায়গা, তাই সাহিত্য নিয়ে বলা যায়-

> “সাহিত্য অর্থেই একত্র থাকিবার ভাব – মানবের
>
> সহিত থাকিবার ভাব – মানবকে স্পর্শ করা,

মানবকে অনুভব করা।“ ৯

অর্থাৎ সাহিত্য হল সমাজের বুকে ঘটা ঘটনার প্রকাশ। তাই বঙ্কিম চন্দ্রের ভাষায় বলতে হয় -

“সাহিত্য দেশের অবস্থা এবং জাতীয় চরিত্রের প্রতিবিম্ব মাত্র।

যে সকল নিয়মানুসারে দেশভেদে, রাজ বিপ্লবের প্রকারভেদ,

সমাজ বিপ্লবের প্রকারভেদ ঘটে, সাহিত্যের প্রকারভেদ সেই

সকল কারনেই ঘটে।“ ১০

উদাহরণ হিসাবে রামায়ণ, মহাভারতের পাতায় পাতায় সামাজিক বিধির বিষয় চোখে পরার মত। রামায়ণের আদর্শ আজও আমাদের সমাজকে প্রাভাবিত করে তাই ভ্রাতার সঙ্গে সম্পর্ক, দায়িত্ব পালন প্রভূতি প্রসঙ্গে রামের নাম উঠে আসে তুলনা করার জন্য। এছাড়াও রামায়ণে ‘শম্বুকের শিরচ্ছেদ অগস্ত্য’ পরিচ্ছেদে রাজ্যে এক বালকের মৃত্যুকে কেন্দ্র করে বর্নাশ্রম বিধির স্বরূপ স্পষ্ট হয়। শিরচ্ছেদের সময় দেবগন বললেন-

“রাম তুমি আমাদের প্রিয় কার্য করেছে, তোমার জন্যই শূদ্র

স্বর্গাধিকারী হল না। তুমি অভীষ্ট বর প্রার্থনা কর।“ ১১

এইরকমই বিধান- এর প্রচলন দেখতে পাওয়া যেত।

অনুরুপভাবে ‘মহাভারতেও’ ‘অস্ত্রশিক্ষা’ প্রদর্শন অংশেও জাতিভেদ নজরে আসে। এছাড়াও মহাভারতের নানান অধ্যায়ে নানান বিষয়কে কেন্দ্র করে বর্ণভেদ, জাতিভেদ, ব্রাক্ষ্মন অ-ব্রাক্ষ্মনভেদ স্পষ্ট। একলব্যের প্রসঙ্গ নীচ জাতির প্রতি ব্রাক্ষ্মণের অবমাননার জলন্ত উদাহরণ। এইভাবেই মহাভারতের প্রতি ধাপে ধাপে রাজনীতি, সমাজনীতি,

অর্থনীতি, ধর্মীয় ও নৈতিক বিধি - বিধান রাজধর্ম সবই দেখতে পাওয়া যায়। বাংলা সাহিত্যের বিপুল সম্ভারকে বিশ্লেষন করলে সামাজিক রীতি নীতি বিধি বিধানের স্বরূপ দেখা যায়। তবে চেতনার জাগরণে এই বিধান পরিবর্তনশীল। তাই যুগের সঙ্গে তাল মিলিয়ে সাহিত্যের ধাঁচ ও বিষয়ও বদলে যায়।

এইভাবেই পরিবর্তন সাধিত হয়ে আমরা উনিশ শতককেই আধুনিক বাংলা সাহিত্যের প্রস্তুতি পর্ব ধরে নিচ্ছি। এখান থেকেই ইংরেজদের সঙ্গে সংযোগের ফলে নবজাগরণ আসে, যা নতুন ভাবধারার জাগরণ ঘটতে সাহায্য করে। সমাজ সংস্কারের জন্য আন্দোলনের পথে নামে মানুষ যার ফল স্বরূপ- ১৮২৯ খ্রিষ্টাব্দে বেন্টিঙ্ক সতীদাহ প্রথা আইন করে রদ করেন, পিতার সম্পত্তিতে নারীর উত্তরাধিকার -এর দাবিও হয়। বিশ শতকে ১৯৫৬ খ্রিষ্টাব্দে ১৭ই জুন যে উত্তরাধিকার আইন সারা ভারতে চালু হয়েছিল তাতে হিন্দু মহিলার সম্পত্তির অধিকারের জন্য বেশ কিছু ধারা যুক্ত হয়েছে, ১৮৫৬ খ্রিষ্টাব্দে বিধবা বিবাহ আইন পাশ হয়, ১৮৯১ খ্রিষ্টাব্দে সহবাস সম্মতি বিল পাশ হয়। এই ভাবেই নিয়ম প্রবর্তন -এর সঙ্গে সঙ্গে তাকে বাস্তবায়িত করতে প্রয়োজন শিক্ষার। শিক্ষাই সমস্ত আইনকে ব্যাবহারে স্বচ্ছল করে তুলতে পারে। এছাড়াও আরও অনেক আইন পাশ হয়েছিল সমাজের কল্যানে তার মধ্যে কয়েকটির উল্লেখ করা প্রয়োজন। ১৯০৮ -এ মেয়েদের বিবাহ সম্বন্ধে দাবি তোলা হয় আইনে, ১৯০৯ খ্রিষ্টাব্দেও দাবি আবার তোলা হলেও সেখানে বিয়ের বয়স মেয়েদের ১৬ ছেলেদের ২৫ ধার্য হবার আর্জি থাকে তবে ১৯২৯ -এর আগে এই আইন পাশ হয়নি। ১৯১১ খ্রিষ্টাব্দে Special Marriage Bill- উত্থাপন হয়। যাতে রেজিস্ট্রেশনের মাধ্যমে বিবাহের কথা বলা থাকে। ১৯১৮ খ্রিষ্টাব্দে বিঠল ভাই প্যাটল অসবর্ণ বিবাহে স্বীকৃতি দেওয়ার উদ্দেশ্যে একটি বিল উত্থাপন করে। ১৯২৯ খ্রিষ্টাব্দে হরি বিলাস সারদা বাল্য বিবাহের বিরুদ্ধে একটি বিল উত্থাপন করে।

১৯২৯ খ্রিষ্টাব্দে পাস হয় বাল্য বিবাহ নিরোধক আইন (চাইল্ড ম্যারেজ রেসট্রেন্ট অ্যাক্ট)। ১৯৩০ খ্রিষ্টাব্দ থেকে এই আইন বলবৎ হয়। ১৯৩৮ -এ পরিবর্তন সাধন করে মেয়েদের বিয়ের বয়স ১৮ এবং ছেলেদের ২১ ধার্য হয়। ১৯৫৪ খ্রিষ্টাব্দে 'বিশেষ বিবাহ আইন' ১৯৫৫ খ্রিষ্টাব্দে 'হিন্দু বিবাহ আইন' এবং ১৯৫৬ খ্রিষ্টাব্দে 'হিন্দু উত্তরাধিকার আইন' পাস হয় যার ফলে বিবাহ ও পৈর্তৃক সম্পত্তিগত দিক থেকে নারীরা আইনের ক্ষেত্রে বেশ কিছু সুবিধা পায় যাতে করে তারা যথেষ্ট সম্মান লাভ করে এবং স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করে।

এই যে পরিবর্তন সাধিত হল তাতে সমাজের বুকে ঘটা নবজাগরনের প্রভাব অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। আর এই পরিবর্তনের চেহারা সাহিত্যের পাতায় পাতায় লক্ষ্য করা যাবে বিশ্লেষণ করে দেখলে। তাইত সেকালের বিধবার বিয়ে প্রসঙ্গে ঈশ্বর গুপ্তকে 'হিন্দু বিধবার আইন' কবিতায় বলতে শুনি-

"সীমা ছেড়ে নাহি খেলে সাগরের ঢেউ।।
সাগর যদ্যপি করে সীমার লঙ্ঘন।
তবে বুঝি হতে পারে বিবাহ ঘটন।" ১২

"বিবাহ করিয়া তারা পুনর্ভবা হবে।
সতী বোলে সম্বোধন কিসে করি তারে?
বিধবার গর্ভজাত যে হয় সন্তান।
'বৈধ' বোলে কিসে তার করিবে প্রমান?" ১৩

এইভাবে বিধবা বিবাহ, স্ত্রী শিক্ষা নিয়ে দ্বিধা, সংশয়- বিরোধিতা, বিদ্রূপ ও ক্ষোভ প্রকাশ পেয়েছে 'বিধবা বিবাহ', বাঙালির মেয়ে', 'দুর্ভিক্ষ' ইত্যাদি নানান কবিতায়।

এমনকি উপন্যাসেও প্রভাব দেখা দিয়েছিল যেমন বঙ্কিমচন্দ্রের ‘বিষবৃক্ষ’ উপন্যাসে বিধবা বিবাহের প্রসঙ্গ দেখতে পাওয়া যায়। এইভাবে সাহিত্যে বিধবার বিবাহ দিয়ে বিধবা বিবাহ সম্পর্কে সহমত পোষণ করেছিলেন লেখক। এছাড়া ‘রাধারানী’ উপন্যাসের রুক্মিণী কুমারের সঙ্গে বিবাহ প্রসঙ্গে কি জাত এই প্রশ্ন নায়কের মুখে এনে তিনি অসবর্ণ বিবাহের প্রতি অসম্মতি প্রকাশ করেছেন।

এবার ত্রৈলোক্যনাথ মুখোপাধ্যায়ের রচনা দেখে নেওয়ার চেষ্টা করব। তাঁর বিখ্যাত ‘কঙ্কাবতী’ উপন্যাসে তনু রায়ের বিধবা কন্যাদের দুর্দশায় তার মায়ের যে কষ্ট তাতে সে মনে মনে বিধবা বিবাহকে স্বাগত জানিয়েছে তাইতো বিদ্যাসাগরের দ্বারা বিধবা বিবাহ চালু হলে ঠাকুর কে সিন্নি দেবে বলে জানায়। এইবভাবেই ত্রৈলোক্যনাথ বিধবা বিবাহকেও স্বাগত জানিয়েছেন এবং স্ত্রী শিক্ষাকেও সমর্থন করেছেন। স্ত্রী শিক্ষা প্রসঙ্গে তনু রায়ের কন্যাদের কে বিয়ের জন্য শিক্ষিত করার প্রয়োজনীয়তার বিষয়টি রচনায় তুলে ধরেছেন। এসব থাকা সত্ত্বেও এইযে মেনে নেওয়া প্রসঙ্গে দ্বিধাগ্রস্ত দেখা যায় লেখককে। তাইতো কখনও মানে, কখনও মানে না সবটাই নিজের স্বার্থে। এইজন্য সমাজ ও মনকে প্রবোধ দিতে কঙ্কাবতী কে বিকারের মধ্যে রাখতে দেখা যায় উপন্যাসে।

এরপর রমেশচন্দ্র দত্তের লেখা নিয়ে আলোচনা করলে এই প্রভাব কেমন ছিল তা উঠে আসবে। তাঁর ‘সংসার’ উপন্যাসে বিধবা বিবাহের প্রভাব গ্রাম-শহর নির্বিশেষে কেমন তা দেখিয়েছেন। শেষ পর্যন্ত বিধবা বিবাহকে সমর্থন করতেও দেখা গেছে। ধীরে ধীরে উচ্চ শিক্ষিতের হাত ধরে স্বীকৃতি লাভ দেখিয়েছেন তাইতো রচনার শেষে লেখকের বক্তব্য -

“এখন দেশে উচ্চ শিক্ষার বিস্তার হইয়াছে, পুরাতন রীতিনীতি

বজায় রাখিয়া যতদূর সম্ভব সমাজের সংস্কার আরম্ভ হইয়াছে
এখন দলাদলি করিয়া 'একঘরে' করিবার ভয় আর বড় একটা
নাই।" ১৪

এভাবে বিধবা বিবাহকে স্বীকৃতি জানাতে দেখা যায় লেখককে। 'সমাজ' উপন্যাসে আছে অসবর্ণ বিবাহের প্রসঙ্গ তবে তিনি সেটাকে সমর্থন করেছেন। তাইতো দুই ভিন্ন বর্ণ সুশীলা ও দেবীপ্রসাদের বিবাহ ঘটিয়েছেন লেখক। এইভাবে নানান বিধান প্রসঙ্গে আইনের দিকটিও উঠে আসতে দেখা যায় বিভিন্ন রচনায়। এছাড়াও স্ত্রী শিক্ষাকে সেই সময় লেখকেরা সম্মান জানিয়েছিলেন তাইতো তাঁদের রচনায় নারীরা কমবেশি শিক্ষিত দেখা গেছে। এছাড়াও বঙ্কিমের সাহিত্যে বিধবা বিবাহ দেখালেও তাঁদের সুখি দাম্পত্য দেখায়নি এমনকি নারীকে স্বাধীনতা দিতে চেয়েও দ্বিধাগ্রস্ত। সেদিক থেকে রমেশচন্দ্র দত্ত তাঁর উপন্যাসে অসবর্ণ বিবাহ দেখিয়েও সুখি দাম্পত্য দেখিয়েছেন। তাতে করে তাঁর সমর্থনের বিষয়টা জোরালো ভাবে প্রকাশ পায়। এইভাবে আমরা সমাজ বিধানের ভাবনা, তাকে লালন করার মানসিকতা ও সচেতনতা বৃদ্ধি, সংস্কার সাধন, আইন প্রণয়ন, সাহিত্যে সমাজের ছাপ- এই সমস্ত বিষয় গুলোকে দেখতে পেলাম।

এইভাবেই রাজনৈতিক পরিমন্ডল, সমাজ, কৃষি, শিল্প, মেয়েদের অবস্থা ও তাদের কর্মকাণ্ডের ভূমিকা, বিভিন্ন আন্দোলন, সাহিত্য ও সংস্কৃতির যে চিত্র আমরা দেখতে পেলাম উপরে উল্লেখ করা বর্ণনায় সেই সমস্ত বিষয়ের মধ্যে শৈলবালা ঘোষজায়ার কথাসাহিত্য কিভাবে এবং কোন কোন বিষয়ে সমৃদ্ধ তা দেখে নেব পরবর্তী অধ্যায়ের আলোচনার মাধ্যমে।

তথ্যসূত্র

১। শৈলবালা ঘোষজায়ার গল্প সংকলন, ২০০০, কলকাতা, দেজ, পৃষ্ঠা-১৯৮

২। ঐ, পৃষ্ঠা-২০০

৩। অলোক রায়, জানুয়ারি ২০১৬, বিশ শতক, কলকাতা, প্রমা, পৃষ্ঠা- ৯

৪। স্বপন বসু ও হর্ষ দত্ত (সম্পা.), সেপ্টেম্বর ২০২০, বিশ শতকের বাঙালি জীবন ও সংস্কৃতি, কলকাতা, পুস্তক বিপণি, পৃষ্ঠা- ১৫৩

৫। অরুন্ধতী সুর (রায়), জুলাই ২০১১, নারীর কলমে নারীর কণ্ঠ: আইন এবং সমাজ বিধান (১৯১৪-১৯৪৫), কলকাতা, সহযাত্রী, পৃষ্ঠা- ৬

৬। ঐ, পৃষ্ঠা- ৩১

৭। ঐ, পৃষ্ঠা- ৩৫

৮। ঐ, পৃষ্ঠা- ৩৭

৯। ঐ, পৃষ্ঠা- ৪২

১০। ঐ, পৃষ্ঠা- ৪২

১১। ঐ, পৃষ্ঠা- ৪৩

১২। ঐ, পৃষ্ঠা- ৪৭

১৩। ঐ, পৃষ্ঠা- ৪৭

১৪। ঐ, পৃষ্ঠা- ৫৩

দ্বিতীয় অধ্যায়

সাহিত্যকৃতির দুই ধারা

(ক) শিক্ষামূলক রচনা-

উনিশ শতকে নবজাগরণের আলোয় আলোকিত শিক্ষিত ব্যক্তিত্বের মনে মেয়েদের শিক্ষা বিস্তারের প্রতি আগ্রহ দেখা গিয়েছিল। এই আগ্রহের অবদানেই সেকালিনীদের সামনে শিক্ষালাভের নতুন দিগন্ত খুলে যায়। তখনই মেয়েরা চারুপাঠ ও বোধোদয় কেন্দ্রিক যে শিক্ষা গ্রহনের মাপকাঠি নির্ধারিত ছিল সেদিন সেই বাঁধা ধরা গণ্ডি লঙ্ঘন করার পথ পেয়েছিল। এই প্রবণতার হাত ধরে উনিশ শতকের শেষাশেষি আরও কয়েকটা বালিকা বিদ্যালয় স্থাপিত হয়েছিল কলকাতা শহরে। শিক্ষালাভের এই প্রবাহমানতা ক্রমবর্ধমান এবং পরিবর্তনশীল। এই পথ ধরেই শিক্ষাক্ষেত্রে, রাজনৈতিক ক্ষেত্রে, বিদেশ বিভূঁইয়ে পা রেখেছেন সেকালিনীরা। এনাদের পথের ব্রতী হয়ে উনবিংশ শতকের মাঝ ও শেষার্ধে অনেক নারী কথা সাহিত্যিক তাঁদের অন্দরমহলের জীবনযাত্রা প্রণালী, আবহাওয়া, নারী মনের আশা-আকাঙ্খা, চিন্তাধারার মাধ্যমে তাঁদের সাহিত্যকে সাজিয়ে গেছেন যার কৃপায় আমরা সমৃদ্ধ। তাঁদেরই মধ্যে উল্লেখযোগ্য লেখিকা শৈলবালা ঘোষজায়ার কথাসাহিত্য আমার আলোচ্য বিষয় ।

নারীদের শিক্ষার জগতে এই যে এগিয়ে চলা তার একটা যদি ইতিহাস দেখতে চাই তাহলে নারীবাদের বিষয়টি একটু আলোচনা করে দেখতে হবে। এ প্রসঙ্গে নারীবাদ কি সেটা একটু দেখে নিতে হবে। নারীবাদ মূলত পশ্চিমী তাত্ত্বিক একটা ধারণা লিঙ্গ বৈষম্যভিত্তিক যে ব্যবস্থা চালু ছিল তার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ এবং সমতা আনার জন্য যে আন্দোলন তার থেকেই মূলত এই নারীবাদী ভাবনার উদ্ভব। এই নারীবাদ এর উদ্দেশ্যই হচ্ছে একটা লিঙ্গ বৈষম্যহীন সমাজ গড়ে তোলা, যেখানে নারী একটা নিজস্ব পরিচয়ে বেঁচে থাকতে পারবে। এই যে পুরুষদের আধিপত্য যুক্ত একটা সমাজ সেই সমাজ থেকে

নারীকে মুক্তি দিতে যে নারীবাদী ভাবনা সেখানে নানা তাত্ত্বিক আলোচনা আছে এবং মত রয়েছে এমনকি সেগুলোকে কেন্দ্র করে বহু মতভেদও তৈরি হয়েছে। এই তাত্ত্বিকদের মধ্যে বিভিন্ন ধরনের মত রয়েছে, বিভিন্নজন বিভিন্ন রকম ভাবে নারী বাদের বিষয়টাকে দেখছে। তবে সামগ্রিকভাবে বলতে গেলে নারীবাদের মধ্যে কতগুলি প্রধান বিষয় এক হয়ে যায় যেগুলি অনেকেই মানছে। সেই অনেকেই মানা বিষয়গুলির মধ্যে অন্তর্ভুক্ত হয়েছে পিতৃতন্ত্র, ব্যক্তি পরিসর ও গণপরিসরের মধ্যে বিভাজন, জৈবিক লিঙ্গ ও সামাজিক লিঙ্গের মধ্যে বিভাজন, সমতা ও ভিন্নতা, যৌনতা এবং নারী ও অর্থনীতি। এবারে এই উল্লেখ করা বিষয়গুলো আমি একসঙ্গে এক এক করে আলোচনা করব এবং তার ভিত্তিতে আর কি কি ধারা এখানে সংযুক্ত বা বিযুক্ত হচ্ছে এই বিষয়গুলিকে একটু দেখে নেওয়ার চেষ্টা করব। এ প্রসঙ্গে প্রথমেই পিতৃতন্ত্র বিষয়টা কি সেটাই বুঝে নেব। পিতৃতন্ত্র বলতে সাধারণত পিতার শাসনকেই বোঝায় মানে পুরুষ দ্বারা চালিত শাসনকেই পিতৃতন্ত্রের অন্তর্ভুক্ত করা হচ্ছে। এখানে দেখা যাচ্ছে যে নারীবাদী তাত্ত্বিক সিলভিয়া ওয়ালবি তার গ্রন্থে বলেছেন-

" পিতৃতন্ত্র হচ্ছে সামাজিক কাঠামো আর রীতি-নীতির এমন একটি ব্যবস্থা যেখানে পুরুষ নারীকে নিয়ন্ত্রণ করে নিপীড়ন করে এবং শোষণ করে"। ১

এখানে তিনি এটিকে একটি সিস্টেম বা ব্যবস্থা হিসাবেই দেখতে চান কারণ তার মতে নারী পুরুষের মধ্যে জৈবিক পার্থক্যের কারণে স্বাভাবিক বৈষম্যের যে ধারণাটি প্রচলিত যাকে বলা হয় জৈবিক নির্ধারণবাদ। সেই ধারণাকে উপেক্ষা করা যায় এই পিতৃতন্ত্রের কারণেই। নারীরা বিভিন্ন অবস্থার সম্মুখীন বিভিন্ন তাত্ত্বিকদের মতামত থেকে সেটা বোঝা যায়। তাই জন্যই এনাদের মতামত থেকে দেখা যায় যে নারীরা কখনো পুরুষদের থেকে ক্ষীণ আবার কখনও নারীরা দাসী বৃত্তির অধীনে থাকছে। এইরকম ভাবধারাগুলো আমরা

জানতে পারছি। এই পিতৃতন্ত্রের ধারণার পর আমরা ব্যক্তিগত পরিসর এবং গণপরিসরের মধ্যে কি দেখা যাচ্ছে সেটা একটু আলোচনা করব। এখানে নারীবাদীদের মধ্যে প্রশ্ন ওঠে বিভাজন নিয়ে, তারা দেখে পরিবারের ভেতরে থাকা নারীদের কাজ এবং বাইরেটা হচ্ছে পুরুষদের পরিসর, এই বিভাজনটা এই নারীবাদী তাত্ত্বিকরা মানছেন না তারা জানাচ্ছেন যে নারীরা যদি চার দেয়ালের মধ্যে আবদ্ধ থাকে তাহলে তাদের যে নিজস্ব স্বাধীন চিন্তাধারা রুচি ইচ্ছা সবকিছুর মধ্যে একটা বাধা দান করা হচ্ছে। এই দিক থেকে যদি দেখা যায় তাহলে নারীর ব্যক্তিগত পরিসর এবং গণপরিসরের মধ্যে যে পার্থক্য সেটা যুক্তিহীন হয়ে যাচ্ছে। এই প্রসঙ্গে ১৯৬০ আর ৭০ এর দশকে যে নারীবাদী আন্দোলনের স্লোগান সেটা যদি একবার লক্ষ্য করা যায় সেখানে বলা হচ্ছে-

“ দি পার্সোনাল ইজ পলিটিক্যাল। “ ২

অর্থাৎ ব্যক্তিগত ক্ষেত্রও রাজনীতি বহির্ভূত নয় আর যখনই ক্ষমতার প্রসঙ্গ আসছে তখনই দেখা যাচ্ছে নারীর উপর অধিপত্যর বিষয় তা পরিবার হোক বা বাইরেই হোক।

এরপর যে বিষয়টি আলোচনা করব তা হল জৈবিক লিঙ্গ এবং সামাজিক লিঙ্গের মধ্যে বিভাজন। এখানে নারীকে শারীরিকভাবে দেখা হচ্ছে, পুরুষের মতো সে শরীরের দিক থেকে অতটা সবল নয় তাই তার কাজ হচ্ছে সংসার সামলানো, সন্তানের জন্ম দেওয়া ও প্রতিপালন করা আর পুরুষেরা বাইরের কাজকর্ম করবে এই একটা ধারণা এবং একটা সীমারেখা নারীর জন্য। এই সীমারেখার মধ্যে নারী তার জীবন যাপন প্রণালী বিভিন্ন রকম রীতি রেওয়াজের দ্বারা বেঁধে রাখে যার থেকে বেরোবার পথ তাদের থাকে না এই মত গুলো থেকে নারীবাদীরা ভেবে নিয়েছেন যে এটা একটা সামাজিক কাঠামো এবং সমাজের তৈরি করে দেওয়া রীতি এবং নারীবাদী তাত্ত্বিক দের কিছু অংশ এটা মেনে

নিতে চায় না। এই গড়ে দেওয়া কাঠামো যেটা নারী তাত্ত্বিকরা দেখতে পাচ্ছেন সেই কাঠামো দেখে আমাদের মনে পড়ে যায় সিমোন দ্যা বোভোয়ার গুরুত্বপূর্ণ একটা কথা-

" মেয়েমানুষ জন্মায় না। তাকে তৈরি করা হয়। " ৩

অর্থাৎ কেউ নারী হয়ে জন্মায় না বরং নারী হয়ে ওঠে। এরপর আরেকটি বিষয়ে আমরা আলোচনা করব তা হল সমতা ও ভিন্নতা নিয়ে। এ প্রসঙ্গে সাম্যবাদের বিষয়টা বড় হয়ে দাঁড়ায়। এখানে নারী তাত্ত্বিকদের কিছু অংশ এই সমতার প্রসঙ্গে বলতে গিয়ে এবং সমতার নিয়ে আন্দোলন করতে গিয়ে তাঁরা শিক্ষার সমসুযোগ, সমান রাজনৈতিক প্রতিনিধিত্ব, ঘরের বাইরে কাজের সুযোগ ও আইনের সাম্য ইত্যাদি সমস্ত বিষয়ে সমতার একটা ব্যাপার আনতে চেয়েছেন কিন্তু এইটার বাইরে গিয়েও অনেকে মেয়েদের এই সন্তানের জন্মদান- প্রতিপালন করার বিষয়টাকে একটা মাত্রা দিচ্ছেন। এই যে যাঁরা মাত্রা দিচ্ছেন এবং এই কাজটাকে একটা আলাদা গুণের অধিকারী বলছেন তাঁরা এখানে সারবাদী নারীবাদী হিসেবে পরিচিত। এই সারবাদী নারীবাদী এনারা নারী পুরুষের মধ্যে যে ভেদ এবং এই ভেদাভেদের প্রেক্ষিতে তাদেরকে একটা আলাদা গুণ হিসাবে মাত্রা দিচ্ছেন সেটাকে তারা পরম্পরতার সঙ্গে জুড়ে দিচ্ছেন।

নারীবাদ এর সঙ্গে সম্পর্কিত পরবর্তী বিষয় হল যৌনতা। পুরুষদের অধিকার প্রদর্শনের জন্য এটা একটা মাধ্যম এটাও কোন কোন নারীবাদীরা বলছেন। তাই তাঁরা দেখাচ্ছেন যে এই যে বিভিন্ন বিষয়ে যৌনতা কামনা বাসনা প্রজনন সবকিছুর উপরে নারীর নিজের একটা অধিকার থাকবে নিজেরা নিজেদের বিষয়টাকে নিয়ন্ত্রণ করবে এটাই হওয়া উচিত, এখানে পুরুষেরা সে বিষয়ে হস্তক্ষেপ করবে না, এই বিশেষ ক্ষেত্রে নারীরা সক্রিয় ভূমিকা নেবে। এর পাশাপাশি কিছু কিছু তাত্ত্বিকরা আবার সমকামিতার

কথা বলছেন এই সমকামিতার কথা বলার মধ্য দিয়ে কিন্তু পুরুষ অধিপত্যের উপর একটা প্রতিবাদ নারী দেখাচ্ছে। যেন জানান দিচ্ছে আমরা আমাদের এই যে ব্যক্তিগত চাহিদা সেটা নিজেদের মধ্যেও মিটিয়ে নিতে পারি, সে ক্ষেত্রে পুরুষের প্রয়োজন নেই এটাও একটা প্রতিবাদ পুরুষতান্ত্রিক কাঠামোর উপর।

পরবর্তী নারীবাদের বিষয়টি হলো নারী ও অর্থনীতি। এই বিষয়টি যখনই আলোচনা করা হবে দেখা যাবে যে অর্থনীতির প্রসঙ্গ টা যখনই আসছে নারীর বিষয়টা অন্যভাবে দেখতে পাওয়া যাচ্ছে। নারীকে কাজকর্মের ক্ষেত্রে সমভাবে দেখা হচ্ছে না, পুরুষদের সমতুল্য হিসাবে ভাবা হচ্ছে না। সেখানে নারীকে প্রয়োজনে আগে ছাঁটাই করে দেওয়া হত এবং কম পারিশ্রমিক দেওয়া হত। সেক্ষেত্রে নারীর কাছে প্রধান কারণ হয়ে যাচ্ছে মাতৃত্ব, মাতৃত্বই শ্রেষ্ঠ বলা হচ্ছে নারীর কাছে। এবং এই মাতৃত্বের দোহাই দিয়ে তাকে সংসারের ঘেরাটোপে বেঁধে রাখা হচ্ছে। সে এখানে যে শ্রম দিচ্ছে সেই শ্রমের মূল্য তাকে দেওয়া হয় না এবং পুরুষের থেকে নিকৃষ্ট হিসাবে তাদেরকে দেখা হয়। এইযে বিভাজন সেগুলোকে কেন্দ্র করে নানান আন্দোলনের সৃষ্টি হয়েছে যেটাই নারীবাদী আন্দোলন হিসেবে পরিচিত, এর কতগুলো পর্যায়ে আছে এই পর্যায়গুলোকে তরঙ্গ বলা হয়। এই তরঙ্গ গুলোতে ইউরোপে, আমেরিকায়, ব্রিটেনে বিভিন্ন গোষ্ঠী বা সংগঠনের মাধ্যমে নারীদের বিভিন্ন সমস্যাগুলো নিয়ে বিভিন্ন রকম আন্দোলন করতে দেখা যায়। এই তরঙ্গগুলো যদি এখন দেখি প্রথম তরঙ্গে আছে সমতার প্রসঙ্গ, দ্বিতীয় তরঙ্গে আছে ফেমিনিজেমের প্রসঙ্গ। এখানে নারীর স্বাধীনতা অর্জনের জন্য সংগঠিত আন্দোলনের কথা আছে। এই যে তরঙ্গভিত্তিক যে আন্দোলন এটার অনুপ্রেরণাটা তখন বিভিন্ন আন্দোলন থেকে তারা পেয়েছিল। সেই রকমের কয়েকটি আন্দোলন ইউরোপের ছাত্র আন্দোলন, সিভিল রাইটস আন্দোলন, জাতীয় মুক্তি আন্দোলন। এগুলো সব ১৯৬০ এর দশকে।

প্রথম তরঙ্গে সমান অধিকারের প্রসঙ্গটা বড় হয়ে দেখা দিল। আর দ্বিতীয় তরঙ্গে এই যে বিভাজন নারী-পুরুষরা যে সমান সমান অধিকার পাচ্ছে না তার কারণটা খতিয়ে দেখার চেষ্টা দেখা যাচ্ছে। আর এর মধ্যেই একটা গোষ্ঠীর উদ্ভব হলো সেটা হচ্ছে বৈপ্লবিক নারীবাদী, এরা নারীদের মূল সমস্যা ধরার চেষ্টা করলেন এবং বুঝতে পারলেন রাজনৈতিকভাবে নারীদের সচেতন করাটাও জরুরি। এই প্রসঙ্গ নিয়েও বহু নারীতাত্ত্বিকদের মধ্যে মতভেদের অন্ত নেই। সমস্ত কিছুকে পার করেও আবার এক ধরনের নারীবাদের ভাবনা এসে যোগ দিল যেটাকে পোস্ট হিসেবে চিহ্নিত করা হচ্ছে। সেই পোস্টটা কি যেটা দ্বিতীয় তরঙ্গ কে চ্যালেঞ্জ জানিয়ে বিংশ শতাব্দীর সময়ে ইউরোপে দেখা দিল এরাও নারীর শরীর নিয়ে নানা রকম মত দান করে গেছেন। এতদিন ধরে নারী যে পুরুষের যৌন আকর্ষণের একটা লক্ষ্যমাত্র ছিল। এঁরা যখন এসে বলছে যে নারী সেক্সচুয়াল সাবজেক্ট হিসেবে পুরুষের ধ্যান-ধারণাকে বশীভূত করতে পারবে এরকম উপাদান হিসেবেও ভাবা যেতে পারে যার হাত ধরেই ফ্যাশান এবং সৌন্দর্যকে কেন্দ্র করে বিভিন্ন শিল্পমাধ্যম গড়ে উঠলো যেখানে নারীদের সক্রিয় অংশগ্রহণ দেখা যায়। তবে এই মতবাদকে প্রথম ও দ্বিতীয় তরঙ্গের নারীবাদীরা মানেনা অনেকে বিরোধিতা করেছেন বহু তর্ক বিতর্ক হয়েছে। এই ভাবেই নানা রকম মতভেদ পার করে দ্বিতীয় তরঙ্গের যে ধারাবাহিকতা সেটাকে বজায় রেখে যে নানা রকম চিন্তাভাবনা যা নারীদের নতুন দিশা দেখাবে, সেটাই হচ্ছে তৃতীয় তরঙ্গ। এই তরঙ্গে বৈষম্য আর নারীদের ওপর যে অত্যাচার তার অবসান করাটাই মূল কাজ হিসাবে বিবেচিত। এই ভাবেই এক এক করে এইযে নারীবাদী আলোচনা এবং নারীবাদী আন্দোলন সেই সমস্ত ধারণাগুলোর সঙ্গে যুক্ত হয়ে যাচ্ছে মনঃসমীক্ষণ, উত্তর কাঠামোবাদ, উত্তর আধুনিকতা ও উত্তর উপনিবেশিকতার মত বিষয়গুলি।

নারীবাদের তিনটি তরঙ্গ প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় এর বাইরেও বিভিন্ন ধারা গড়ে উঠেছিল সেই ধারাগুলো হল উদারনৈতিক নারীবাদ, মার্কসীয় নারীবাদ, সমাজতান্ত্রিক নারীবাদ, বৈপ্লবিক নারীবাদ, সাংস্কৃতিক নারীবাদ ইত্যাদি। এছাড়া পরবর্তীকালে নারীবাদ নিয়ে আরো নানা রকম চর্চার মাধ্যমে নারী বাদের আরো কতগুলো ধারা সংরোজিত হয়েছিল তার মধ্যে মনস্তাত্ত্বিক নারীবাদ, উত্তর আধুনিক, নারীবাদ পরিবেশ প্রধান নারীবাদ ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য। এরপর এক এক করে প্রত্যেকটা নারীবাদ এর ধারা কি কি প্রাধান্য দিচ্ছে, কোন বিষয়কে প্রাধান্য দিচ্ছে সেগুলোকে একটু দেখে নেওয়ার চেষ্টা করব।

এ প্রসঙ্গে প্রথমেই আসছে উদারনৈতিক নারীবাদ। এই উদারনৈতিক নারীবাদীদের উৎস হচ্ছে উদারনৈতিক রাজনৈতিক দর্শন। এরা ধ্রুপদী উদারনীতিবাদের দ্বারা প্রভাবিত এখানে নারীকে মানুষ হিসাবেই দেখা হচ্ছে। পুরুষের সমান রাজনৈতিক এবং সামাজিকভাবে নারী যাতে গুরুত্ব পায় সেই দিকটাই দেখানোর চেষ্টা করা হয়েছে। এই উদারনৈতিক নারীবাদীদের প্রধান দাবি হলো নারীর জন্য ভোটদানের অধিকার, আইনের অধিকার, শিক্ষার অধিকার, রাজনীতির সঙ্গে যুক্ত হবার অধিকার। তবে নারীরা এখানে পিতৃতন্ত্রের বিরুদ্ধে গিয়ে কাজ করার সাহস পাইনি।

পরবর্তী ধারা মার্ক্সীয় নারীবাদী ধারা যেটা ১৯৬০ এর দশকে একটা প্রসার লাভ করেছিল। সমাজতান্ত্রিক ও মার্কসীয় নারীবাদীদের ধারণাটা একই রকম হলেও পরবর্তীকালে সমাজতান্ত্রিকরা গ্রহণ করেনি মার্ক্সীয় নারীবাদীদের সব ভাবনাগুলো। মার্কসীয় শ্রেণীবিশ্লেষণ ও নারীর প্রতি বৈষম্য এর বিরুদ্ধে এই নারীবাদীদের প্রতিবাদ। বিভিন্ন নারীবাদীরা বিভিন্ন রকম মতামত দেন। এখানে কেউ কেউ আবার আমাদের প্রাচীনকাল থেকে বর্তমান যুগ পর্যন্ত যে বিবর্তনের ধারা সেটাকে দেখিয়ে পিতৃতন্ত্রকে

প্রধান করে দেখিয়েছেন এবং পিতৃতন্ত্রের মধ্যে নারী কিভাবে জীবন যাপন করছে এবং নারীর কাছে মাতৃত্বটাই প্রধান হয়ে উঠছে সেই বিষয়টাকেও দেখিয়েছেন অনেকে। কেউ কেউ আবার বলছেন নারীরা যে এই বিনা পারিশ্রমিকে ঘরে তাদের শ্রম দেয় এবং ঘরের বাইরেও কিছু কিছু সময় গুরুত্বপূর্ণ মুহূর্তে তাদের শ্রম দানের জন্য ডাকা হত এই সমস্ত পরিস্থিতি দেখে বলেছে যে নারীরা এই শ্রমিক অবস্থা থেকে যদি মুক্তি না পায় তাহলে নারীদের উন্নতির সম্ভব নয়। তাই জন্যই সর্বপ্রথম এই শ্রমিক শ্রেণীর মুক্তি হলেই নারী পেতে পারে মুক্তি। আবার কেন্দ্রীয় ও প্রান্তিক ভেদেও নারীর অবস্থার পার্থক্য থাকে, কেন্দ্রীয় মানে উন্নত আর প্রান্তিক মানে অনুন্নত, এইভাবে দেখা যায় যে প্রান্তিক অঞ্চলে নারীদের এই বৈষম্যটা অনেকটা বেশি চোখে পড়ে।

পরবর্তী নারীবাদী ধারণা হচ্ছে সমাজতান্ত্রিক নারীবাদ এখানে মার্কসীয় নারীবাদীর কাছে যে দিকটা উপেক্ষিত সেই দিকটাই এই সমাজতান্ত্রিক নারীবাদীদের কাছে আবার গুরুত্বপূর্ণ। এইভাবে উৎপাদন ব্যবস্থার বদল ঘটলে নারীর অবস্থার পরিবর্তন ঘটতে পারে। পরিবার, প্রজনন, গার্হস্থ্য এগুলো মার্কসীয় নারীবাদীরা গুরুত্ব দেননি। কিন্তু সমাজতাত্ত্বিক নারীবাদীরা গুরুত্ব দিচ্ছেন এবং জানাচ্ছেন নারী পুরুষের পারস্পরিক নির্ভরশীলতা এই বিষয়টা বদলাতে পারে পরিস্থিতি অর্থাৎ নারীর উন্নতি আনতে পারে। এখানেও দেখা যায় বিভিন্ন সমাজতান্ত্রিক নারীবাদীরা বিভিন্ন রকম কথাবার্তা বললেও সকলের দাবির কিন্তু একটা মূল সুর ছিল, সেই জায়গাটাই হচ্ছে বৈষম্যের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ।

এরপর বৈপ্লবিক নারীবাদীদের কথায় আমরা দেখতে পাই আগের যে তিনটি নারীবাদীদের ধারা তাদের প্রতিক্রিয়া হিসেবে এর আবির্ভাব। লিঙ্গভিত্তিক দ্বন্দ্বকেই এরা

প্রধান ভাবছে নারীদের দুর্দশার জন্য। এরা সমকামিতাকে প্রাধান্য দিচ্ছেন এবং কারণ হিসেবে পুরুষ আধিপত্য কম হওয়ার বিষয়টিকে তুলে ধরছেন। এই ধারার কেউ কেউ বলছেন মাতৃত্বই নারীর পিছিয়ে থাকার কারণ। তাই এই প্রজনন মাধ্যমটাকে যদি বৈজ্ঞানিক পদ্ধতির মাধ্যমে ঘটানো সম্ভব হয় সেই বিষয়টাকে এই নারীবাদীদের কিছু কিছু মানুষ জোর দিচ্ছেন এবং সেটাতেই নারীদের এগিয়ে যাওয়ার পথটা আরও সুগম হবে। এইভাবে কিছু কিছু নারীবাদী ভাবছেন।

পরবর্তী নারীবাদী ধারার আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ ধারা সাংস্কৃতিক নারীবাদ এখানে নারী-পুরুষ যে পৃথক, পুরুষের কাছে নারী দুর্বল এই ভাবনাই তুলে ধরা হচ্ছে। এই ধারায় উদারনৈতিক নারীবাদীদের সঙ্গে যুক্ত থেকে নারীর স্বাধীনতা অর্জনের জন্য রাজনৈতিক অধিকার ও প্রতিনিধিত্বকে গুরুত্ব দেওয়া হচ্ছে। সাংস্কৃতিক নারীবাদীরা তাছাড়া সংস্কৃতির উপরই বেশি জোর দেন, সামাজিক সংস্কার সাধনের মাধ্যমে নারীজাতির উন্নতি হতে পারে এটা তাদের ধারণা। এই নারীবাদীদের মধ্যে কেউ কেউ ভাবছেন মাতৃত্বকে মেয়েদের এগিয়ে চলার পথে একটা অনুকূল উপাদান হিসাবে। পরবর্তী সময়ে সমাজে, রাজনীতিতে সমস্ত ক্ষেত্রে নারীদের এই মাতৃত্ব বিষয়টা একটা প্রভাবশালী উপাদান হোক এটাই এই নারীবাদীদের কাছে কাম্য। এই ধারার মধ্যে নারীর অন্তর্নিহিত বৈশিষ্ট্য ও স্বতন্ত্র অবস্থানের উপর ভিত্তি করে একটা ভিন্ন অর্থকে প্রাধান্য দিচ্ছেন। কিছু নারীবাদীদের দ্বারা সেটাকে জিও সেনট্রিস্ট নারীবাদ বলে ভাবা হচ্ছে। এদের ধারণা যৌনতা, প্রজনন ও মাতৃত্ব এগুলি সদর্থক মূল্যবোধের একটা দিক। এদের মূল ভাবনাই হলো সামগ্রিকভাবে সমাজকে খতিয়ে দেখে বিশ্লেষণ। জাতিগত, শ্রেণীগত পার্থক্যকে এরা প্রাধান্য দিচ্ছেন না, এই মাতৃত্বকে প্রাধান্য দেবার মধ্য দিয়ে নারীকে একটা প্রকৃতির সঙ্গে মিলিয়ে দেখার প্রসঙ্গ আছে।

এরপর পরিবেশ প্রধান নারীবাদীদের কথা আমরা আলোচনা করব। ১৯৭০ এর দশকে প্রথম একজন ফরাসি নারীবাদী এই শব্দবন্ধটি ব্যবহার করেছিলেন। এই নারীবাদীদের মূল ভীত হল নারীর ক্ষমতা। এই ভাবনায় নারীকে প্রকৃতির সঙ্গে এবং পুরুষকে সংস্কৃতির সঙ্গে মিলিয়ে দেখা হতো। সংস্কৃতি যেহেতু প্রকৃতির থেকে উচ্চ মর্যাদা সম্পন্ন তাই পুরুষ বেশি মর্যাদাসম্পন্ন এরকম একটা ভাবনা এখানে দেখা যায়। নারীর উপর যেমন অধিপত্য ও নিপীড়ন চালানো হয় তেমন প্রকৃতির উপরও হয় এইভাবে একটা মিলিয়ে দেখার প্রবণতা লক্ষ করা যায়। এখানে দেখা যাচ্ছে যে নারীর উপর অত্যাচার নিপীড়নের প্রকৃতিটা খানিকটা প্রকৃতির উপর হওয়া অত্যাচারের মতোই সাদৃশ্য যুক্ত তাই নারী প্রকৃতিকে রক্ষা করার ক্ষেত্রে একটা ভূমিকা গ্রহণ করতে পারে। নারী আন্দোলন ও পরিবেশ আন্দোলন দুইয়েরই উদ্দেশ্যে মিল রয়েছে। দুজনের ক্ষেত্রেই বৈষম্যহীন ও সাম্য ভিত্তিক ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করা একমাত্র লক্ষ্য। পরিবেশ রক্ষার জন্য নারীদের যে আন্দোলন সেগুলিকে ইকো ফেমিনিজেমের ভিত্তি বলেছেন। এই পরিবেশ প্রধান নারীবাদীদের মূল কথাই হল নারী ও গৃহস্থের মধ্যে একটা সম্পর্ক। যার ফলে গৃহস্থালির নানান কাজ করার মাধ্যমে নারী সেই সংসারের মধ্যেই বাঁধা পড়ে যায় এবং পুরুষের অধিপত্যের অধীনে এক প্রকার চলে যায়। তাই কেউ কেউ এই ধারণার বিরোধিতা করেছেন, এই যারা বিরোধিতা করছেন তারা জৈবিক নারীবাদ হিসাবে পরিচিত। এই জৈবিক নারীবাদীদের ধারণার মধ্যে স্থান পাচ্ছে দলিত আদিবাসীসহ নিম্নবর্গের নারীরা যারা তাদের জীবন ও জীবিকার জন্য প্রকৃতির সঙ্গে প্রতিনিয়ত ওঠাবসা করে। এভাবেই আমরা প্রত্যেকটা ধারার মধ্যে কি কি বিষয়গুলি প্রাধান্য পেয়েছে সেগুলি দেখতে পেলাম। আবার সংগ্রাম, প্রতিবাদ ইত্যাদির মাধ্যমে পিতৃতন্ত্র থেকে নারীকে বের হতে দেখি। নারীসত্ত্বা, নারী পরিসর, নারী সামাজিক অধিকার ইত্যাদি নানান রকম দাবি

নিয়ে নারীর আন্দোলনও দেখা গেছে। সেগুলি আমরা এই নারীবাদী আন্দোলনের পরতে পরতে দেখেছি। এই চিন্তা চেতনার জাগরণে নারী পেল এক নতুন আকাশ। যে আকাশে তারা নিজেদেরকে মেলে ধরার ক্ষমতা পেল। তাই নারীদের এই লড়াইয়ের পর নারী তার আত্মপ্রকাশ করেছে। সেই সমস্ত দিক আমরা বিভিন্ন মেয়েদের লেখালেখি, তাদের আত্মকথা, তাদের কাজে বেরোনো এই সমস্ত বিষয়ের মাধ্যমে আমরা দেখতে পাই। নারীবাদ যুগিয়েছে মেয়েদের কাছে প্রতিবাদ করার শক্তি যার হাত ধরেই মেয়েরা তাদের কথা বলার জন্য নিজেরা কলম ধরেছে। পুরুষদের কলমে মেয়েদের কথা অনেক লেখা হলেও মেয়েরা তাদের অভিজ্ঞতা উপলব্ধির কথা যতটা ভালো বুঝবে এবং বলতে পারবে পুরুষরা সে দিক থেকে কতটা এগিয়ে সেটাও আমরা নারীদের কলমটাকে দেখেই বুঝতে পারব। তাই নানা প্রতিবাদ সংগ্রাম পেরিয়ে নারী লেখালেখিতেও করেছে আত্মপ্রকাশ। এভাবেই নারীদের হাত থেকে আমরা আত্মকথা ও নারী আন্দোলন কেন্দ্রিক নানান বই পাই। মানব বিশ্ব পুরুষ বিশ্ব নয় এই চেতনা যখনই জাগলো তখনই নারী ধরেছে কলম। এমনকি কলম ধরতে চেয়ে নারী, পুরুষের বয়ানে লেখা কতটা যুক্তিযুক্ত সেটাও যাচাই করে নেয়ার ক্ষমতা দেখিয়েছে। ধীরে ধীরে মুক্ত প্রাণ নারীরা তাদের লেখালেখির জগতে প্রবেশ করেছে উনিশ শতকেই। এই সময়ে অস্তিত্বকে জানান দিতে গিয়ে নারী কলম ধরে অতীতকে লিখতে চেয়েছে এবং যে লেখায় ধরা পড়েছে তাদের অসহায় অবস্থা, পরিস্থিতি। সেই রকমই ওই সময়কার একটি বই হল রাসসুন্দরী দেবীর 'আমার জীবন'। কৃষ্ণ কামিনী দাসের "চিন্তা বিলাসিনী"-ও এইরকম আরেকটি রচনা। এইভাবে সময় পার করে নারী যখন বিশ শতকে প্রবেশ করেছে সেখানে নারীর লেখনি হয়েছে আরও ধারালো। নারীবাদী আন্দোলনের ধারায় অধিকার অর্জনের যে লড়াই তা নারীকে ভাবতে শিখিয়েছে এবং শক্তি যুগিয়েছে। যে শক্তির বলেই নারী পেয়েছে প্রতিবাদের ভাষা, সমাজে

যেখানে অসঙ্গতি চোখে পড়েছে সেখানেই গর্জে উঠতে দেখা গেছে তাঁর কলম, এই ভাবেই এক এক করে সাহিত্যে নিজেদের জবানবন্দি লিখে গেছেন যে সমস্ত লেখিকারা তারা হলেন জ্যোতির্ময়ী দেবী, সাবিত্রী রায়, সুলেখা সান্যাল, শৈলবালা ঘোষজায়া, সীতা দেবী, শান্তা দেবী, অনুরুপা দেবী, নিরুপমা দেবী, আশাপূর্ণা দেবী, গিরিবালা দেবী, মহাশ্বেতা দেবী প্রমূখ লেখিকারা। তবে তাঁরা লেখালেখির জগতে পা রাখলেও পুরুষের মনোনীত লেখা না হলে লেখা নিয়েই সমালোচনা হত নিন্দা হত। এইজন্যই বোধ হয় অনুরুপা দেবীর ‘মন্ত্র শক্তি’ ও ‘মা’ এই দুটি রচনা পিতৃতন্ত্রের ধারক ও বাহক। তবে সবাই যে এই পিতৃতন্ত্রকে বয়ে বেড়িয়েছে তা নয় কেউ কেউ তার প্রতিবাদ করেছে সেই রকম ছবিও দেখতে পাওয়া যায় যেমন বঙ্কিমচন্দ্র ও শরৎচন্দ্র এনাদের লেখায় অল্প বয়সে মেয়েরা তাদের বৃদ্ধ স্বামীর ঘরে আনন্দে থাকে যেমন ‘রজনী’- এর লবঙ্গ লতা ‘দেবদাস’- এর পার্বতী। কিন্তু মেয়েদের লেখায় এর বিপরীত ছবি দেখা যাচ্ছে। যেমন বেগম রোকেয়া তার ‘পদ্মরাগ’ উপন্যাসে নায়িকাকে যেভাবে গড়ে তুলেছেন সেখানে নায়িকা একটা সভায় সবার বিয়েতে অসুবিধা দেখে জানায় সংসার ধর্মটাই তার কাছে প্রধান ধর্ম নয়। তাই রোকেয়া সৌদামিনী চরিত্রের দ্বারা লিখেছেন স্বপত্নী ও তার পুত্র কন্যাদের বারবার কাছে টেনে নেওয়াতেও নানারকমভাবে একটা অপমানের পরিস্থিতি তৈরী হয়। আবার আমোদিনী ঘোষ তাঁর প্রতিবাদী কণ্ঠ দিয়ে বৃদ্ধ লোকের সঙ্গে তাঁর নায়িকার বিয়ে দিয়েও নায়িকার মানসিকতায় দেখিয়েছেন সে নিজের সমবয়সী কাউকে কামনা করছে। তবে শুধু কামনাই করেনি আশা পূর্ণ না হলে মরার আগেই সে বিধবার বেশ ধারণ করে নেয়। এটাই ছিল তার প্রতিবাদ। এরপর শৈলবালা ঘোষজায়া তার রচনার মধ্যে গার্হস্থ্য সম্পর্কের নরকীয় রূপ দেখিয়েছেন ‘জন্ম অপরাধী’ ও ‘জন্ম অভিশপ্তা’ এই দুটি কাহিনীতে। এই ভাবেই এক এক করে বিভিন্ন লেখিকা একটা ছক ভাঙ্গা গল্প তুলে ধরেছেন তাদের

লেখনীতে। শুধু তাই নয় লেখার মধ্যে পুরুষদের লেখায় কোথায় পার্থক্য সে বিষয়গুলি তুলে ধরতে আরেকটি বিষয় এখানে দেখানো যায় সেটি হল বিধবা প্রসঙ্গ। এই বিষয় নিয়ে বিভিন্ন লেখিকারা কিভাবে তাদের চেতনার জাগরণ ঘটিয়ে বিধবা এদের নিয়ে যে ধারণা আমাদের সমাজে প্রচলিত তার বদল ঘটাচ্ছে সেগুলো লেখার মধ্যে ধরা পড়েছে। কয়েকজন লেখিকার বিধবাদের নিয়ে ভাবনা চিন্তার কথা আমরা যদি দেখি তাহলে চিন্তা ধারা পরিবর্তন এর ক্রমটা আমাদের নজরে আসবে। প্রথমে গিরিবালা দেবীর 'রায় বাড়ি' উপন্যাস যদি দেখি সেখানে সরস্বতী নামের বিধবার কারো সঙ্গে না মেশা, হৃদয়ের জ্বালা বাক্যের বিষবাষ্পে পরিপূর্ণ। পুরো জীবন জুড়ে আছে কেবল আচার-বিচার নিয়মের বেড়াজাল। এরপর সাবিত্রী রায়ের 'পাকা ধানের গান' উপন্যাসে আন্না কালীর জীবনে একাদশীর দিন একটু জল খাওয়ার জন্য লাঞ্ছনায় আত্মঘাতী হওয়ার দৃশ্য দেখা যায়। এখানেও নিয়মের কঠোরতা দেখা যায়। আশাপূর্ণা দেবীর 'মিত্তির বাড়ি' উপন্যাসে বিধবা উমা শশী একাদশীর দিন ভোরবেলায় চা খাওয়ার অপরাধে লাঞ্ছিত। এরপর সুলেখা দাশগুপ্তের 'মিত্রা' উপন্যাসে বিধবা নারীর মাছ খাওয়াকে স্বাভাবিক ভাবা হয়েছে। এখানেই পরিবর্তন নজরে এলো। আরো পরে বাণী বসুর 'শ্বেত পাথরের থালা' এই রচনায় একই রকম স্বীকৃতি পাওয়া যায়। পরবর্তীতে আশাপূর্ণা দেবীর 'বকুল কথা'তে তবে বৈধব্য পারুলের জীবনে নতুন নির্মাণ এনে দেয়। পুরুষদের থেকে নারীদের লেখা কিভাবে আলাদা সেটা একটু দেখে নেব পুরুষ এবং নারীদের লেখা কিছু রচনা থেকে। এ প্রসঙ্গে শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের 'দত্তা' বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় 'যুগলাঙ্গুরীয়' প্রভৃতি রচনায় রোমান্টিকতাটাই প্রধান বিষয়। কিন্তু কিছু কিছু মহিলা সাহিত্যিকদের রচনায় এই কুমারী চরিত্র নির্মাণে রোমান্টিকতা প্রাধান্য পেয়েছে ঠিকই তবে কেউ কেউ এই ভাবনার বিরোধিতা করেছেন। সেই রকমই একজন হলেন শৈলবালা ঘোষজায়া ও আশাপূর্ণা দেবী।

তাঁদের লেখা 'বিনীতাদি' ও 'বকুল কথা' এই দুটি রচনায় নারী আলাদা ব্যক্তিত্বে প্রতিষ্ঠা পেয়েছে। এছাড়া মহাশ্বেতা দেবীর রচনাতে সংগ্রামী ও দলিত নারীর ছবি দেখতে পাওয়া যায়। এভাবেই নারীবাদী ভাবধারায় জাগরিত হয়ে যে সমস্ত নারী আন্দোলন হয়েছিল নারীদের অধিকার অর্জনের জন্য, নারী সেই আন্দোলনের হাত ধরে পেয়েছিল চেতনার জাগরণ, শক্তি ও সাহস। এই রকমই একটা ছবি আমরা নারীবাদী আন্দোলনের ধারা, নারীবাদী আন্দোলনের তরঙ্গ এই আলোচনার প্রেক্ষিতে দেখতে পেলাম।

এতকিছু আন্দোলন, এতকিছু প্রতিবাদ সমস্ত কিছুর মূল কারণ হল অধিকার অর্জন। সেই অধিকারেরই একটি অংশ হলো শিক্ষা এই শিক্ষার মধ্যে নারী কিভাবে নিজের জায়গা করে নিল, সমাজের বিভিন্ন অসামঞ্জস্য দিক কিভাবে তুলে ধরেছেন এবং সেই সমস্ত জায়গা গুলো থেকে নিজেদের অর্থাৎ মেয়েদের কিছু অধিকার যদি থাকে সেটা দাবি করার একটা প্রয়াস দেখা যায়। এই প্রেক্ষিতেই আমরা এখন আমার গবেষণার বিষয় "শৈলবালা ঘোষজায়ার কথাসাহিত্য: একটি মূল্যায়ন" এই বিষয়ের অন্তর্গত 'সাহিত্য কৃতির দুই ধারা' নামক অধ্যায়ের শিক্ষা মূলক রচনা ও সমাজকেন্দ্রিক রচনা এই দুটি অংশ আলোচনার মাধ্যমে দেখে নেওয়ার চেষ্টা করব। শৈলবালা ঘোষজায়ার জন্ম ১৮৯৪ খ্রিস্টাব্দে চট্টগ্রামের কক্সবাজারে। পিতা কুঞ্জবিহারী নন্দী ছিলেন অ্যাসিস্ট্যান্ট সার্জন। মা ছিলেন হেমাঙ্গিনী দেবী। বিবাহের পর প্রতিকূল পরিবেশে জীবন আতিবাহিত করেও তিনি যে সাহিত্য ভাণ্ডার আমাদের দিয়ে গেছেন তার অবদান অসামান্য। তিনি তাঁর উপলব্ধিজাত উপাদানকে সুন্দরভাবে ভাষা দান করেছেন। তাঁর রচনায় মেয়েদের শিক্ষা অর্জনের চিত্র তিনি কিভাবে ফুটিয়ে তুলেছেন তা আলোচ্য বিষয়ে দেখানোর চেষ্টা করব।

তাঁর রচনার একটা বড় অংশ জুড়ে প্রতিকূলতার মধ্যে মেয়েদের শিক্ষা অর্জন, সচেতনতার বোধ তৈরি হওয়ার চিত্র দেখা যায়। এখানে শিক্ষা অর্জন করতে গিয়ে নানান বিপত্তি ও লাঞ্ছনা পেতে হয়েছে নারীকে। কখনও কখনও নারীকে শিক্ষা অর্জন করতে গিয়ে আপনজনের পরিবৃত্তের বাইরে যেতে হয়েছে। কখনোবা সমাজের দিকে তাকিয়ে নারীকে পরিবার করেছে পরিত্যাগ। এই রকম নানা দুর্ভোগ সহ্য করতে হয়েছে নারীকে কেবল শিক্ষা লাভের জন্য।

এছাড়াও নারী শিক্ষা অর্জন করলেও তার বিচার বিবেচনাকে প্রাধান্য দেবার পথেও আসে নানান বাধা যাকে আতিক্রম করতে নারীকে পেতে হয়েছে অনেক দুর্ভোগ। এর পাশাপাশি কর্মক্ষেত্রে শিক্ষিতা নারীর স্বাধীন বিচরণের পথেও আসে কিছু মানুষের অসৎ আভিসন্ধি যার ফলস্বরূপ সমাজকে বারংবার নারীর চরিত্রের দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করতে দেখা যায়। এইভাবে প্রতিকূলতার মধ্যে সফল হওয়া নারীকে চিকিৎসক, লেখিকা, শিক্ষিকা হতে দেখা যায় তাঁর রচনায়। আবার কখনও সঠিক বিচার বুদ্ধিসম্পন্ন নারী অন্যায়ের বিরুদ্ধে গর্জে তোলে প্রতিবাদের ভাষা আবার কেউবা সমাজ ও পরিবারের চাপে মুখ বুজে সহ্য করে সমস্ত নির্যাতন, হয়েছে গৃহবন্দি। এছাড়া শিক্ষা অর্জন করে নারীকে সমাজ সচেতন, স্বাস্থ্য সচেতন হিসাবে যেমন দেখা গেছে তেমনি অর্থ উপার্জনের জন্য লেখা বেছে নেওয়া নারীকে একঘরে করে দেওয়ার মত চিত্রও দেখা যায় রচনায়। এইরকমই নানান দৃশ্য তাঁর রচনার প্রতি ছত্রে দৃশ্যমান। এইভাবে লেখিকা মেয়েদের শিক্ষা অর্জন এবং এই সংক্রান্ত নানান বিপত্তিকে যেভাবে ফুটিয়ে তুলেছেন সেই চিত্র দেখে নেওয়ার চেষ্টা করব তাঁর কয়েকটি রচনা আলোচনার মাধ্যমে।

এ প্রসঙ্গে প্রথমেই আমাদের আলোচ্য শিক্ষা বিষয়ক রচনাগুলি। প্রথমেই ‘মনীষা’ গল্পটি আলোচনায় পরোপকারী, গরীব দরদি মনীষা চরিত্রকে বাইরের মানুষের উপকার করতে দেখা যায়। তার স্বামীও তার উকিল বন্ধুদের প্ররোচনায় মনীষার বাইরে যাওয়া নিষেধ করে। এমন অবস্থায় মনীষা নিজেকে সেলাই ও পড়াশোনায় আবদ্ধ করে নেয়। এভাবে একসময় মনীষা অতিষ্ঠ হয়ে ওঠে এবং তার ছেলের মৃত্যুর স্মৃতি তাকে শোকাচ্ছন্ন করে তোলে এবং সে ডুকরে কাঁদে। এছাড়া অসহায় মায়ের কণ্ঠে যখন শোনা যায়–

“পয়সার অভাবে,-নিজেদের শিক্ষার অভাবে – ছোট শিশুর ছোট সেবায় কত বৃহৎ হইতেও বৃহত্তম অমার্জ্জনীয় ত্রুটি ঘটিয়াছে! ওঃ নিরুপায় ক্ষোভে বুক যে ফাটিয়া যায়।” ৪

এই উক্তিতেই পরিস্ফুট হয় শিক্ষার অভাবে, দারিদ্রতায়, অবহেলায় শিশুর মৃত্যু ঘটেছে। অন্যদিকে স্বামী বন্ধুসহযোগে সমাজসেবার নামে ‘দারিদ্র্য কষ্ট নিবারণী’ সভার প্রতিষ্ঠা করেছিল সেখানে মানুষের উপকারের চিত্র নেই।

তবে গৃহবদ্ধ সন্তানহারা শোকাতুর মাতা যখন আসহায়ভাবে কাঁদে ঠিক সেইসময় দ্বারে জনাকতক গৃহহীন মানুষ ‘মা’ বলে সম্বোধন করে সাহায্য চায়, তখন সে আর কোনো বাধা না মেনে তাদের আশ্রয় দেয়। এমনসময় মনীষার স্বামী বাড়ি ফিরে ওই বাইরের লোকেদের দেখে তাদের খাওয়া হয়েছে কিনা জানতে চাইলে তার উত্তরে জানায়–

“আজ্ঞে অন্নপূর্ণার রাজ্যে কেউ কি উপবাসী থাকে ধর্ম্মাবতার?” ৫

এই উত্তরেই দয়ালু মনীষা প্রজ্বলিত হয় এবং তার স্বামী তার কাছে ক্ষমা চায়। এইভাবেই গল্পে শিক্ষার অভাবে চিকিৎসায় গাফিলতি ও সমাজে মেয়েদের আবস্থান স্পষ্ট। অনুরূপভাবে ‘ক্ষমতার জয়’ গল্পেও ডাক্তারদের সেবাব্রতে নিষ্ঠা এবং হাতুড়ে ডাক্তার দিয়ে

চিকিৎসাতে বিপত্তির চিত্র পাই যা পুনরায় শিক্ষার অভাব ও তার পরিণামে মৃত্যুকেই ডেকে আনে।

এরপর 'দীপ্তি' (জয়শ্রী, আশ্বিন, ১৩৪০) গল্পে দীপ্তিকে শিক্ষিত, যুক্তিনির্ভর প্রতিবাদী চরিত্র হিসাবে দেখা গেছে। গল্পের শুরুতেই বিমলার বাড়িতে এসে মেয়েদের সেলাই শিক্ষার বহর দেখে সরকারবাবুর আক্ষেপকালে দীপ্তি এসে সরকারবাবুর ভাতৃবধূর থেকে টাকা ঠকিয়ে নেওয়ার প্রসঙ্গ তুলে তাকে থামিয়ে দেয়। এইসময় ভাতৃবধূর নালিশ ওয়ারেন্ট নিয়ে কথা তুললে দীপ্তি প্রতিবাদী কণ্ঠে বলে–

> "আজ আইনের তাড়া খেয়ে ভাসুর গুরুজন সেজে মানের কান্না কাঁদলে চলবে কেন? সময়ে নিজের গুরুত্ব, মর্য্যাদা রক্ষা করা উচিত ছিল।" ৬

তারপরই সরকারবাবু চলে যায়। এদৃশ্য বিমলার বড়দি দেখে এবং দীপ্তির শিক্ষা নিয়ে মন্তব্য করে সরকারবাবুকে রাগানোর কাজটা করে দীপ্তি ঠিক করেনি বলে জানায়। তখন দীপ্তি বড়দিকে জানায়-

> "লেখাপড়া শেখাটা একটা বিশেষ শ্রেণীর আলস্য-বিলাস বা ফ্যাসন মাত্র নয়। মানুষ হওয়ার পক্ষে, বেঁচে থাকার পক্ষে সৎ এবং ভদ্র হওয়ার পক্ষে, জ্ঞানচর্চা অত্যন্ত আবশ্যক।" ৭

এইভাবেই দীপ্তির প্রতিবাদী, যুক্তিবাদী, স্পষ্টবাদী হৃদয়ের পরিচয় পাই।

তারপর বড়দি ও দীপ্তি-র কথোপকথনে আসে মেয়েদের শিক্ষা ও অন্যান্য বিষয়ে মনুর শাস্ত্র উল্লিখিত কয়েকটি শ্লোক, যুক্তি ও ঠাট্টা। তাইত বিমলার স্বামীর বাড়িতে বসে থাকার বিষয়টা ঠাট্টা করে বলে-

> "দারাধীনস্তথা স্বর্গ: "। ৮

বড়দি প্রথমে রাগলেও পরে দীপ্তির যুক্তিমূলক কথায় আপ্লুত হয়। এমনসময় দীপ্তিদের বাড়ির ভৃত্য এসে জানায় দাদু ডাকছে। এহেন হুকুমে দীপ্তির আর বুঝতে বাকি থাকে না সরকার বাবুর দাদুর কাছে গিয়ে নালিশের কথা। তাই তৎক্ষণাৎ সে উঠে যায়।

এরপর দাদুর সামনেও সরকারবাবুকে আইনের প্রসঙ্গ টেনে তার কৃতকর্মের পরিবর্তন করতে বলে। অবশেষে সরকারবাবু দীপ্তির দৌলতে সৎপথে উপার্জনের আস্থা পায় এবং তার ভাতৃবধূদের ন্যায্য অধিকার দিয়ে বাড়ি ফিরিয়ে আনতে রাজি হয়।

এরপরে বড়দির কাছে সরকার বাবুর সুমতির কথা জানাতে গেলে বড়দি সানন্দে বলেন–

"একেই তো বলে সুশিক্ষা। সৎকার্য্যে, যত্নশীল, উৎসাহ-উদ্যম-তৎপর না হলে শিক্ষার উদ্দেশ্যই ব্যর্থ"। ৯

এই কথা জীবনে শিক্ষার প্রয়োজনীয়তাকে প্রকাশ করে। এইভাবে দীপ্তির মত প্রত্যেক শিক্ষিত মানুষেরই বিবেচনাবোধ ও অন্যায়ের প্রতিবাদ বাঞ্ছনীয়।

এরপর 'শিশুর স্মৃতি' গল্পে দেখা যায় জাতপাত প্রসঙ্গ, শিক্ষাগ্রহণে যাতনা, বাল্যবিবাহ, ভ্রুণহত্যার প্রসঙ্গ। গল্পের শুরুতেই মিসেস অগস্তির হাতের স্লফ থেকে যন্ত্রণার দৃশ্য ও ডাক্তারের আগমণ দিয়ে গল্প শুরু। এখানে রুগীর সাথে কথোপকোথনকালে নিজেকে হিন্দুস্থানী সাজে রেখে 'কিস্কিন্ধা ফেরৎ' বলে অভিহিত করে এবং হনুমানের চরিত্রাদর্শের কথায় প্রভুর জন্য যে আত্মত্যাগ এর মাধ্যমে মেয়েদের মাথা নিচু করে প্রভুর দাসত্ব করার চিত্র স্পষ্ট। এ প্রসঙ্গে তিনি আরও বলেন–

"মেয়েদের জীবন- মরণ প্রভুদের মর্জ্জির উপর নির্ভর করছে, এমন মর্জ্জি- যে খুশি হলেই বিনা বাধায় মুন্ডুপাত হচ্ছে দেখবেন।" ১০

এইভাবে মানুষের স্লফ পরিস্কারের ছলে তিনি জানান–

“ওই পচা Slough গুলি,- ওগুলি নির্মমভাবে টেনে ছিঁড়ে ফেলা ভিন্ন, বিষাক্ত ক্ষতগ্রস্ত মানুষের সুস্থ হবার আশা নেই।” ১১

অর্থাৎ মনে শিক্ষার আলো না পৌঁছালে যে ভ্রান্ত ধারণার বশবর্তী হয়ে চলছে সমাজ তা থেকে মুক্তি নেই।

এরপর ডাক্তারের বাড়ির ঝির কথা বলতে গিয়ে ভ্রূণহত্যার বিষয় নজরে আসে। সেখানে ঝি স্বামীর ইচ্ছায় একাজ করে। এই ভ্রূণ হত্যার বিষয়ে স্বামীর ভাবনা নিম্নরূপ-

“যারা এ জগতে মহা পাপ করে মরে, তাদের আত্মা ঐরকমেই ভ্রূণ অবস্থায় বারে বারে যাতায়াত করে সাজা পাবে না ত কি? এই উপায়েই ঐ হতভাগ্যদের উদ্ধারের পথ। তিনি কিন্তু অন্যায় করেননি।” ১২

প্রত্যুত্তরে ডাক্তার বলেন–

“তাহলে আইনের বিচারে আপনার দেবত্বটা একবার যাচাই হওয়া দরকার।” ১৩

এই প্রতিবাদী কণ্ঠস্বরই শিক্ষিতের বিবেচনাশক্তির পরিচায়ক। বাল্যবিবাহের চিত্র পাওয়া যায় এক প্রসূতির প্রসঙ্গে। বারংবার সন্তান নষ্ট ঠেকাতে স্বতন্ত্রবাসের কথা জানালে পরিবারের লোকেরা অসম্মত হয়। এই প্রসঙ্গে ডাক্তার উপলব্ধী করেছিলেন আমাদের সমাজ বিধবার ব্রহ্মচর্য পালন মানতে পারে অথচ বিয়ের বয়স-এর প্রসঙ্গে বয়স বাড়াতে নারাজ। অবশেষে এহেন আচরণে প্রসূতির মৃত্যুই হয়।

সবশেষে নিজের জীবনকাহিনী যখন রুগীর কাছে বলে সেখানে শিক্ষালাভে হয়রানির চিত্র দেখা যায়। অল্পবয়সে বাবা- মা মারা যাবার পর স্কুলের মিশনারি মেমকে দেখে জীবন কাটায় ও শিক্ষা লাভ করে। এইসময় তার নামে থাকা টাকার লোভে

দূরসম্পর্কের লোক বিয়ের সম্বন্ধ নিয়ে যখন হাজির তখন সে ম্যামের মাধ্যমে আপত্তি জানালে মেমের নামে কুৎসা রটায়। এঝড় থামলে আত্মীয় বন্ধুর আশ্রয়ে পড়াকালীন সে যখন বলে–

"মহাপাতকীকেও এত শাস্তি লাঞ্ছনা ভোগ করতে হয়নি, লেখাপড়া শেখবার জন্যে আমায় যত লাঞ্ছনা ভোগ করতে হয়েছে।" ১৪

তখনি তার কথায় লেখাপড়া শিখতে একটা মেয়েকে কতটা কষ্ট সইতে হচ্ছে তা দেখা যায়।

তবে শেষে হিন্দু বাড়িতে থাকাকালীন এক শিশুর সঙ্গে তার আত্মিক যোগ দেখা যায় এবং এনিয়ে দ্বন্দ্ব হেতু তাকে সে বাড়িও ছাড়তে হয়েছে। তবে অনেকদিন বাচ্চাটাকে না দেখায় একদিন দেখতে গিয়ে জানে সে অসুস্থ, ঘা হয়েছে উরুস্তম্ভে। তার পরিচর্যা করতে গিয়ে কষ্ট দেখে ঘায়ের পরিস্কার বন্ধ রাখে, আপাতভাবে বাচ্চা ভাল থাকলেও ওই একটু অবহেলার জন্য বাচ্চার মৃত্যু হয়। সেদিন থেকেই কোনো স্লফ না রাখার শপথ নিয়েছিল সে।

এরপর 'বিজয়ার নমস্কার' গল্পটির শুরুতেই দেখতে পাব ব্যথা নামক চরিত্রের গৃহস্থালী সামলানোর চিত্র এবং বাড়ির চাকরদেরও হুকুম শোনার চিত্র। আসলে ব্যথা অন্নদাসত্বের পায়ে মাথা বিকিয়েছে। তার নিজের পথ দেখার ক্ষমতা নাই কারণ–

"বাংলা মুল্লুকের মেয়ের পক্ষে তাতেই জাতি নাশ অনিবার্য্য" ১৫

এই বাক্য মেয়েদের গৃহবদ্ধজীবনের ইঙ্গিতবাহী। ব্যথার জীবন যেহেতু অনুগ্রহের দানে কাটে তাই লাথি ঝাঁটা খেয়ে চুপ করে থাকাই তার জন্য নিরাপদ।

তবে হঠাৎ এক প্রৌঢ়াভদ্রমহিলা দ্বারে এসে ব্যথা দেবীর কথা জানতে চায় তারপর ব্যথাই তাকে নমস্কার জানিয়ে নিজের ঘরে বসায় এবং পরিচয় দেয়। তারপর ব্যস্ততা দেখে লেখার বিষয়ে জানতে চায়। সে কাজের ফাঁকে লেখে একথা জানায়। তারপর প্রৌঢ়া মহিলা আরও লেখা চেয়ে, পাঁচ টাকা দিয়ে চলে যান। এখানেও মেমের হাতে টাকা নেওয়ায় তার জাত গেছে বলে তাকে গঞ্জনা সইতে হয় এবং তাকে একঘরে করে দেওয়া হয়।

এরপর তার বিবাহিত জীবনের ভয়াবহ চিত্র পাই। ব্যথার মা এক বড় গৃহস্থ ঘরে কন্যা সম্প্রদান করে মারা যান। সংসারে দুই ভাই সকলেই মেজাজী, অসৎ ও সুরাপানে পটু। একদিন বস্ত্রের ব্যবসায় আগুন লাগলে জুয়াচুরির অপবাদে নালিশ হয়। এ নিয়ে তিনভাই আলোচনায় বসলে বচসা বাঁধে ও কাটাকাটি শুরু হয়। সেই ভয়ানক ক্যাঁচার বিষে ব্যথার স্বামীরও মৃত্যু হয়। পরে ভাসুর সব আত্মসাতের জন্য তাড়াবার পরিকল্পনা করে, এমনকি তার পাঁচ মাসের শিশুর ভুল চিকিৎসা করিয়ে প্রাণ সংহারও করে। এমনসময় দূর সম্পর্কীয় পিসতুতো ভাই ওই গ্রামে শ্বশুরবাড়ি গিয়ে এসব জানতে পেরে তাকে নিয়ে এলে ব্যথার ভাসুর তাকে দুশ্চরিত্রা বলে রটিয়ে তার সম্পত্তি ভোগ করে ।

এই ভাইয়ের থেকে ব্যথার শিক্ষা লাভ, ভাইয়ের বিদেশে যাত্রার পর থেকেই ভাইয়ের পিসিমার বাড়িতে আশ্রয়লাভের ইতিকথা শুরু। ওদিকে 'আনন্দ পত্রিকার' অফিস থেকে ওই মেম ব্যথাকে লেখা চিঠির উত্তর না পেয়ে গিয়ে হাজির হন এবং দুর্দশাগ্রস্ত ব্যথাকে নিয়ে যান সাথে। তারপর বিজয়াতে আশীর্বাদ এবং ব্যথার নমস্কার প্রদানে এই গল্প শেষ। এইভাবে লেখালিখি করতে যাতনা ও ডোমেস্টিক ভায়োলেন্সের চিত্র গল্পে দেখা যায়।

এরপর শিক্ষা প্রসঙ্গ ভিত্তিক উপন্যাস গুলির মধ্য 'অরু' রচনাটি বিশ্লেষণ করলে শুরুতেই অরুকে পড়াশোনার মধ্যে আবদ্ধ থাকতে দেখা যায় পিতৃ পরিবারে। কিন্তু শিক্ষিত অরুর অল্পবয়সে বিয়ে দিয়ে দেয় ইন্সিওরেন্স অফিসে চাকুরিপ্রাপ্ত প্রতাপ নামক পাত্রের সঙ্গে। ঠিক তখন থেকেই শিক্ষিত অরুর মতামত প্রকাশের পথ বন্ধ হয়ে যায়। অল্প কয়েকদিনের মধ্যেই জামাই পুলিশের হাতে ধরা পড়লে মেয়ে শ্বশুর বাড়িতে তার সাথে ঘটা সমস্ত অত্যাচারের কথা জানায় বাবার কাছে। মেয়ের সমস্ত গয়না জামাই বেচে দেয়, এমনকি লাথি মেরে ভ্রুন হত্যা করে দুবার এমন অবস্থায় বাবার কাছে অরু আশ্রয় নিলে জামাই নিজেই অরুর নামে কুৎসা রটায়। এই নির্যাতনের চিত্রের বর্ণনায় লেখিকা যখন লেখেন-

"এদেশের দেশাচারে স্বামীর অন্যায়কে ভক্তি করার নামই স্বামী ভক্তি!"১৬

তখনি মেয়েদের দুর্দশার চিত্র চোখের সামনে ফুটে ওঠে। এত কিছুর পর সব শুনেও মেয়ের মুখ চেয়ে বাবা জামাইকে পুলিশি ঝামেলা থেকে মুক্ত করতে টাকার জোগাড় করে। এরকম দুশ্চিন্তার মধ্যে পিতার মৃত্যু হয়, এ ঘটনার কিছুদিনের মধ্যে মায়েরও মৃত্যু হয়। তখন স্বামীর অত্যাচারে জর্জরিত, পিতা-মাতা হারা অরু খুব আসহায় বোধ করে। এমন সময়ে দূর সম্পর্কের এক মাসীমার আশ্রয়ে চলে যায় অরু। মাসিমার মেয়ে-জামাই কিছুদিন মার সাথে কাটিয়ে অরুর কাছে মার দায়িত্ব দিয়ে তারা কর্মক্ষেত্রে চলে যায়। এ দায়িত্ব ভারের জন্য দিতে চাওয়া টাকা অরু নিতে অস্বীকার করলেও জোরপূর্বক তাকে দিয়ে দেয় প্রতিমাসে। এভাবে বেশকিছুদিন কাটে অরুর, তারই মাঝে হঠাৎ একদিন প্রতাপ জেল থেকে ছাড়া পেয়ে অরুর খোঁজ করে হাজির হয় মসিমার বাড়ি। আবার অরুর আপাত শান্তির জীবনে পরে ছেদ। নানা অজুহাতে স্বামী ফের চায় টাকা। লোভ,

ঔদ্ধত্ত, অনাচারের বশে জর্জরিত প্রতাপ যখন অরুর মাসিমার মেয়ের স্বামী রজনী বাবুকে ঈর্ষা করে বলে-

> "পয়সার জন্যে আমি সব করেছি-সব করতে পারি। পয়সার জন্যে ফের সেই সব কাজ করব, দেখে নিয়ো। জেলখানাকে থোড়াই কেয়ার করি।" ১৭

তখনি তার স্বরূপ প্রকাশ পায়, যা দেখে অরু হয় চিন্তান্বিত ও মাসিমার ঘর ছাড়তে উদ্যোগী। এই পরিস্থিতিতে সব দেখেশুনে মাসিমাও মারা যান। এই খবর পেয়ে মাসিমার মেয়ে জামাই আসে বাড়িতে। তখন মাসিমাদের লেঠেল পশুপতি বাগকে হাত করে পাড়ার এক সদস্য ভবতারণ দাসের বাড়ি থেকে সোনার হার ও শাঁখা চুরি করে নেয় প্রতাপ। তবে লেঠেলের সত্য স্বীকারে ধরা পরে প্রতাপ, কেবল অরুর মুখ চেয়ে তাকে ছেড়ে দেওয়া হয়। এই ঘটনার পর প্রতাপের ক্রোধ মাসিমার মেয়ে জামাইয়ের উপর পরে এবং অনিষ্ট সাধনের মাধ্যমে প্রতিশোধ স্পৃহা চরিতার্থ করতে চায়। অরু স্বামীর অভিসন্ধি বুঝতে পেরে দিদি জামাইবাবুকে সব জানিয়ে দেয় আগে থেকে কিন্তু নিজে কিছু করতে পারেনা স্বামীর ভয়ে। বিবাহের পর স্বামীর উগ্র ব্যবহারের কোনও প্রতিবাদ করার ক্ষমতা ছিলনা সব মিলিয়ে অরুর অবস্থা–

> "জীবনে তাহার একটি মাত্র দায়িত্ব আছে, -সেটা চুপ করিয়া থাকা।" ১৮

এইভাবেই অসহায় অরুর জীবনচিত্র ফুটে ওঠে রচনায় যা অত্যন্ত বেদনাদায়ক। যাইহোক শান্তস্বভাবা অরুর সবাইকে নিষ্পত্তি দিতে এই চুরির ঘটনা তার সহায় হল। দিদিরা তাকে কোনোমতে একা ছাড়তে চায়না এদিকে স্বামী হেতু সেও কারো অনিষ্ট চায়না অবশেষে চুরির ঘটনার পর সে বাড়ি ছাড়ল।

এরপর স্বামী তার বাবার বাড়ির সমস্ত কিছু বেচে দিয়ে নিজের বাড়িতে চাকর সহযোগে অতিরিক্ত বিলাসিতায় জীবন কাটায় কিছুদিন, অরুকেও কোনও কাজ করতে দেয়না । এইভাবে বেশকিছুদিন কাটার পর টাকা যখন শেষের পথে তখন কিভাবে উপার্জন হবে সেকথা ভাবতে গিয়ে এক সাধুসংসর্গে জড়িত হয়ে সাধুর জনপ্রিয়তা বাড়ায় আর নিজের বাড়ায় দৈনতা। এভাবে সাধুর কথা মত তার জীবনে অর্থ না আসার কারণ হিসাবে অরুকে বাধা ভেবে খুনকরার কথাও ভেবে নেয়। অবশেষে একঘরে বন্দি থেকে মেয়েদের থেকে দূরে থেকে খেচরীমুদ্রা সাধন করতে চায় তাই সাধুর কথামতো আলজিভে দশদিন গোয়ালের মাটি রেখে প্রতাপের প্রাণসংশয় ঘটে, অবশেষে মারা যায়।

শোকাহত অরুর কিছু করার রইল না দুঃখ প্রকাশ ছাড়া। সবশেষে মাসিমার বাড়ি আশ্রয় নেয় তখন মাসিমার জমানো টাকায় যে স্কুল তৈরির পরিকল্পনা সেখানে অরুকে প্রধান নির্বাচন করে, কারণ জামাইবাবু উপলব্ধি করেছিলেন মেয়েরা শিক্ষা পেলে ভবিষ্যৎ হবে উজ্জ্বল এমনকি সন্তান পালনের ও কর্মের জন্যও শিক্ষার প্রয়োজন । তাই দুজন সহকারী ও দারওয়ান সহযোগে স্কুল শুরু হয়। স্কুল অরুর মাধ্যমে রমরমিয়ে চলে পরে শিল্পকলারও উন্নতি হয় অরুর দ্বারা। এভাবেই রচনার মধ্যে মেয়েদের নির্যাতন সহ্যকরেও শিক্ষার আশ্রয়ে প্রশান্তির দৃশ্য বিদ্যমান এবং কর্মের মধ্যেদিয়ে আত্মতুষ্টির চিত্র দেখা যায় রচনায়। পাশাপাশি অরুকে কেবল বৈধব্যের নিয়মপালনের মধ্যে বেঁধে রাখেনি তাকে শিক্ষার মাধ্যমে স্বনির্ভর করে গড়ে তুলেছেন। এখানেই বৈচিত্র ধরা পরে।

এরপর 'জন্ম-অভিশপ্তা' উপন্যাসেও শিক্ষিত ও চাকুরীরত নারীর নির্যাতনের চিত্র দেখা যায় গুরুমা চরিত্রকে কেন্দ্র করে। স্কুলের কয়েকজন শিক্ষয়িত্রী ও সরযু নামের এক ছাত্রী ও অন্যান্য ছাত্রীদের নিয়ে কাহিনী শুরু। স্কুলজীবনে সরযু অন্যান্য শিক্ষয়িত্রীদের

থেকে নতুনগুরুমার প্রতি একটা আলাদা অনুভূতি অনুভব করত। একদিন শ্রেণীকক্ষে পঠন পাঠন চলাকালীন নতুনগুরুমার একটা চিঠিথআসে। পাঠ শেষে গুরুমা চিঠি নিয়ে যেতে ভুলে যায়, সেটা সরযূ লক্ষ করে এবং কেউ যাতে চিঠি না পড়ে ফেলে তার আগেই নিজেই নিয়ে নেয় এবং গুরুমার বাড়ি গিয়ে দিয়ে আসে। এমনি করে তাঁদের মধ্যে সহৃদয়তা তৈরি হয় এবং নতুনগুরুমার পুত্রদের (সুকু ও শান্তি) সহিত সরযু মিশে যায়। এরপর স্কুলে ধেবুরানি নামে এক ছাত্রীর সঙ্গে মারপিঠ হয় অন্য ছাত্রীর সঙ্গে। বিনা দোষে বান্ধবীরা বেত খায় প্রতিবাদ করতে গেলে সরযূকেও বকাবকি করে মেজগুরুমা, এঅবস্থায় রেগে বাইরে চলে যায় সরযু নতুনগুরুমা সেদিন সরযুকে নিজের বাড়িতে আশ্রয় দেয়। অসুস্থ গুরুমার বিশ্রামের সময় সরযু সেই চিঠি পরার লোভ সামলাতে না পেরে অনেক দিধা দ্বন্দ্ব কাটিয়ে পড়ে নেয়। তখনি উঠে আসে নতুনগুরুমার করুণ জীবনবৃতান্ত।

সেখানে বারো বছর বয়সে বাবা মাকে হারিয়ে বিধবামাসীর আশ্রয়ে বেড়েওঠা ও অল্পবয়সে বিয়ে দিয়ে দেওয়ার চিত্র বিদ্যমান। শ্বশুর বাড়িতে সবার মনযুগিয়ে চলা ও নির্যাতন সহ্য করার ছবি দেখা যায়। স্বামীর অত্যাচারে প্রথমসন্তান নষ্ট হয়। এ সকল সহ্য করে ইশ্বরের কাছে আত্মার উন্নতি প্রার্থনা করে। এত অত্যাচারের মুখে দাঁড়িয়েও পরে দুই সন্তানের জন্ম দেয় গুরুমা। এই শিশুরাই বাবার অবহেলায় বিনা চিকিৎসায় ভোগান্তির শিকার হয়। এভাবে নিপীড়ন সহ্য করে দুইসন্তান সঙ্গে নিয়ে গুরুমা বাড়ি ছেড়ে শিক্ষকতার কাজ নেয়। এখানেও নিস্তার নেই টাকার লোভে স্বামী হানা দেয় বার বার এবং উগ্র মেজাজে যখন জানায়–

> "জানো তুমি, আমি তোমার স্বামী, তোমার ওপর সকল রকম নৃশংস নির্যাতনের অধিকার আমার আছে"? ১৯

তখনি আত্যাচারী স্বামীর স্বরূপ স্পষ্ট হয়।

এরকমভাবে হঠাৎ একদিন টাকা দিতে নাকচ করলে সন্তানদের খুনের হুমকি দেয় সেদিন সরযু উপস্থিত। দেখে গুরুমার মাথাফাটা অবস্থা, প্রতিবাদের জন্য এগিয়ে এলে আঘাতে সেও অজ্ঞান হয়ে যায়। হসপিটালে বিকারগ্রস্ততা কাটিয়ে সরযু জানতে পারে নতুনগুরুমার একটা হাত নেই ও গুরুমার ছোটছেলেও আর নেই। এইরকমভাবে শিক্ষিত নারীর যে দুর্ভোগের চিত্র পাওয়া যায় রচনায় তা অত্যন্ত ভয়াবহ।

এরপর 'অবাক' উপন্যাসে শিক্ষিত বেগম চরিত্র ও তার যুক্তিপূর্ণ কথা দেখা যায়। আঠারো- উনিশ বছর বয়সী বেগমকে পড়াশোনা নিয়ে থাকতে ও বিয়ে নিয়ে অনীহা প্রকাশ করতে দেখা গেছে। দিদির বারবার জোরাজুরিতে বেগম যখন জানায়-

" ধিঙ্গি হবার মতলবও নাই, পীর হবার দুরভিসন্ধিও নাই। তোমাদের পাঁচজনের আশীর্ব্বদে আপাততঃ একটু ফুরসুৎ পেলে-নিজেকে মানুষ করে গড়ে তুলে বাঁচি! " ২০

তখনি তার বাস্তববাদী মনের প্রকাশ লক্ষ্য করা যায় ও দিদির অসন্তুষ্টি চোখে পড়ে। এছাড়াও বেগমের যুক্তিগ্রাহী মনের চিত্রও নজড়ে আসে যখন মায়ের অসুস্থতার কারণ হিসাবে মা জানায়-

"ওরে বাছা, যখন অসুখ হবার হয়, তখন আপনিই হয়" ২১

তখনি বেগমের প্রতিবাদী কণ্ঠে শোনা যায়-

" ওরে শোভানি,-আজ ওই বাগানের পচা পাৎকুয়ার জল দু টব এনে দিস তো আমায়।" ২২

এভাবেই বেগমের প্রতিবাদের মাধ্যমে তার বিবেচনাবোধের পরিচয় পাওয়া যায়। আবারও বেগম যখন তার দিদির বাচ্চাদের বারবার জ্বর সর্দিতে ভোগান্তি দেখে জানায়–

"অযোগ্য অবস্থায় বিয়ে করে পালখানেক রুগ্ন, নির্জীব অযোগ্য, দুর্বল সন্তান সৃষ্টি করে তাদের মরণ বাঁচনের ধাক্কায় সংসার শুদ্ধ আত্মীয়দের প্রাণ সামলানো দায় করে তোলাই যে হচ্ছে সংসারের একমাত্র মহদুপকার সাধন!" ২৩

তখনি শিক্ষিত বেগমের যুক্তিগ্রাহী চরিত্রের প্রকাশ দেখা যায়। যাইহোক পুরো রচনায় বেগম ও তার দিদির খুনসুটি, হাসি, ঠাট্টা ও বেগমের জ্ঞান প্রকাশ পায়। সবশেষে বেগমকে কৃষিতত্ত্ব নিয়ে পাঠরত মনিরুদ্দীনের সঙ্গে সংসারী হতে দেখা গেছে।

এরপর 'তেজস্বতী' উপন্যাসের বিষয়ে চোখ রাখলে দেখা যাবে সেখানে পড়াশুনা করতে গিয়ে পরিবার ও লোকসমাজের থেকে পাওয়া নানান যাতনার চিত্র। পিতা ও বড়দাদাকে হারিয়ে তৃপ্তির মা, ছোটদাদা দেবেন্দ্র, ছোটভাই, বোন এদের নিয়ে দিন যাপন করার চিত্র দেখা যায়। শিক্ষিত দাদা দেবেন্দ্র চাকরি থেকে বহিষ্কৃত হয়ে গ্রামের জমিদার মহাদেব বাবুর সঙ্গে মিশে তাস, মদ, জুয়া, বেশ্যা নানান সংসর্গে জড়িত হয়ে পড়ে। এতটাই তার ব্যবহারের অবনতি হয় যে রাতে ফেরা, আড্ডায় ভোজ খাবার নেশায় উপবাসরত মায়ের প্রদত্ত আহার ছুঁড়ে ফেলে চলে যাওয়া, বোনেদের পড়াশোনার বিরোধিতা করা, নিজেদের বাড়ির ভাড়া আত্মসাৎ করা, টাকার লোভে মহাদেব বাবুর সঙ্গে বোনের বিয়ে দেওয়ার মতো ভাবনাও তার মাথায় আসে। এই পরিস্থিতিতে তৃপ্তি ঘরের সব দায়িত্ব একা সামলায়। এসব কিছুর মত্ততায় দাদা কোনোরকমে মহাদেববাবুর সঙ্গে বিয়ে দেওয়ার অছিলায় বোনেদেরকে সিনেমা দেখতে নিয়ে গিয়ে দেখা করানোর মতো ফন্দি আঁটতেও পিছুপা হয়নি, তবে বোনেরা কিন্তু দাদার ফন্দির জালে পা দেয়নি। ফন্দি বিফলে গেলে ক্রোধিত দাদা বোনেদের শিক্ষা নিয়ে বলে-

" মেয়ে মানুষকে লেখাপড়া শেখালে সে উচ্ছন্ন যায়, লোকে বলে ঠিক! যেমন আহাম্মক ছিলেন বাবা, তেম্নি দাদা, তাই তোকে লেখাপড়া শিখিয়েছেন!" ২৪

এই বলেই দাদা খান্ত হয়নি যে স্কুলে বোন তৃপ্তি পড়িয়ে রোজগার করে সংসারের হাল ধরেছিল সেখানে কুৎসা রটিয়ে আবেদন জমা দেয় এবং বোনেদের বিয়ে না হওয়া নিয়ে বাড়িতে জানায়-

> "দশের সাক্ষাতে যে সব কথা আমায় শুনতে হয়,- লজ্জায় মাথা কাটা যায়। দু'দুটো থুবড়ি মুখপুড়ি ঘরে। লোকের কাছে-" ২৫

তখনি দাদার কণ্ঠে সমাজেরও সুর ধ্বনিত হয়। যাই হোক তৃপ্তির মার্জিত ব্যাবহারে সেবারের মতো চাকরি রক্ষা হয়। এছাড়াও বোনেদের উপর জোরজুলুম ভালোভাবে খাটাতে পারবে মা না থাকলে তাই মার কলতলায় পড়ে গিয়ে বিপদ হতে পারার খবর শুনে জানায়-

> "কৃতার্থ হতুম!" ২৬

এভাবেই ঔদ্ধত্যের সঙ্গে বিরাজমান দাদা বেশকয়েকদিন বাড়ি না ফিরলে সবার দুশ্চিন্তা বারে, এদিকে মার শরীরও ক্রমশ ক্ষীণ হয়। এমনসময় খুড়তুতো দাদা প্রবোধ এর মাধ্যমে বেশ্যালয়ে একজনের মৃতদেহের কথা শোণা যায় পরে পাশের বাড়ির অনুপম দার মাধ্যমে দেহ চিহ্নিত হয়। এদিকে মাও ছেলে চাকরি নিয়ে বাইরে গেছে এসংবাদ শুনেই পরলোক গমন করে। অবশেষে শোকের মাঝেও তৃপ্তি সব নিয়মপালন করে পরলৌকিকক্রিয়া সম্পন্ন করে এবং সংসারের দায়িত্ব নেয়।

এভাবে চলতে চলতে হঠাৎ একদিন মহাদেববাবু তৃপ্তির নিষেধ সত্ত্বেও বাড়ি ঢুকে দাদার দেনারকথা হ্যান্ডনোটসহ জানায় এবং শোধের উপায় হিসাবে একান্তে দেখা করার কথা জানিয়ে চলে যায়। এই অবস্থায় পাশের বাড়ির জেঠাইমা ও তার পরিবার তৃপ্তিদের

পাশে ছিল। অনুপমদা ও তার পুলিশবন্ধু শংকরবাবু দাদার করা ঋণের বিষয় খতিয়ে দেখার দায়িত্ব নেয় এবং তৃপ্তি দুই ছাত্র পায় তাঁদের বাড়ির থেকে।

এদিকে পুনরায় রাত্রিবেলা মহাদেববাবু তৃপ্তিদের বাড়ি হানা দিলে পথের প্রহরীর মারফত রক্ষা হয়। পরে মহাদেববাবুর সমস্ত বেআইনি কাজ ধরা পড়ে ও পাঁচহাজার অর্থদণ্ড সহ দীর্ঘকালের জন্য সশ্রমকারাদণ্ড হয়। এরমাঝেই তৃপ্তি শংকরপুরের রানির বিধবা কন্যাকে পড়ানোর কাজ পায়। কাজ নিয়ে বাইরে যাবার আগে শংকরবাবুর ভাই শম্ভুবাবুর সঙ্গে সুধার বিয়ের প্রসঙ্গ উঠলে তৃপ্তির মতামত নিয়ে বিবাহ সম্পন্ন করে কাজের উদেশ্যে রওনা দেয়। কর্মক্ষেত্রেও রানির মন জয় করে এবং সম্পত্তি তছরুপের হাত থেকে বাঁচিয়ে রানির প্রিয়পাত্রে পরিণত হয়। এভাবে আড়াইবছর কাটিয়ে চারমাসের ছুটিতে বাড়ি ফিরে শংকরবাবুর ছেলে মুক্তির মৃত্যু সংবাদ পায় এবং শংকরবাবুর পাগলপ্রায় অবস্থা দেখতে পায়। এই পরিস্থিতিতে শংকরবাবু ও তৃপ্তির বিয়ে হয়। ওদিকে রানির ওখানে কাজের জন্য বিশ্বস্তলোক দেওয়া হয়। এভাবেই উপন্যাসে বিপত্তি সত্ত্বেও নারীর টিকেথাকা ও শিক্ষার মাধ্যমে স্বাবলম্বী হওয়ার চিত্র দেখা যায় যা অত্যন্ত হৃদয়গ্রাহী। এমন করেই তিনি শিক্ষা ও সমাজ সংক্রান্ত নিজস্ব উপলব্ধিকে ভাষা দান করে বাংলা সাহিত্যভাণ্ডারকে করেছেন সমৃদ্ধ, যা অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ ও প্রশংসিত।

(খ) সমাজ কেন্দ্রিক রচনা-

কথা সাহিত্যিক হিসাবে শৈলবালা ঘোষজায়া বাংলা সাহিত্যে সম্মান লাভ করেছেন তাঁর সৃষ্ট সাহিত্যের জোরেই। বিশশতকের প্রথমার্ধে পুরুষকণ্ঠের নিয়ন্ত্রণে চালিত নারীর যে জবানবন্দি-সেই গণ্ডি অতিক্রম করে শৈলবালা ঘোষজায়া যে অভিজ্ঞতা- উপলব্ধির দৃষ্টান্ত সাহিত্যে রেখে গেছেন তা অনবদ্য। তিনি সে সময় সাহিত্য সাধনা করেছেন তখন

মেয়েদের লেখা মানেই সেটা একবাক্যে প্রকাশ হবে এমনটা নয় তাই তার এই বিশাল সাহিত্য ভান্ডার যে উৎকৃষ্ট একথা বলা যায়। তিনি তাঁর নানান অনুভূতিকে সাহসের সঙ্গে ভাষাদান করেছেন। মানব অস্তিত্বের যাবতীয় ছবি অবিকৃতভাবে ফুটে উঠেছে তাঁর গল্প-উপন্যাসের ক্যানভাসে।

সংস্কার, সামাজিক প্রথা, রক্ষণশীলতা না থাকায় পিতৃ পরিবার ছিল পড়াশোনার অনুকূল। তিনি বর্ধমান রাজ বালিকা বিদ্যালয়ে পড়াশুনা করেছিলেন। ১৩ বছর বয়সে বর্ধমান জেলার মেমারি গ্রামে নরেন্দ্রমোহন ঘোষের সঙ্গে বিবাহের সূত্রে তাঁর সাহিত্য সাধনায় প্রতিকূলতা আসে। তবে প্রতিকূলতাতেও নিজের ঐকান্তিক আগ্রহে সাহিত্য চর্চা ও লেখালিখি চালিয়ে গেছেন তিনি। তাঁর রচিত গ্রন্থের সংখ্যা ৫০-এর মতো। এই বিপুল সংখ্যক সাহিত্য ভাণ্ডারের স্রষ্টা হয়েও তিনি এক প্রকার অনালোচিত থেকেই গেলেন। সমাজের যে সমস্ত বিষয় তাঁর হৃদয়ে দাগ কেটেছে তা দিয়েই তিনি তাঁর সাহিত্যের আঙিনা ভরিয়ে তুলেছেন।

তাঁর রচিত গল্পগুলিতে সমাজের বিভিন্নদিক কিভাবে ফুটে উঠেছে তাই আলোচনার চেষ্টা করব তাঁর নির্বাচিত কয়েকটি গল্প অবলম্বনে। তাঁর রচিত গল্পগুলির একটা বিরাট অংশ জুড়ে প্রতিকূলতায় মেয়েদের শিক্ষা অর্জনে যাতনা, শিক্ষার মাধ্যমে সচেতনতার বোধ, সংসারে আবদ্ধ নারীর নিয়মমাফিক জীবনযাপন এবং পূণ্যের জয় ও পাপের দণ্ড বিধান করেছেন বিভিন্ন চরিত্রের মধ্যে দিয়ে।

এর পাশাপাশি জাত-পাত প্রসঙ্গ ও জাতির ভিত্তিতে পেশা নির্বাচন, ধর্মানুষ্ঠানের সাথে যুক্ত মানুষের দুর্মতির, ভণ্ডামী, ডাকাতি, সামাজিক কুসংস্কার, সাধারণ গৃহস্থ যাপনচিত্র, বিধবা বিবাহ, পনপ্রথা, বিজ্ঞান নির্ভর মানসিকতা, নারীহরণ, সতীত্ব নষ্ট ও

খুনের দৃশ্য, যুদ্ধের বর্ণনা ও নিয়ম কানুন এবং সমাজে পুলিশি শাসনের প্রসঙ্গ প্রভৃতি দেখা যায়। তাঁর এই উপলব্ধি বর্তমান সময়েও তাৎপর্যবাহী। এখন আমরা তাঁর রচনাগুলি (নির্বাচিত) বিশ্লেষণের মাধ্যমে বিষয় গুলি দেখতে পাব।

এই প্রসঙ্গে প্রথমেই আমাদের আলোচ্য 'লাফো' গল্পটি। ডোমেস্টিক ভায়োলেন্সের চিত্র পাই 'লাফো' গল্পে। প্রথমেই রেঙ্গুনে বসে এক ঠিকাদারির কাজে নিযুক্ত ব্যক্তির সঙ্গে লাফোর দেবদারু গাছের তলায় বসে জীবনের ইতিহাস বলার দৃশ্য দেখা যায়। এখানে লাফো জানায় বাঁকুড়া জেলার সোনাগঞ্জে রায়বাহাদুরদের জমিদারী মহল্লায় তার কাজ ছিল। বাবা মারা যাবার পর খুড়ার কাছে সে মানুষ হয়েছিল। খুড়ার দুই সন্তান শঙ্কর ও শোভা। শোভার বিয়ে কাকার মৃত্যুর জন্য বন্ধ থাকে তখন কুসুমপুরে দে-দের জমিদারী সেরেস্তায় কাজ নেয়। এমন সময় লাফোকে কেন্দ্র করে রায়বাবুরা ঈর্ষাপরায়ণ হয়ে পড়ে। শোভাকে তুলে নিয়ে যাওয়ার খবর শঙ্কর তাকে দিতে এলে সে তৎখনাৎ ভোজালি নিয়ে বেরিয়ে রায়বাবুদের বাড়ির মহলে সোজা ছোটো বাবুর ঘরে গিয়ে গলায় ভেজালি ধরলে তার স্ত্রী করুণ মিনতি নিয়ে ছেরে দিতে বলে অবশেষে আওয়াজে নীচ থেকে লোক উপরে আসে সেই মুহূর্তে শঙ্করকে নিয়ে ছাদ থেকে ঝাঁপ দেবার কথা ভাবে শঙ্কর দেরী করলে ভোজালি দিয়ে তার মাথা কেটে ঝাঁপ মারে। অনেকটা দৌড়ে সজ্ঞা হারায়, যখন সম্বিত ফেরে তার হৃদয় চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়। অবশেষে সেই মুণ্ডু এই দেবদারু গাছের তলে মাটি দিয়ে রাখে। এদিকে বাড়িতে খুড়ি জানে শঙ্কর তার কাছে নিরাপদে আছে, এইভাবে তার কৃতকর্মরে জন্য লাফোকে যন্ত্রণায় দগ্ধ হতে দেখা যায়। এর পাশাপাশি জমিদার শ্রেণীর দুর্মতি ও অর্থের প্রভাব প্রতিপত্তিতে কুকর্মের কথা চাপে পড়ে যাওয়ার দৃশ্যও দেখা যায় তার বোনের জলে মৃত দেহ পাওয়ার মিথ্যা রটনায়।

'গোলাপ সিংহ' গল্পটিতে দেখা যায় এক গোর্খার দুঃসাহসিক কৃতিত্ব। বাঘের হাত থেকে মনীবের প্রাণ বাঁচায় নিজের প্রাণ তুচ্ছ করে। গোলাপ সিংহের জীবনের কাহিনীতে দেখা যায় সে গোর্খা পল্টনে কর্মরত। সেখানে পাড়ার এক মেয়ের বিয়ে হয়েছিল ওই পল্টনের উচ্চপদস্থ কর্মচারীর সঙ্গে। স্বামী ও শ্বশুরের কাছে অত্যাচারিত হতে থাকা মেয়েটি গোলাপ সিংহকে সব জানায়। এঘটনার পর তার অত্যাচার আরও বাড়ে। তখন গোলাপ সিংহ মেয়েটিকে পালাতে সাহায্য করে বীনা ছুটিতেই। এমন সময় পথের মধ্যে মোহাবিষ্ট হয়ে পড়ে গোলাপ সিংহ যার ফলস্বরূপ তাদের ওই সন্তান শম্ভু সিংহ জন্ম নেন। সেই থেকে গোলাপ সিংহকে মেয়েটি ঘৃণা করত। আর সমাজের চাপে মেয়েটিকে বাঁচাতে স্ত্রী বলে সম্মান দেয়। এদিকে গোলাপ সিংহের মাতা পুত্রকে অভিশাপ দেন– পবিত্রতা নাশকারী তোর দেহ যেন পশু দ্বারা ধ্বংস হয়। এরপর থেকেই তিনি বিবাগী। শেষে মৃত্যুর আগে রায়বাহাদুরের উর্দ্ধতন কর্মচারীকে দুটি কথা তার পুত্রকে বলার দায়িত্ব দিয়ে মারা যায়। এইরকমভাবেই গল্পের মধ্যে ডোমেস্টিক ভায়োলেন্স ও পাপের ক্ষয় পূণ্যের জয় ধ্বনিত হয়। এরকম নির্যাতনের দৃশ্য 'বিজয়ার নমস্কার' ও 'কার্য্য-কারণ' গল্পেও দেখা যাবে পরবর্তী বিশ্লেষণ অংশে।

এছাড়া তাঁর কিছু গল্পে ঈশ্বর বিশ্বাস-এর প্রসঙ্গ, জাতপাত প্রসঙ্গ এবং পাপের ক্ষয় ও পূণ্যের জয় দেখা গেছে। সেইরকমই একটি গল্প হল 'ভূমিকম্প'। গল্পের প্রথমেই মনীব ও ভৃত্যের ভূমিকম্পের সম্মুখীন হওয়ার দৃশ্য দেখা গেছে। এই গল্পে মনীবের একাকী জীবনযাপন প্রণালী দেখা গেছে, তবে যাই হোক ভূমিকম্পে সারা গ্রাম যখন ধ্বংস হয়ে গেছিল তখন তারা বাইরে থাকার জন্য বেঁচে যায়। এখানে ভুমিকম্পে কোন স্থান নিরাপদ তার ইঙ্গিত পাই।

'ভূমিকম্প' গল্পটি আলোচনায় দেখতে পাব সেখানে এক পেনশন প্রাপ্ত বৃদ্ধ এবং তার চাকর লছমনের প্রসঙ্গ রয়েছে। এখানে প্রভু-ভৃত্যের জীবনযাপনের প্রসঙ্গ আছে। প্রভু সাধনা করে তাই মাঝেমধ্যে উপবাস করে ফলমূল দুধ খেয়ে দিন কাটায় অমাবস্যা পূর্ণিমা উপলক্ষে, আর ভৃত্য যেদিন না আসে অত্যন্ত জরুরি কারণে সেদিন খায় ওসব খাবার। এভাবে দিন চলে যায় মন্দিরে একা একা। একদিন হঠাৎ লছমন বাজারে গিয়ে জানতে পারে আজ নাকি সপ্ত গ্রহ যোগ অর্থাৎ মহাভারতের যুদ্ধের দিনে এই যোগ ছিল, তাই নাকি যুদ্ধ। সে কথা স্মরণ করে আজকে ভয়ংকর কিছু ঘটার আভাস পাচ্ছে জ্যোতিষীরা। কি খবর জানতে পেরে এসে প্রভুকে জানায় এবং এই সপ্ত গ্রহযোগ নিয়ে নানান প্রশ্ন করতে থাকে।

পেনশন প্রাপ্ত কেরানি পুত্র হরনাথ এসিস্ট্যান্ট স্টেশন মাস্টার, বাবার আপদে বিপদে আসে যায়, বৌমাও শ্বশুর কে নিজেদের কাছে রাখতে চায় কিন্তু শশুর ওখানে থাকতে চায় না। তার একা থাকার অভ্যাস তাই বিপদ না হলে একাই থাকে প্রভু। এভাবেই প্রভু এবং ভৃত্যের দিন চলে যায়। তবে সেদিন বাজারে জ্যোতিষীদের বাণী শোনার পর প্রভু গঙ্গাস্নান করতে যায়, সঙ্গে লছমন যেতে চায়, তবে প্রভু জানায় যে তোর মা চিন্তা করবে তাই মাকে ছুটে গিয়ে একটু খবরটা জানিয়ে আয়, এটা শুনে লছমন ছুটে গিয়ে খবরটা মাকে জানিয়ে চলে আসে। তারপর প্রভুর সঙ্গে স্নানে বেরিয়ে পড়ে। যখন বেলা দুটো বাজে তারা কষ্ট হারিনীর ঘাটে স্নানে যায়। হঠাৎ দুজনেই কম্পন অনুভব করলে ভাবল হয়তো অনিয়মের কারণে তার মাথাব্যথা তাড়াতাড়ি শুরু হয়েছে। কিন্তু প্রভু দেখে ভৃত্যও তাকে জড়িয়ে ধরেছে তখনই কম্পনের অনুভূতিটা দুজনেই প্রকাশ করে। দুজনই একে অপরকে ধরে থাকে এবং একটা পাথর কেউ ধরে থাকে। হঠাৎ লছমন এই কম্পনের দাপটে অজ্ঞান হয়ে যায় পরে প্রভুও জ্ঞান হারায়। যখন জ্ঞান ফেরে ধীরে

ধীরে মনে পড়ে সব। একজন তাকে দুধের সঙ্গে ব্র্যান্ডি মিশিয়ে খাওয়ানোর পর জ্ঞান ফেরে। তারপর তারা কোথায় যে আছে এটাও জানতে পারে। এটাকে সেবা ভবন বলে জানায়। সেবা দানকারী লোক এক সন্ন্যাসী সে চন্ডী পাঠ করে ধীরে ধীরে খবর পায় পুরো মুঙ্গের অঞ্চল ক্ষতিগ্রস্ত, জামালপুর ধ্বংসস্তূপে পরিণত হয়েছে, রেললাইন টেলিগ্রাফ সব খারাপ, বাইরের খবর পাওয়া যাচ্ছে না। এই সমস্ত কিছুর মাঝে জানা যায় লছমনের ভাই, বৌদি, মা সবাই মৃত। ওইদিন বাড়িতে থাকা সমস্ত লোকজন শেষ হয়ে গেছে, কেবল যারা বাইরে ছিল তারা বেঁচেছে। ধীরে ধীরে বাইরের খবর ভয়াবহ ভাবে শুনতে পাওয়া গেল। সে যেন অনুভব করেছিল কম্পন কালে মায়ের কোলে দোল খাওয়ার অনুভূতি।

এরপরে ছেলে আসে নিতে এবারে আর বাবার কথা শোনে না, এসে বাবকে সঙ্গে নিয়ে গিয়ে স্টেশনের পাশে তাদের থাকার ব্যবস্থা করে দেবার কথা জানায়। সে এখন হুগলি না মগরার স্টেশন মাস্টার। ১৪ দিন কেটে গেছে, তখনও ধ্বংসস্তূপ সরিয়ে শব দেহ উদ্ধার হয়নি। এর মধ্যে খবর আসে এখানে জীবিত কালে ইসমাইল ফেকুপাঁড়ের চানাচুর বিক্রি কালীন যে ডাক দিত, সেটাকে বিকৃত বিদ্রুপ করত। এই নিয়ে বচসা হতে হতে সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষের পর্যায়ে পৌঁছায়। ভূমিকম্পে যেন সেই সমস্ত বিদ্বেষ একেবারে শেষ হয়ে গেল। একে অন্যের ঘাড়ে মাথা রেখে মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়ে।

নিজের বাড়িতে ধ্বংসের থেকে একটা ভাঙ্গা বাক্স বের করে তার থেকে 300 টাকা বের করে। হঠাৎ তাড়িনী মুখুজ্যে উপস্থিত হয় সে এসে বলে দিনু কাকা এতদিন কোথায় ছিলে সবাই। স্বদেশী লিমিটেড কোম্পানি ওয়ালা চন্দ্র চ্যাটার্জির খবর শোনার বিষয়ে কথা বললে দীনু শোনেনা বলে তাকে জানায়। তখন সম্পদ উদ্ধার করতে গিয়ে

ধ্বস হয়ে মাথার খুলি চুরমার হয়ে তার মৃত্যু ঘটেছে জানতে পারে। চন্দ্র চ্যাটার্জির কুকীর্তি আছে স্বদেশী কোম্পানিতে। এখানে অনেক আগে দীনু তার আয়ের টাকা দিয়েছিল কথা ছিল লাভ হলে পরে দেবে কিছু অর্থ। তাকে দেখে কিছু সৎ ব্যক্তি এমনকি বিধবারাও সেদিন দেশোদ্ধাদের জন্য সাধ্যমতো টাকা উৎসর্গ করে। তাদের টাকা সেদিন এই চন্দ্র চাটুজ্যে সব আত্মসাৎ করে নেয়, আর বলে সে কিছু জানে না কোম্পানি জানে। তারপর টাকা উদ্ধারের জন্য ধরাধরি করলে ইম্পসিবল বলে দেয়। সে তখন কাউন্সিলর মেম্বার, আত্মসাৎ করা টাকায় তখন বেশ প্রভাব প্রতিপত্তি চারিদিকে। বাড়ি ভাড়া খাটায় এরকম রমরমা তার। ভূমিকম্পের পর তার বর্তমান পরিণতি এটা। তাড়িনীও এখন সে ধাক্কা সামলাচ্ছে। বিধবাদের কিছু সাহায্য করা হয়েছিল তখন যারা অসহায় ছিল তাদের বিপদেও পাশে ছিল কারণ দীনুর জন্যই তারা টাকা দিয়ে ফেঁসে ছিল। একেবারে যাবার সময় ৩০০ টাকা তাড়িনীর হাতে দেয়, সে নিতে সংকোচ করলে দীনু তাকে দেখার জন্য তার নিজের ছেলে আছে বলে জানায় এবং তাড়িনীকে ভাঙ্গা হাতটা দেখিয়ে নিতে বলে। এইভাবে ১৩৪০ সালে ঘটা ভূমিকম্প কে কেন্দ্র করে মানুষের পাপ কাজের পরিণতি দেখা গেল। এখানে স্বদেশী কোম্পানীর টাকা আত্মসাৎ করার ঘটনা উঠে এলো চন্দ্র চ্যাটার্জি চরিত্র কে কেন্দ্র করে। এইভাবে এই গল্পের মধ্যে ভূমিকম্পের মাধ্যমে জাতপাতের ব্যবধান কে এক নিমেষে মিলিয়ে দিয়েছেন এবং বুঝিয়ে দিয়েছেন যে এই ব্যবধান আসলে মানুষের মনে এই ভাবেই সমাজের যা কিছু অসংগতি লেখিকা দেখেছেন তাই তার সাহিত্যের পাতায় তুলে ধরেছেন।

গল্পের মাঝে চন্দ্রনাথ চাটুজ্যের স্বদেশী কোম্পানীর অর্থদানের টাকা আত্মসাৎ-এর চিত্র এবং ভূমিকম্পে সব শেষ হওয়ার দৃশ্য দেখা যায়। এইভাবে অসৎ উপায়ে অর্জিত অর্থের বালির বাঁধের মত অবস্থা হয় তা দেখানো হয়েছে। এইরকমই টাকা

আত্মসাৎ -এর ছবি আমরা বামাবোধিনী পত্রিকার ১৯০৭, অক্টোবর সংখ্যায় দেখেছি। তাই বোঝা যায় লেখিকার রচএর সমাজেরই দলিল। এছাড়া বিপদে জাতপাত নস্যাৎ হওয়ার ঘটনা ফেকুপাঁড়ে ও ইসমাইলের ভূমিকম্পে মৃত্যু দৃশ্যতে স্পষ্ট। সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষ যে কাম্য নয় এই দুই ভিন্ন সম্প্রদায়ের গলাগলি করে মৃত্যু দৃশ্য তারই স্বাক্ষ্য বহন করে।

পরবর্তীতে জাতির ভিত্তিতে শ্রম বিভাজন, ডাকাতি ও ইমানদারের চিত্র পাই 'নিরঞ্জন সর্দার' গল্পে। সেসময় জমিদারী সামলানো ও সম্ভ্রান্ত ঘরে পাহাড়া দেবার জন্য একজন থাকতো যে সর্দার নামে পরিচিত এই সূত্রে লেখিকা যখন বর্ণনা দেন–

" আত্মরক্ষার জন্য মধ্যবিত্ত ও নিম্নশ্রেণীর লোকেরা শারীরিক শক্তিচর্চা করাটা সম্ভ্রমের চোখে দেখিত। লাঠি ও তরবারি চালনার কৌশল শ্রদ্ধার সহিত শিখিত। ধনীগণ ছিলেন অলস প্রকৃতির। কিন্তু শারীরিক পরিশ্রমের মর্যাদা তাঁহারা বুঝিতেন। তবে স্বহস্তে লাঠি ধরাটা অপমানের বিষয় মনে করিতেন। অতএব তাঁহারা আত্মরক্ষা ও ধনসম্পত্তি রক্ষার জন্য, পয়সা খরচ করিয়া লাঠিয়াল পুষিতেন।" ২৭

এই উক্তিতে শ্রম বিভাজনের চিত্র স্পষ্ট। গল্পে নিরঞ্জন সর্দার একজন চরিত্র যে প্রভুর বাড়িতে লাঠিয়ালের কাজ করে জরুরী অবস্থা ছাড়া সে বাড়ি যায় না। একদিন হঠাৎ মায়ের অসুস্থতা জানিয়ে চিঠি আসে প্রভু চিঠি পেয়েই তাড়াতাড়ি যাবার ব্যাবস্থা করে দেন। নিরঞ্জনও দ্রুত বের হয়। তবে পথে বাধা দামোদরের স্রোত তা আতিক্রম করে বাড়ি পৌঁছায়। গিয়ে যখন সবাই ঠিক আছে দেখে কোনোক্রমে একটু তাল ও চালের গুঁড়ো মেখে খেয়ে বেরিয়ে যায়। আবার সেইপথ অতিদ্রুত অতিক্রম করে যখন প্রভুর বাড়ির কাছে তখন ডাকাতদল লুঠ করছে প্রভুর আর্তনাদ শুনে সে এসেছি বলে বীরবিক্রমে লড়ে। অবশেষে সে জানতো যে দলের মাথা সে বাইরে থেকে নির্দেশ দেয় আর কম শিক্ষিতরা ভিতরে লুঠ করে হিসাবমত তাই দেখা গেল বাইরে থেকে কেও সাংকেতিকভাষায় বলে-

"মাছি পড়েছে জাল গুটো ।" ২৮

এরপর নিরঞ্জন তাদের পরাজিত করে প্রচণ্ড হুঙ্কারে বাইরে যেতে বলে। এভাবেই সেদিন প্রভুর প্রানবাঁচিয়ে ইমানদারির পরিচয় দিয়েছিল নিরঞ্জন সর্দার। এই একইরকম ইমানদারির প্রসঙ্গ আছে 'ইমানদার' উপন্যাসে।

এরপর 'সেখ আন্দু' (১৯১৭) উপন্যাসটি যদি দেখি এখানে আমরা হিন্দু মুসলমান এর মধ্যে একটা সুন্দর সম্পর্ক এবং তখনকার সময়ের প্রেক্ষিতে হিন্দু মুসলমান প্রেম দেখিয়ে লেখিকা সাহসের পরিচয় দিয়েছেন। এছাড়াও আন্দু চরিত্রের দয়া, স্নেহ, পরোপকারী মনোভাব, দায়িত্, সততা, ত্যাগ এবং তার বিভিন্ন বিষয়ে পারদর্শিতার চিত্র আমরা দেখতে পাব। ভন্ড জ্যোতিষীর চিত্র এখানে দেখা যায় এবং সেখানে আন্দুর চরিত্রের যুক্তিময়তা লক্ষ্য করা যায়। এছাড়াও সমাজে পুলিশি শাসন ব্যবস্থার রূপটা কিরকম সেটাও আমরা দেখতে পাব এই উপন্যাসটি বিশ্লেষণের মাধ্যমে। রচনার প্রথমেই আন্দুর ছোটবেলার দিকটা একটু বিবরণ দেওয়ার চেষ্টা করব। ভাগলপুরে একটা দর্জির দোকান ছিল আন্দুর পিতার শৈশবে মা মারা যাবার পর বাবা আর বিয়ে করেনি। স্কুলে পড়াশোনা করেছে আন্দু। আরবি ভাষা শিখেছে এক অভিজ্ঞ ব্যক্তির কাছে, আগ্রায় একজন বিশিষ্ট ব্যক্তির কাছে শিখেছে চিত্রবিদ্যা। এই চিত্রবিদ্যা শেখাকালীন তাঁর কাজ দেখে ভবিষ্যতে তাকে মস্ত নামজাদা হওয়ার কথা জানিয়েছিলেন চিত্রশিক্ষক। এই নামজাদা হওয়ার কথা শোনার পর থেকেই চিত্রবিদ্যার প্রতি আন্দুর আগ্রহ নষ্ট হয়। তারপর একদিন পিতা তীর্থে চলে গেলে তাকে দোকান সামলাতে দিয়ে যায় কিন্তু আন্দুর মধ্যে ছিল কুস্তি করার ঝোঁক, পাশাপাশি জেগে ছিল মোটর গাড়ি চালানোর শখ তবে তা পূর্ণ হয়েছিল। তীর্থ থেকে ফিরে বাবার শরীর খারাপ হয় এবং বাবা শেষ পর্যন্ত মারা যান, এই অবস্থায় প্রথমে দোকান বেচে ধার শোধ করে তারপর কলকাতায় মোটরগাড়ির শিক্ষা নেয় এবং চাকরিও

পায়। পরে ভাগলপুরে চৌধুরী সাহেব গাড়ি কিনেছে শুনে কলকাতার চাকরি ছেড়ে চৌধুরীবাবুর কাছে গাড়ির চালক হিসাবে কাজ নেয়। তখন থেকেই এই চৌধুরী সাহেবের বাড়ির মোটর গাড়ির চালক আন্দু। এইভাবে চাকর বাকর পরিবৃত্ত এই বাবুর মহলে আন্দুর একটা আনাগোনা ছিল তার সেলাইয়ের কাজের জন্য। তারপর বাবুর বাড়ির অস্ত্রচালক আকবর, রহিম, হরিহর, গুরুদয়াল এদের নিয়েই আন্দুর সময় কেটে যেত। অত্যন্ত কর্তব্যবাণ যুবক আন্দু পরোপকারী, দয়ালু, সাহসী, দৃঢ়চেতা, সৎ। এইসমস্ত গুণ গুলোই আমরা উপন্যাসের পরতে পরতে দেখতে পাব। ছোট্ট বাচ্চাদের সঙ্গে খুনসুটি থেকে শুরু করে বয়স্ক মানুষরাও তাকে অত্যন্ত ভালবাসত। এরকম ভাবেই বাড়ির মালিকের ছোট মেয়ে খুকুমণি তাকে শখ করে তার সেলাই মেশিনটা একবার চেয়েছিল, তাকে দেবে বলেও জানায় আন্দু। তাছাড়া গাড়ির প্রয়োজন হলে তো তার ডাক রয়েইছে। এমনি করে বাড়ির অন্দরমহলে তার যাতায়াত এবং সবার সাথে মিশে যাওয়ার দৃশ্য আমরা দেখতে পাই। এভাবেই তার চরিত্রের দায়িত্ব কর্তব্যের ছবি আমরা দেখব এ প্রসঙ্গে প্রথমেই সাহেবের ভাতুষ্পুত্র কিরণচন্দ্র যখন ঘোড়ার টহল হয়েছে কিনা জানতে আসে আকবরের কাছে, তখন সে না বলে জানালে তার সঙ্গে বচসা শুরু হয় কিরণ চন্দ্রের। আকবর কিরণচন্দ্রকে মানুষ করেছে তার কাছ থেকে এই ব্যবহারে সে বড়ই দুঃখিত। এইরকম একটা সময়ে এসে আন্দুই ঘোড়া খুলে বের হয়ে যায় টহল দিতে, যার ফলে ওই দিনের মতো ঝামেলার পরিস্থিতি ওখানেই থেমে যায়। এছাড়াও তার লোকেদের অসুস্থতার কথা জানা আর খোঁজ নেওয়া পাড়ায় পাড়ায় ঘুরে তাদের নানা রকম সাহায্য করা এই সমস্ত প্রসঙ্গ দেখা যায়। এইভাবে এক এক করে আন্দুর নানান বিষয়ে পারদর্শিতা দেখে এবং শুনে সাহেবের মেয়ে লতিকা ক্রমশ অনুরাগী হয়ে পড়ে আন্দুর উপর। এরপর চৌধুরী সাহেবদের বাড়িতে জ্যোৎস্না আসে সে এক দিকে লতিকার বান্ধবী

অন্যদিকে সাহেবের বন্ধুর মেয়ে। জ্যোৎস্না বিবাহিতা এবং তার স্বামী আমেরিকায় ইঞ্জিনিয়ারিং শিখতে গেছে। কলেজে জ্যোৎস্না ও লতিকা একসাথে পড়াশোনা করলেও লতিকাদের বাড়িতে এসে জ্যোৎস্না যখন তার অন্যান্য সদস্যদের সঙ্গে ভালোভাবে মিশে যাচ্ছিল লতিকা সেটাকে মেনে নিতে পারছিল না। ধীরে ধীরে জ্যোৎস্নার সঙ্গে সে অন্যরকম ব্যবহার করতে লাগলো তাতে জ্যোৎস্নার খারাপ লেগেছিল। তারপর শহরে বাবা গাড়ি নিয়ে যাবে শুনলে জ্বর হয়েছে বলে মিথ্যা নাটক করে, যেটা জ্যোৎস্না জ্বর মাপতে গিয়ে সত্যি কথা বলে দিলে তখনও জ্যোৎস্না কে সে দেখতে পারেনি। এরকম ভাবেই লতিকা ছোট ছোট ভাই-বোনদের ওপর তার খিটখিটে ব্যবহারের প্রকাশ দেখায়, অন্যদিকে জ্যোৎস্না ওই ভাই-বোনদের সঙ্গে বেশ ভাব জমায় এবং আন্দুর নানা রকম গল্প শোনে। এবারে আন্দুর প্রসঙ্গে যদি কিছু কথা যদি বলা যায় সে প্রসঙ্গে প্রথমেই আসে ভবতারণ চাটুজ্যের বাড়িতে গিয়ে তাদের খোঁজ নেওয়ার কথা। ভবতারণের বোনকে মা বলে ডাকতো আন্দু আর ভবতারণকে শ্বশুর বলে ডাকত ভবতারণ আন্দুকে জামাই বলে ডাকতো, এইরকমই একটা খুনসুটির পরিবেশ ছিল তাদের সম্পর্কে। বন্ধুর বিয়ে হবার খবর শোনালে স্ত্রীর সঙ্গে পরিচয় হবার পর আন্দু আশীর্বাদ স্বরূপ যখন বলে-

"ছেলে মানুষের ছেলে! সে আশীর্বাদ নয় অভিশাপ!- আমি ভগবানের নামে প্রার্থনা করছি; নিজেরা আগে 'মানুষ' হোন,- ছেলেকে আগে 'মানুষ' করবার ক্ষমতা হোক, তারপর যেন হয়, আরো বছর পাঁচ-ছয় পরে।" ২৯

তখনই আন্দুর বাস্তববোধ ও উন্নত রুচির পরিচয় মেলে। এরপর পল্টনের কাজ নেবে সে এই কথা জানিয়ে বেরোবে ভাবে এমন সময় আরো একটি কথা ভবতারণ চ্যাটার্জিকে আন্দু জানায় আখড়ার উনিশ বছর বয়সী লছমি ভকত শম্ভু মাড়োয়ারির প্ররোচনায় বখে যাচ্ছিল। তবে একদিন আন্দুকে ঘোড়ার গাড়ি থেকে একটা ছাগ শিশুকে রাস্তা থেকে

সরিয়ে মায়ের কাছে পৌঁছে দেওয়ার দৃশ্য দেখে লছমী ভকতের মধ্যে পরিবর্তন হয়, সে আন্দুকে মামার বাড়ি চলে যাবে বলে কথা দেয়। এই সমস্ত চক্রে সে আর থাকবে না বলে জানিয়েছে। তারপর ভবতারণ চ্যাটার্জি আন্দুর জীবনের লক্ষ্য জানতে চাইলে সে জানায়-

"আমার জীবনের লক্ষ্য?- সকলের সঙ্গে আমার জীবন জড়িয়ে রয়েছে, সকলের শুভ ভিন্ন আমার শুভ নাই, এই মোটা ধারণাটা মনের মধ্যে পুষে ভগবানের নাম নিয়ে সকল চেষ্টায় হাত দেবো, তারপর ঈশ্বরের ইচ্ছা!" ৩০

এই কথায় তার পরোপকারী দয়াবান হৃদয় স্পষ্ট হয়ে ওঠে। এছাড়াও আখড়ার আরও একজন বাসিন্দা পিয়ারী সাহেব বলে একজন সে তার চাকরির উমেদার কারণ তার মা স্ত্রী ও ছেলেপুলে আছে তার একটি কাজের দরকার তাই আন্দু নিজে তার মনিবের দেওয়া কাজ ছেড়ে দিতে চায় এমনকি মালিক না বললে সে নিজে খসে যেতে চায় এই রকম ভাবেই এক এক কথাবার্তায় তার দয়া পরায়ণ হৃদয়ের প্রকাশ আমরা বারবার দেখতে পেয়েছি। এইরকম কথাবার্তা আলাপ আলোচনার পর ভবতরণ চ্যাটার্জির বাড়ি থেকে আন্দু বেরিয়ে যায়। তবে এইখানে একটু বলে নেওয়া যাক তার পল্টনে যাওয়ার ইতিবৃত্তটা একদিন রাস্তায় হাঁটতে হাঁটতে হঠাৎ একজন ব্যক্তি এসে তার হাত ধরে টান দেয়, কি কারনে করে সে সেই মুহূর্তে কিছুই বুঝে উঠতে পারে না অনেকবার জানতে চায় কেন করছেন উত্তর না পেয়ে এক ঘুষিতে একদম সেই ব্যক্তিকে ফেলে দেয়। এই সময় আখড়ার ওস্তাদ ও তার অনুচর শীতল চাঁদ এসে জানায় যে ওই ব্যক্তি শিখ ভাই হরকিষণ সিং বাহাদুর, তিনি নাকি আন্দুর শক্তির পরীক্ষা নিচ্ছিলেন এরপর ওই ব্যক্তির সাথে আন্দুর কথাবার্তা হয় এবং তার মনের ইচ্ছে তাকে প্রকাশ করে। অনেক দিনের ইচ্ছে

লড়াইয়ে যাওয়ার সেটা তার কাছে প্রকাশ করেন তবে এই প্রকাশ করার কথা শুনে ওস্তাদ কথাটাকে ঘুরিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করে তবুও আন্দু ওই ব্যক্তিকে জানায়-

"আমি লড়াইয়ে যেতে চাই শুধু লড়াইয়ের জন্যে !" ৩১

এ কথা শুনে হর কিষন সিং তার পীঠ চাপড়ে সাবাস বলে। এরপর ওই ব্যক্তি আন্দুকে তার সঙ্গে ‘পনের মিনুট বি’ খেলার প্রস্তাব দেয় তবে আন্দু খেলবে কি খেলবে না তার উত্তর সে দেয় না কেবল হাসে। অবশেষে এই কথা গ্রামে রটে যায় যে আন্দু খেলছে যার ফলে সাধারণ গ্রামবাসীদের মধ্যে খেলা দেখার একটা উত্তেজনা তৈরি হয় সবাই প্রস্তুত হতে থাকে খেলা দেখার জন্য। এমনকি লতিকার ভাই পরিমল সেও এ খেলা দেখার জন্য বাবাকে আবদার করে তাকে খেলার মাঠে নিয়ে যাবার জন্য। এদিকে ঘরে জ্যোৎস্না সরসীর থেকে আন্দুর প্রশংসা শুনছিল, সরসীর ডলি পুতুলকে বেবি কুকুর একবার জলে ফেলে দিলে আন্দু কিভাবে সাঁতার কেটে পুতুলটিকে উদ্ধার করে এনেছিল সে গল্প জ্যোৎস্না কে বলে। এইভাবে এর আগে লতিকার ব্যবহার থেকে যতটা মন খারাপ হয়েছিল তা ধীরে ধীরে সরসীর সঙ্গে গল্প করে কেটে যায়। এই কথা বলার সময় লতিকা গায়ে চাদর মুড়ি দিয়ে হন্তদন্ত হয়ে ঘরে ঢোকে এ ঘটনা দেখে জোৎস্না একটু আশ্চর্য হলেও কিছু জিজ্ঞাসা না করে ঘর থেকে বেরিয়ে যায়। লতিকা যেন স্বস্তি পায়, তবে জ্যোৎস্না এই ঘটনায় একটু মনে মনে আঘাত পায়। তবে ঘর থেকে বাইরে বেরিয়ে এসে দাঁড়ায় তখন দূর থেকে সেলাই ঘরে কেউ একজন নড়াচড়া করে এবং আগুন জ্বালায় পরে একটু ভালো করে দেখতে বুঝতে পারে ওটা আন্দু কোন একটা কাগজ পোড়াচ্ছে। এই ঘটনা জ্যোৎস্না দেখে সেদিন। সেদিনই লতিকা একটি চিঠি আন্দুকে দিয়েছিল সে চিঠিতে তাকে বিয়ে করার ইচ্ছা প্রকাশ করেছিল লতিকা। সে চিঠি পাঠ করে আন্দুর মন বড়ই অস্থির

হয়ে ওঠে সে নিজেকে খুব ছোট মনে করতে থাকে এবং তার মনে গোটা ব্রহ্মাণ্ড ধিক্কারে পূর্ণ হয়ে যায় এক লহমায়। এই চিঠি জ্যোৎস্না সেদিন দূর থেকে পড়তে দেখেছিল।

ওই রাতেই আন্দুর আর ঘুম আসেনা সে ঠাকুরজীর কাছে দোয়াত কলম আনতে যায় সেখানে গিয়ে ঠাকুরজীর ঘটনা শোনে। জানতে পারে ঠাকুরজীর একটা ভাই মারা যাবার পর তার ভাইঝির যাবতীয় দায়িত্ব তাকে নিতে হয় সেই ভাইজি এখন বিবাহযোগ্যা। তার বিয়ের জন্য প্রয়োজনীয় টাকা সে জোগাড় করতে পারছে না এটা শোনা মাত্রই আন্দু তার মনিবের কাছে জমা রাখা টাকা তাকে দিতে রাজি হয় প্রথমে সে নিতে কিন্তু বোধ করলেও আন্দু যখন তাকে বলে তুমি তিন বছর সময় নাও ধীরে ধীরে আমাকে দিয়ে দিও। তখন একটু স্বস্তি বোধ করে ঠাকুরজী এবং আন্দুকে অনেক ধন্যবাদ দেয়। তবে আন্দু আরো জানায় যে তুমি ধীরে ধীরে টাকা জোগাড় কর আর যদি কখনো আমি তোমার দুয়ারে না আসি তাহলে ও টাকা না দিতেও পারো। এখানেও আন্দুর মহৎ হৃদয়ের পরিচয় পাওয়া যায়। ঠাকুরজীর কাছ থেকে ফিরে মাহিনা বাবদ ১৬৫ টাকা ঠাকুরজীকে দেবার কথা লিখে, ব্যবসায়ী বন্ধু পিয়ারী সাহেবকে তার জায়গায় নিয়োগের কথা লিখে, সেলাইয়ের কলটা খুকুমণিকে দেবার কথা জানিয়ে, ধনুকধারী দুবের এর চারটি জামা ফেরত দেওয়ার কথা লিখে, না বলে চলে যাওয়ার জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করে একটা চিঠি সাহেবের উদ্দেশ্যে রেখে যায় এবং আপন খেয়ালে পথে বেড়িয়ে যায়।

এরপর রাত্রি আড়াইটা নাগাদ তার এই স্মৃতি বিজারিত স্থান ত্যাগ করে সে অনেক কষ্টে বেরিয়ে পড়ে সঙ্গে ছিল কুড়ি টাকা স্টেশনে যখন পৌঁছালো তখন ভোর। তবে একটা মানিব্যাগ কুড়িয়ে পেল। কিন্তু সেই কুড়িয়ে পাওয়া মানিব্যাগটি সে কৌশল করে জিজ্ঞাসাবাদ এর মাধ্যমে একজন ইংরেজ মহিলা ও তার তরুণী কন্যার হাতে ফেরত

দেয়। আন্দুর এই সৎ ব্যবহারে তাকে কিছু টাকা দিতে তারা প্রস্তুত ছিল কিন্তু আন্দু তা নিতে রাজি নয় তবে তার পরিচয় পরে জানতে চায় এবং তারা টুন্ডুলা স্টেশন যেতে চায় সেখানে তাকে যেতে বলে তারা সেখান থেকে চলে যায়।

আন্দু দিল্লিগামী ট্রেনে ওঠে সেখানে অনেককে সাহায্য করে অবশেষে সে নিজে ওঠে। ট্রেনে ওঠার আগে একজন ব্যক্তির বই প্ল্যাটফর্মে নীচে পড়ে যায় আন্দুই কুড়িয়ে দেয়, এরকম নানা রকম সাহায্যের পর ট্রেনে গিয়ে যখন বসল তখন একজন লাটুদার পাগড়ি মাথায় গোঁফদাড়ি কামানো এক পন্ডিত গোছের হিন্দুস্থানী মধ্যবয়স্ক ব্যক্তি ঊষার আলোকে হাত দেখছে সবার। আন্দু এগিয়ে যায় তার হাত দেখানোর জন্য, তাকে দেখে বলে শীঘ্রই পত্নী বিয়োগ হবে কিন্তু আন্দু জানায় তার বিয়ে হয়নি একথা শুনে কেউ বিশ্বাসই করে না তারপর জানায় তার অর্থাগম হবে কিন্তু রাখতে পারবে না, এভাবে ঐ ব্যক্তির সমস্ত কথা আন্দু অস্বীকার করলে লোকটি ভাবে ব্যঙ্গ করছে, পরে আন্দু ধর্ম যোগ জানতে চাইলে লোকটি জানায়-

"ধনই তো ধর্ম!"। ৩২

তখন আন্দু বলে-

"ঠাকুরজী, ধনতো বাহ্যিক সম্পদ, তার সঙ্গে ধর্মের সম্পর্ক কি? ধর্ম যে আধ্যাত্মিক ব্যাপার।" ৩৩

এসব কথা গণক ঠাকুরের মাথায় ঢুকলো না। সে জানালো ধন দ্বারাই দান ধ্যান সব সম্ভব হয় তখন আন্দু আবার জানায়-

"ওই একটি কাজ দান- কিন্তু ধনের দ্বারা তো ধ্যান চলবে না ঠাকুরজি- ধ্যান যে মনের সম্পত্তি!" ৩৪

এরপর গনক রেগে গিয়ে তাকে ম্লেচ্ছ বলে এবং হিন্দু শাস্ত্রে ধনই ধর্মের মূল বললে তখনই আরেক বৃদ্ধ কথাটির তীব্র প্রতিবাদ জানায় এবং যুক্তি দিয়ে বোঝায় যার ফলে তখন গণক ঠাকুরকে সবাই মিথ্যেবাদী হিসেবে দেখলো এবং ছি ছি করল। ছি ছি করাটা দেখে দাদাজি আন্দুকে বলে-

"লঘুচেতা লোকের প্রকৃতিই এই-যতক্ষণ সেটাকে সত্য বলিয়া জানে, ততক্ষণ সেটা অন্ধভাবে আকরাইয়া থাকে, কিন্তু যে মুহূর্তে সেটা মিথ্যা বলিয়া প্রতিপন্ন হয়, সেই মুহূর্তে তাহার উপর নির্মম খড়্গহস্ত হইয়া উঠিতে কিছু মাত্র দ্বিধা বোধ করে না।" ৩৫

এরপর ওই বৃদ্ধের সঙ্গে আন্দুর আলাপ হয়, কথাবার্তা হয় জানতে পারে ওই ভদ্রলোক সেকেন্দ্রাবাদ যাবে তবে দোলের উদ্দেশ্যে পুরি গিয়েছিল। আন্দু তাকে দাদাজি বলে সম্বোধন করে এবং সে তার গন্তব্য ঠিক করে দিল্লির পরিবর্তে সেকেন্দ্রাবাদে। এভাবে নানান লোকদের সঙ্গে আন্দু ভাব জমিয়ে ফেলে সেকেন্দ্রাবাদে। এখানে এক বাচ্চার কিসমিস কুড়িয়ে দিয়ে তাকে শান্ত করে আবার অন্য এক বাচ্চাকে বই কিনে দিয়ে শান্ত করে এইভাবে নানান ভালো ভালো কাজ কর্মের মধ্য দিয়ে সে সকলের মন জয় করে নেয় এবং এখানে রাজমিস্ত্রির কাজ করতে থাকে। এরকম ভাবে চলতে চলতে একদিন কয়েকজন ব্যক্তি নারকেল পারতে না পারলে আন্দু নারকেল গাছে উঠে নারকেল পেরে দেয়, এমন সময় সাহেবের ঘোড়া এসে বেসামাল হয়ে যায় তখনই নারকেল গাছ থেকে লাফ দিয়ে ঘোড়ার পিঠে বসে রশ্মি ধরে ঘোড়াকে বশে এনে সাহেবের প্রাণ বাঁচায়। তারপরে তাকে পুলিশ স্টেশনে যেতে বলে সেই সাহেব কথা বলার জন্য। পুলিশ তাকে যেতে বলায় অনেকে ভাবে সে নাকি পুলিশের মন জয় করার জন্য এ সমস্ত কাজ করেছে এরকম নানা কথাবার্তা হয়। সেসব কথা কান না দিয়ে সে পুলিশ স্টেশনে দেখা করে এবং পুলিশের জমাদারের কাজ পায়। তবে এমন দিনেই দাদাজি তার বন্ধুর মাধ্যমে

আন্দুর জন্য যে কাজের ব্যবস্থা করছিল সেই কাজেরও খোঁজ এলো তবে আন্দুর সে কাজ না করে দিলে দাদাজি তাকে পুলিশের লাইনের লোকের স্বভাব ভালো হয় না বলে জানালে তখন আন্দু বলে-

" আমি যে নিজে পাথর।" ৩৬

এদিন দাদাজি পিছুটান রাখার কথা বলে এবং সেই উদ্দেশ্যে বিয়ের উল্লেখ করে কারণ সাদা জিনিস এ তাড়াতাড়ি কাদা লেগে যায় এটা সেদিন আন্দুকে দাদু বলেছিল। সেদিন দাদাজির কথা আন্দু খুব একটা গুরুত্ব দেয়নি। এরই মধ্যে মুসলমান পাড়ায় মিস্ত্রি মোহাম্মদ তার বন্ধু ছিল এখানে কুস্তির আড্ডায় সাব ইন্সপেক্টর মহিমা রঞ্জন বাবু আসতেন আন্দুকে তিনি স্নেহ করতেন তাই তাকে বলেছিলেন-

" দেশের দুর্বৃত্ত দলনের ভার যাহাদের হাতে ন্যস্ত, তাহাদের সকলের পক্ষেই খুব সুবৃত্তি পরিচালিত উন্নত নির্মল চরিত্র ব্যক্তি হওয়া উচিত একথা শাসনতন্ত্রের উপদেশ বিধানের পৃষ্ঠায় যত বড় জোর কলমেই লেখা থাক, কিন্তু কার্যক্ষেত্রে ইহার সার্থকতা খুঁজিয়া পাওয়া বড়ই কঠিন।" ৩৭

এখানে এই কথাতে সমাজে পুলিশী শাসন ব্যবস্থার ছবিটা ধরা পড়ল। যাইহোক এই কথা এবং তার দাদাজীর বলা কথা সেটা নিজের জীবন দিয়ে উপলব্ধি করেছে শিকারগঞ্জে ডিউটির মাধ্যমে। তবে এরই মাঝে শিকারগঞ্জে কাজে যাবার পথে পরিমলের সঙ্গে হঠাৎ দেখা, তার সঙ্গে তার বাড়ি গিয়ে ওঠে সেখানে দেখতে পায় লতিকাকে এবং জ্যোৎস্নাকে। জ্যোৎস্নার স্বামী মারা গেছে এই খবরও জানতে পারে। তারপর জ্যোৎস্নার বাবার মৃত্যুর খবর পেয়ে তারা বাড়ি ফিরছে আন্দু কেউ যাবার জন্য বললে আন্দু কাজ আছে জানিয়ে দেয়। লতিকার একটি মেয়ে হয়েছে দেখে এবং তাকে একটু আদর করে। এতদিনে যেন আন্দু দীর্ঘদিনের অসন্তোষ দূর হল বলে অনুভব করছে। ওই দিনের মতো তাদের বাড়ি

থেকে আন্দু চলে যায়। এরপরই থাকে আন্দুর সেই অনুভূতির দিন শিকারগঞ্জে ডিউটি সেখানে জমিদারের পুত্র গাড়ি নিয়ে বের হয় সেই গাড়িতে রাম লাল তিওয়ারী থাকে, সে সবার উপর সপাটে চাবুক মারতে থাকে। এর বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করে আন্দু। যার ফলস্বরূপ কোন দোষ না করেও তাকে বড়বাবুর কাছে অপমানিত বোধ হতে হয়েছে। তখনই বারবার করে দাদাজীর কথা তার মনে হয়েছিল এবং চাকরি থেকে সে নিজেই ইস্তফা দিয়েছে।

এরপর চিত্রবিদ্যায় সে যোগদান করল এক পথিকের কাছে, ওই পথিক রমানাথ রায়ের পরিচয় জানতে চাইছিল আন্দুর কাছ থেকে। পথিক শ্যামাদাস ঘোষ তিনি এক রাত্রি আন্দুর কাছে কাটায় এবং তাকে চিত্রবিদ্যা শিক্ষা দেয় এবং জানান কন্ট্রাক্টর রমানাথ বাবুর অধীনে তিনি কাজ করতে এসেছেন। পরে আন্দু জানতে পারে দাদাজির সঙ্গে রমানাথ বাবুর খুবই ঘনিষ্ঠ পরিচয় আছে তাই সেই সূত্রে আন্দু পুলিশের কাজ ছেড়ে দিয়ে কন্ট্রাক্টর এর অধীনে কাজ করতে শুরু করেছিল। তখনই রতু বলে একজন বাচ্চার সাথে তার পরিচয় হয়। পরে জানা যায় এই রতুই হচ্ছে জ্যোৎস্নার ভাই। আরো জানতে পারে লতিকারা তার বাবার বন্ধুর আত্মীয়। তবে এখানে আবারো জ্যোৎস্নার সঙ্গে দেখা হয়ে যায় এবারে দেখা হওয়াটা একটু অন্যরকম এর আগে কখনো আন্দু জ্যোৎস্নাকে দেখে এরকম অনুভব করেনি এবারে যেন একটু বিচলিত হতে দেখা গেল আন্দুকে। আজ কেবল আন্দুর মনে হচ্ছে-

" এতদিন সে ক্রমাগতই সার্থকতা ও সন্তোষ দেখিয়া আসিয়াছে তাহা নিরর্থক, নিতান্তই ব্যর্থ! তাহার সমস্ত জীবন ব্যাপিয়া শুধু অসম্পূর্ণতা ও অসীম অনর্থের শূন্যগর্ভ উপঢৌকন সঞ্চিত রহিয়াছে !" ৩৮

এভাবে সে আবেশে এতটা মত্ত হয়ে যায় যে বন্ধু মুহাম্মদের ছেলের জাতকর্ম উপলক্ষে নিমন্ত্রণে গিয়েও শান্তি পাচ্ছিল না, এমন অস্থিরতা এর আগে কখনো আন্দুর মনে জাগেনি। এই দিনই দাদাজি তার খোঁজ করতে করতে মোহাম্মদের বাড়ি এসে রমানাথ বাবুর অসুস্থতার কথা জানায় এবং তার সেবা করার জন্য আন্দুকে যেতে বলায় আন্দু আবারো জ্যোৎস্নাদের বাড়ি আসে তার বাবার চিকিৎসার জন্য এরই মধ্যে রমানাথবাবু মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়ে তার সৎকার করে, কাউকে না জানিয়ে আবার নিরুদ্দেশের পথে পাড়ি দেয়। এবারে জাহাজে খালাসির কাজ করে আড়াই বছর। এরই মধ্যে শারীরিক অসুস্থতার কারণে তার স্বাস্থ্য পরীক্ষা করে তাকে এ কাজ থেকে বাতিল করে অবসর দেওয়া হয় তখন সে আবার ভারত বর্ষ ফেরে দেশের কিনারায় এসে দুই ভিক্ষুককে দেখে জানতে পারে তারা মক্কা যাবার জন্য টাকা যোগাড় করছে। আন্দু এখানেও তার সঞ্চিত অর্থ তাদেরকে দিয়ে দেয়। এরকম ভাবে বার বার পরোপকারী আন্দুকে আমরা পেয়েছি পুরো রচনায়। এই দান করে দেওয়ার মুহূর্তেই দূর থেকে এক বৃদ্ধের কন্ঠ শুনতে পায় আন্দু, চিনতে পারে, এ কন্ঠ তার পূর্ব পরিচিত চোখ ফিরিয়ে দেখে এ দাদাজী তখনই দাদাজীকে জড়িয়ে ধরে কান্নায় ভেঙে পড়ে। দাদাজীর কাছে রতু ও জ্যোৎস্নার কথা জানতে চাইলে দাদাজী সমস্তটা জানায় সংক্ষেপে, দ্বারকা যাবে একথা দাদাজী জানালে সঙ্গে আন্দুও যেতে চায়। তারপর জ্যোৎস্নার সঙ্গে কথা বলে কেমন আছে জানতে চাইলে আন্দুকে দেখে জ্যোৎস্না চমকে যায়, তার হাত থেকে আলো পড়ে যায় আন্দু তা তুলে দেয়। তারপর জ্যোৎস্না আন্দুকে কোথায় যাবে জানতে চাইলে আন্দু দ্বারকা যেতে চায় এটা জানায় তখনই জ্যোৎস্না তাকে নিষেধ করে না যাওয়ার জন্য, তবে নিষেধের কারণ আন্দু জানতে চাইনি। বরং জ্যোৎস্নাই তাকে বলেছিল-

" তোমাকে ভয় নয়, তুমি মহৎ, তুমি পবিত্র! তোমার নিঃশব্দ ধৈর্য আর নীরব আত্মত্যাগ বড় কঠিন, বড় ভয়ানক! তাতেই মনকে মুগ্ধ করে, ভীত করে, তোমার পায়ে পড়ি,- তুমি ফিরে যাও-" ৩৯

আন্দু এরকম কথা শুনে নির্বাক হয়ে যায়। পরে জানায়-

"ভগবানের উপর সত্যকার মঙ্গল নির্ভরে প্রতিষ্ঠিত হোক, ঈশ্বর আপনাকে শান্তি দিন। আসি তবে। সেলাম।" ৪০

আন্দু দ্রুতপদে এগিয়ে গেলে জ্যোৎস্না বলে-

"আমার দুর্বলতা ক্ষমা কর, তোমার অতুলনীয় নিষ্ঠার গভীর মহত্ব অনুভবের শক্তি আমার নাই, আমায় ক্ষমা কর !" ৪১

সবশেষে দাদাজীকে আলিঙ্গন করে আন্দু জানায়-

" জীবনের কর্তব্য গুলো সবই ব্যর্থ হয়ে গেছে দাদাজী, এবার মরণের অবলম্বনে নিজেকে নিশ্চিন্ত শান্তিতে সার্থক করে তুলবো, আপনি আশীর্বাদ করুন।" ৪২

এরকমই চরম আক্ষেপ ও ত্যাগের মধ্য দিয়েই উপন্যাসটি শেষ হতে দেখা গেছে। এভাবে লেখিকা উপন্যাসে হিন্দু মুসলমানের প্রেমকে দেখালেও সমাজকে একেবারে উপেক্ষা করতে পারেনি। তাই তো আন্দু ও জোৎস্নার প্রেমের পরিণতি নেই, ত্যাগেই মহান। এইরকম ভাবে সর্ব কাজে পারদর্শী আন্দু চরিত্রের নানান দিক আমরা দেখতে পাই পাশাপাশি জ্যোতিষী চরিত্রের ভুল গণনা, সমাজে পুলিশী শাসন ব্যবস্থার স্বরূপ সাহসের সঙ্গে তুলে ধরেছেন লেখিকা যা অত্যন্ত হৃদয়গ্রাহী।

এরকম আরও একটি গল্প যেখানে সমাজে পুলিশি শাসনের প্রসঙ্গ আছে সেটি হল ‘কোন রোগ’। শুরুতেই বিয়েবাড়িতে আসা কয়েকজন এদেশী ও বিদেশী পুলিশের কার্যপদ্ধতি নিয়ে আলোচনায় বিদেশীদের শ্রেয় বলে কারণ তারা আইনজ্ঞ ও চিকিৎসায়

অভিজ্ঞ। এই আলোচনার মাঝে বিহারীলাল নামক একযুবক ফোঁস করে এসে কনস্টেবলদের মুর্খামি নিয়ে যখন বলে-

" আর আমাদের দেশের পুলিশের কর্তারা? এঁরা শুধু তিনটি গুণ দেখে- যতরাজ্যের গুণ্ডাকে পুলিশের কনস্টেবলীতে ঢোকান। একটি গুণ, সে মনুষ্যত্বহীন "পাহাড়ে" বজ্জাত কিনা? দ্বিতীয় গুণটি সে সাফাই হাতে ঘুস নিয়ে, উদোর পিণ্ডী বুধোর ঘাড়ে চাপাতে জানেন কিনা? তিন দফার গুণ সে বিনা প্রমাণে সন্দেহমাত্রেই নিরপরাধ ভদ্রলোকের ছেলের গলায় হাত দিতে পারে কিনা! এই তিনটি গুণ থাকলেই ব্যস কেল্লা মার দিয়া !।" ৪৩

যুবকের ক্রোধমূলক এই উক্তিতে সমাজ স্পষ্ট। পরে তার ক্রোধের কারন হিসাবে বন্ধুর বাড়িতে রাতে বই আনতে গিয়ে খোট্টা কনস্টেবলের হাতে পড়ে অনেক হেনস্থা ও শ্রীঘরে যেতে যেতে নাজেহাল হয়ে ফিরে আসার কথা শোনা যায়। এইরকমই এক স্নানযাত্রাকে কেন্দ্র করে পুলিশের দ্বারা যাত্রী নিগ্রহের ছবি বামাবোধিনী পত্রিকার ১৯০৮ ফেব্রুয়ারি সংখ্যায় দেখা যায়। তাই বোঝা যায় তাঁর রচনা সমাজেরই প্রতিছবি। এইযে উপলব্ধি যা বর্তমান সময়েও কিছু কিছু ক্ষেত্রে তাৎপর্যবাহী। গল্পশেষে নমাসির থেকে এক ভণ্ড ভৈরবীর মিথ্যা বুলিতে মোহ জাল বিস্তারের ঘটনা ও তার অন্তর্ধানের দৃশ্য দেখা যায়।

সমাজে ধর্মগুরু জাতীয় মানুষের দুর্মতি ও ভণ্ডামির চিত্র লেখিকার কয়েকটি রচনায় দেখা যায়। সমাজের শাসন, বঞ্চনা, অবদমন, আসঙ্গতি যা কিছু চোখে পড়েছে তা তিনি সাহসের সঙ্গে দেখিয়েছেন। শৈলবালা ঘোষজায়ার বাস্তব দৃষ্টি ছিল অত্যন্ত প্রখর তাই সমাজের ধর্মগুরু জাতীয় মানুষের ভণ্ডামিও তাঁর দৃষ্টি এড়ায়নি। তাইতো 'বিভ্রাট' উপন্যাসে (১৯৩৭) যেমন দীক্ষা গুরুর বিষয় টিকে নিশ্ছিদ্রভাবে ব্যাঙ্গ করার সাহস দেখিয়েছেন তেমনি 'কার্যকারণ' গল্পেও ধর্মানুষ্ঠানের কেন্দ্রে যুক্ত মানুষের দুর্মতির চিত্র তিনি সুন্দর ভাবে অঙ্কন করেছেন। এখন এরকম কয়েকটি রচনা আলোচনার মাধ্যমে

অজ্ঞতাহেতু গুরু বিভ্রাট, তার ভয়ঙ্কর পরিণাম ও ধর্মগুরু জাতীয় মানুষের ভণ্ডামির চিত্র দেখে নেওয়ার চেষ্টা করব।

এ প্রসঙ্গে আমাদের প্রথম আলোচ্য 'বিভ্রাট' উপন্যাসটি। রচনার শুরুতেই মঙ্গলা নামক এক ৩০ বছর বয়সী বিধবার জীবনচর্যার পরিচয় আছে। বিধবা হলেও বাবা, মা, ভ্রাতা, ভাতৃবধূ পরিবৃত্ত পরিবারে অত্যন্ত যত্নের সঙ্গেই তার দিনাতিপাত হতে দেখা গেছে। পিতা সংসারের দায়িত্ব পালন করেন। মঙ্গলার কাছে তার পিতা একজন শাস্ত্রজ্ঞ, ভক্তিশীল, মহাতান্ত্রিক ব্যাক্তি। দেখা যায় বাড়িতে ভ্রাতার সন্তান হয়ে বারবার মারা যাওয়া রোধ করতে এক মহাপুরুষ এনে বৌমার স্বস্ত্যয়ন করার দৃশ্য। এই সূত্রে মঙ্গলাকে দেখে তার প্রতি আসক্ত হয় সিদ্ধ বাবা। তাইতো কালবৈশাখী ঝড়ের রাতে নস্যের কৌটা নিতে আসার অছিলায় কাঁটামারী গ্রামের জমিদার বাড়ির তেতলার ঘর মঙ্গলার শয়নকক্ষে উপস্থিত হয় সিদ্ধবাবা। অনুমতি ছাড়া এই প্রবেশ যে তার জীবনের মোড় বিপথে চালিত করবে এ তার ভাবনার অতীত সেদিন। সিদ্ধবাবার প্রতি এই আস্থা তার জীবনে ভয়ঙ্কর পরিণাম ধার্য করবে যা পূর্বে অনুমানও করেনি।

এইভাবে ঝরের রাতে একলা ঘরে সিদ্ধবাবা তার মিথ্যার জাল বিছায়। মঙ্গলাকে সে যোগসাধন নেওয়ার কথা জানায় কারন হিসাবে তার সামনে বিপদ বলে উল্লেখ করে। এমনকি সে অত্যন্ত পুণ্যবতী তাই এই যোগসাধনার যোগ নাকি তার এসেছে এ কথাও জানায়। বিপদ আশঙ্কায় পিতার কাছে যোগসাধনার কথা জানালে তাদের মতে এ শিক্ষা দানের একমাত্র যোগ্য ব্যাক্তি ওই সিদ্ধবাবাই।

এরপর পিতা মঙ্গলার যোগসাধনার সব কিছু প্রস্তুত করে সিদ্ধবাবাকে অগাধ ভরসা করে তার পুত্রকে সঙ্গে নিয়ে কর্মস্থান মেদনীপুরের চন্দ্রকোনায় চলে গেলেন। এরপর

সিদ্ধবাবার যোগসাধন শিক্ষাপর্ব শুরু। এভাবে শিক্ষা দিতে গিয়ে যখনই অশ্লীলতা এসেছে কথাবার্তায় তখনই ভুল যুক্তি এনে বোকা বানিয়েছে মঙ্গলাকে এমনিভাবে মদ্য, মৈথুন এসব বোঝাতে গিয়ে ভারি ভারি শ্লোক আওড়ায়। একাকী এই সাধন করতে হয় এটা জানিয়ে চক্রতত্ত্ব বোঝাতে গিয়ে দেহ স্পর্শ করে মঙ্গলার, আপত্তি জানালে তাকে মেটিয়ার রানিকে যোগসাধন হেতু স্পর্শের কথা জানায় এবং বলেন একমাত্র তাকেই যোগসাধনা দিয়েছেন। এ প্রসঙ্গে মঙ্গলা সংশয়মূলক স্বরে বলেন-

" ব্রহ্মচারী নির্জনে পরস্ত্রীকে স্পর্শ করেছেন, তা কি সম্ভব?" ৪৪

মঙ্গলার এই প্রশ্নচিহ্নের সম্মুখীন হয়ে সিদ্ধবাবা অর্জুনের ব্রহ্মচর্যের প্রসঙ্গ আনে মহাভারত থেকে। এমনকি তার পিতা ও ভ্রাতার সঙ্গে প্রয়োজনবশত যে স্পর্শ তার সঙ্গে সিদ্ধবাবা তার নিজের ব্যাপারটা তুলনা করে নিজেকে বাবার মত ভাবতে বলে মঙ্গলাকে। এছাড়াও উপবাসের পর খাবার প্রসঙ্গে তাকে শাসন করে যখন বলে-

"দেহ কি তোমার? দেহ তো গুরুর! দেহকে ক্লেশ দেবার কোনো অধিকার তোমার নাই। ধর্ম সুখের জন্য, দুঃখের জন্য নয়। দেহ মনের যা দাবি-যা প্রয়োজন, তা মিটিয়ে দিতে হবে। মনকে পরিতৃপ্ত করতে হবে। তবে মন সাধনায় তোমার সহায় হবে।" ৪৫

একথা যতই শ্রুতিমধুর হোক অর্থ কিন্তু মঙ্গলময় নয় যার বৈধতা-অবৈধতা বিচার এর আবশ্যকতা মঙ্গলা জানতেন না। এভাবেই একেরপর এক উক্তি ও মিথ্যা যুক্তির আশ্রয়ে মঙ্গলার বিশ্বাস অর্জন করলেন সিদ্ধবাবা।

এভাবে যোগসাধনার পর একদিন মঙ্গলা হঠাৎ অসুস্থ হয়ে পড়ায় দেবতার হাওয়া লাগা, বায়ুরোগ, ডাইনের নজর ইত্যাদি ভাবা হয়। এসব সিদ্ধবাবা নিশিকান্তর থেকে জেনে মঙ্গলার কাছে যায়, সেখানে গিয়ে গিন্নিমার খুড়ি ও সর্বভৌম মশায়ের বোন

সত্যবতী-র সঙ্গে দেখা। তাদের কাছে মঙ্গলার যোগসঙ্কটের হেতু মূর্ছা যাওয়ার কথা জানিয়ে দিদিমা আর সত্যবতী ছাড়া বাকিদের বেরোতে বলে। এরপর সত্যবতীর পরিচয় জানতে আগ্রহ প্রকাশের পাশাপাশি মঙ্গলার মুখের কাছে মুখ এনে এক তরল পদার্থ দিতে থাকে যেটা মঙ্গলা ওই ঘোরের মধ্যে অস্বস্তিভরে পান করে। সব কিছু দেখে দিদিমা আগে দেখা যোগ সঙ্কট তা এমন নয় বলেন, এমনকি তারা কুঁড়ে বেঁধে থাকতেন মা ছাড়া কারো মুখ দেখতেন না এসব জানালে কথা ঘুরিয়ে সবার যোগসঙ্কটের লক্ষণ এক নয় বলে দাবি করে সিদ্ধবাবা মঙ্গলার প্রতি দরদ বর্ষণ করে বলেন-

"তোমার সমস্ত ভোগ নিজের শরীরে আকর্ষণ করে নিয়ে, তবেই আমার নিষ্কৃতি। গুরুর দায়িত্ব কত, গুরুই জানে।" ৪৬

এটা শোনার পর মঙ্গলার মুগ্ধতা বাড়লেও দিদিমা বিচলিত হন নানান সংশয়ে এবং সিদ্ধবাবাকে শুনিয়ে বলেন-

"গুরু, পুরুত ঠাকুর, দেবতা,-খেয়ালের লীলাখেলায় বিলাসের আসবাব। আস্তাবলে হাতি ঘোড়া পোষার মত। না রাখলে বৈভবের পরিচয় দেয়া যায় না," ৪৭

তারপর দিদিমার সঙ্গে সিদ্ধবাবার ধনী- দরিদ্র নিয়ে তর্ক বাঁধলে সাধু ধনী জন্ম পুণ্যের ফল বলে মানে এমনকি দিদিমার বারবার নানান প্রশ্ন করাতে অসন্তুষ্ট হয়ে জানায়-

" মূর্খ মেয়েগুলো শাস্ত্রের কিজানে, যে তাদের কথায় জবাব দেব?" ৪৮

এই ক্রোধ মূলক উক্তিই অজ্ঞ সাধুর ভণ্ডতাকে প্রকাশ করে। এরপর দিদিমার আর বুঝতে বাকি থাকে না সাধুর ব্যবহার। সঙ্গে সঙ্গে কক্ষ থেকে বের হন দিদিমা। তখন সাধনের নাম করে মঙ্গলা ও সাধু একা। রাত্রিতে পায়চারি করে সব দেখে দরজা বন্ধ করে দেয় সিদ্ধবাবা, পুরো বাড়ির মধ্যে চিন্তিত কেবল মা ও দিদিমা।

এরপর মঙ্গলা ও সাধুর যোগসাধনা আবার শুরু এবং সাধুর ব্যাবহারে মঙ্গলা অসন্তুষ্ট হলে সেই রাতে একাকি কেন সে এসেছিল তাকি মঙ্গলা বোঝেনি যে আজ এমন চমক এটা জানায়। চোখের সামনে হাজারো মিথ্যা যুক্তি হাজির করে মঙ্গলার মনের সীমিত অসন্তুষ্টি দূর করে দেন এবং কারণের বোতল থেকে নিজে খায় ও মঙ্গলাকে খাওয়ায় এমনকি এই অবস্থায় প্রতিজ্ঞা করিয়ে নিয়ে জানায়-

"ভাদ্রের ভরা গাঙে যখন কোটালে বান আসে দেখেছ? অন্তরে যখন ভোগেচ্ছার ভোগবতী দুকূল ভেঙে প্রচণ্ড বেগে যায়, তখন সাত্বিক পঞ্চ- ম- কারের সাধ্য কি হালে পানি পায়! তখন বিষে বিষক্ষয় করবার জন্যে চাই রাজসিক পঞ্চ- ম- কার !" ৪৯

এরপর আবারো বলেন-

" মনে যখন নরকের আগুন জ্বলে ওঠে, বেদ- বেদান্তের সাধ্য কি তখন নির্বাণের পথ দেখায়! তখন আগে চাই আত্মসম্পূর্তির সাধনা।" ৫০

একথা শ্রবনের পর মঙ্গলা ভাবে-

" ইন্দ্রিয় -নিগ্রহ-ই আত্মনিগ্রহ ! সেই তো মহাপাপ !" ৫১

এই ভাবেই সব সংশয় ঘুচিয়ে সিদ্ধবাবার জালে জড়িয়ে সম্পূর্ণরূপে ধরা দেয় মঙ্গলা। এই অজ্ঞতাই ডেকে আনে বিভ্রাট।

পরে যোগনিদ্রারত মঙ্গলাকে না জাগানোর নির্দেশ দিয়ে নিজেই জাগবে জানায়। এ সমস্তকিছু দিদিমা দেখতে না পেরে নিজের বাড়িতে ফিরে যান। এ সময় মঙ্গলা যোগসাধনা করেছেন বলে প্রচণ্ড অহংকারবশত নিজেকে মহান ভাবতে শুরু করে। এমন সময় বান্ধবী সত্যবতী তার সঙ্গে দেখা করতে যায়। অহংকারে পরিপূর্ণ মঙ্গলা তার সাথে খারাপ ব্যবহার করে। জানা যায় বহুপূর্ব থেকেই সত্যবতীর স্বামীর চেহারা মঙ্গলার পছন্দ

তাই আজ সিদ্ধবাবার কাছে দীক্ষিত হওয়ার গর্বে সে সিদ্ধবাবার সঙ্গে সত্যবতীর স্বামীর তুলনা করে, যা অত্যন্ত অপ্রিয় ঠেকে সত্যবতীর কাছে। এছাড়াও সত্যবতীর স্বামীর বাইরে থাকা নিয়েও দাসি সহযোগে কটু মন্তব্য করে। তারপর হঠাৎ এসব ছেড়ে 'সাত্বিক পঞ্চ- ম- কার' নিয়ে জানতে চাইলে সত্যবতী জানায় –

"আহার সংযমে, চিত্ত সংযমে দেহকে যোগসাধনের অনুকূল ভাবেই তৈরি করে নাও শীঘ্র সুফল পাবে।" ৫২

এখানেও সত্যবতীর কথায় অসন্তুষ্ট হয়ে নিজেদের বাড়ির খাবারের গুনমান ভালো বলে অহংকার করে। পরক্ষণেই সত্যবতীর শ্বশুরবাড়ি শাক্ত কিনা জানতে চেয়েই 'রাজসিক পঞ্চ- ম- কার' এর ব্যাপারটা কি জানার আগ্রহ করলে সত্যবতী জানায়-

" সস্তায় স্বর্গ দখলের লোভে, করেন বৈকি কেউ কেউ। কেন ?" ৫৩

এছাড়াও সত্যবতী জানায় –

" দুর্নীতিমূলক অবৈধ ব্যাপারে যদি আত্মোন্নতি লাভ হত তাহলে ভগবানকে নয়, শয়তানকেই জগদীশ্বর বলে মানুষ স্বীকার করত।" ৫৪

এভাবেই দুই সখির কথা বলার মাঝে সিদ্ধবাবা প্রবেশ করেই সত্যবতীর প্রতি অনুযোগের সুরে সেই অসুখের পর আর না আসার কারন জানতে চায় এবং সৎপ্রসঙ্গ শুনতে আসতে বলেন। তারপরে পরিচয় জানতে চায়, এমনকি সন্তান আছে কিনা জানতে চাইলে মঙ্গলা গুরুকেই কেন সন্তান হয়নি জানতে বললে সিদ্ধবাবার কাছে ইতস্ততবোধ করে সত্যবতী। এরপর শ্বশুরবাড়ির পরিচয়ে কৃষ্ণপুর (নদীয়া) নাম শুনে সাধুর মুখ পানসে হয়ে যায়, তা সত্যবতী লক্ষ্য করে। এরপরে মঙ্গলাকে খিদে পেয়েছে বলে বেগুনি ভাজতে বলায় মঙ্গলা খিদের সময় অন্য কিছু খেতে বললে ধমক দিয়ে যা করার নির্দেশ

দিয়েছে তা করতে বলে। মঙ্গলা মতলব বুঝতে পেরে বেরিয়ে গেলে শুরু হয় সত্যবতীকে ভুল যুক্তি দিয়ে বিভ্রান্ত করার চেষ্টা।

প্রথমেই সত্যবতী গীতা পড়েছে কিনা জানতে চেয়ে তার জীবনচর্যাকে ক্লেশকর বলেছেন, এমনকি তার বিরুদ্ধে প্রশ্ন তুলে বলেন-

"ক্ষুধা-তৃষ্ণার মত, যৌবনে মানুষ মাত্রেরই একটা স্বাভাবিক তৃষ্ণা থাকে। যথাসময়ে সেটার দাবি না পূর্ণ করলে মহা অনিষ্ট ঘটে।" ৫৫

এটা শুনে সত্যবতী মনে মনে বলে-

"গুরুদেব, পরিচয় প্রকাশ হইয়া পড়িয়াছে। আর বেশি বাড়াবাড়ি না করিলেই ভাল হয়। মান রক্ষা করা দুষ্কর হইবে।" ৫৬

এরপর ক্ষুধা,তৃষ্ণা, ভোগ, ত্যাগের বৈধতা বিচারে সময়ের অভাব বলে ওঠার চেষ্টা করলে বসুন বলে বাধা দান করেন সিদ্ধবাবা। পরক্ষণেই মঙ্গলাকে বোকা বানানোর জন্য ব্যবহার করা উক্তির পুনরাবৃত্তি করে বলেন-

"মহা শক্তির অংশ আছে আপনার মধ্যে প্রচ্ছন্ন ।" ৫৭

এটা শুনে উত্তরে সত্যবতী প্রত্যেক মানুষের মধ্যে ভগবান আছেন জানালে সিদ্ধবাবা একই সুরে আবারো বলেন-

"আপনি আরও উচ্চস্তরের জীব অতি ভাগ্যবতী। জন্মান্তরে মহা সাধনায় সিদ্ধিলাভ করেছিলেন। এ জন্মেও জোর সাধন যোগ। হ্যাঁ, স্বয়ং জগদম্বা আপনার দেহে অধিষ্ঠান করছেন।" ৫৮

এই সংলাপে সাধুবাবার মিথ্যাচার স্পষ্ট হয়ে ওঠে। এছাড়াও এগুলি বলার পর যোগসাধনা নিতে বললে স্বামীর থেকে যথেষ্ট পেয়েছে বলে সত্যবতী জানালে ক্রোধে সাধুবাবা বলেছেন-

"অভাগিয়া কাক মজে জ্ঞান নিম্ব ফলে।" ৫৯

সব শুনে গুরুর ভণ্ডতা টের পেয়ে বেরিয়ে যায় দ্রুত, মঙ্গলাকে আসছি বলে জানায়। মঙ্গলা ফিরে এলে তার কাছে সিদ্ধবাবা নিজের বড়াই করে বলেন-

"বাজিয়ে দেখলুম এঁকে ঘোরতর তমোগুণী, বিষম সংসারাসক্ত।" ৬০

জ্ঞান থাকলেই বিচার করার ক্ষমতা আসে তাইতো শিক্ষাকে নিয়ে এমন ইঙ্গিত তাঁর। এরপর বাইরের লোকের কাছে অপমান করায় কারণের মাত্রা বেশি ছিল কিনা জানতে চায় মঙ্গলা। সিদ্ধবাবা একনাগাড়ে সত্যবতীর প্রতি ক্রোধবশত তার অধঃপাতে যাবার কথা বলে এবং জানায় তাঁর কাছে সত্যবতী নাকি দাঁড়াতে পারেনি এটা শুনে সঙ্গে সঙ্গে মঙ্গলা বলে-

"কেন? দিব্যি তো সটান চলে গেল। দেখলুম, আপনিই আটকাতে পারলেন না।" ৬১

পরে মঙ্গলার এই অবিশ্বাস করাকে পাপ বলে জানিয়ে দুই বান্ধবির থেকে লুকিয়ে শোনা কথা 'রাজসিক পঞ্চ- ম-কার' এর প্রসঙ্গ এনে বিবাহিত দম্পতি ছাড়া এ সাধনা করা যায় না, এটা যে ভাবে সে ভ্রষ্ট বলে জানিয়ে ভৈরবী তন্ত্র থেকে যুক্তি এনে বলেন-

"পানে ভ্রান্তির্ভবেদ্ যস্য ঘৃণাস্যাৎ রক্ত রেতসোঃ। শুচৌ বা শুদ্ধতা ভ্রান্তিঃ পাপাশঙ্কা চ মৈথুনে। স ভ্রষ্টঃ পূজয়েদ্দেবীং চণ্ডী মন্ত্রং কথং জপেৎ।" ৬২

মঙ্গলা শুনে এটাকে ঘাড়ে কোপ বসানোর মন্ত্র বলে জানতে চায় নিজের স্ত্রী, কন্যা, পুত্রবধূ থাকলে এমন সাধনায় দীক্ষা দিতেন কিনা এবং বুঝতে পারে কোনো সুস্থ মানুষের পক্ষে এমন ভাবা সম্ভব নয়। মঙ্গলার ভুল যখন ভাঙে তখন মঙ্গলা সন্তান সম্ভবা, আফসোস ছাড়া তার আর কিছু করার নেই তখন। যোগের নামে ঠকিয়ে সিদ্ধবাবা তাকে বামাচার সাধনার পথে নামিয়েছেন। এইভাবে অন্ধবিশ্বাসের ফলভোগ করতে হচ্ছে, ঐশ্বর্যের

অহংকারে মত্ত হয়ে কারো যুক্তি সে যে গ্রহণ করেনি তার পরিণাম আজ সে টের পাচ্ছে কিন্তু করার কিছু নেই।

সবশেষে সত্যবতীর থেকে জেনে তার স্বামী মঙ্গলাদের এখানে এসে দেখে যা ভেবেছিলেন তাই সেই সিদ্ধবাবাই হল কৃষ্ণপুর গ্রামের হরিহর গাঙ্গুলী। পিতা গিরিশচন্দ্র গাঙ্গুলী। এই গাঙ্গুলী খুড়োই ছাত্রজীবনে মেধাবী হওয়ার জন্য ধনী গৃহে যেতেন এবং কূটকৌশলে এক ব্রাহ্মণ পরিবারের কন্যাকে ধর্মের নামে ভুলিয়ে পাপের পথে এনেছিলেন। মার খেয়ে দেশ ছাড়া হন তারপর যোগমার্গের অতিনিম্ন স্তরের কয়েকটি সিদ্ধি ও ঐন্দ্রজালিক কৌশল, তন্ত্রমন্ত্র, শিকরবাকরের গুণাগুণ জেনে সেই বিদ্যের সাহায্যে লোক ঠকিয়ে চলেছেন। এক আশ্রমও খুলেছিলেন কিন্তু কামিনী কাঞ্চনের লোভে আশ্রমেও কুকর্ম বাধিয়ে বসে সেই যে গা ঢাকা দেয় তারপর এখানে সিদ্ধবাবা রুপে আবির্ভাব। অবশেষে এসব জানার পর বাড়ির কর্তাকে চিঠিতে সব জানিয়ে আসতে বলা হয় সাতদিন পর ফিরে দেখেন সিদ্ধবাবা পলায়ন করেছেন। এদিকে মঙ্গলার অবস্থা জানতে পেরে মহাপাপানুষ্ঠান হল, টাকার জোরে সব ঢাকা পড়ে গেল। পুত্র সত্যানন্দও নিঃসন্তান অবস্থায় প্রাণ ত্যাগ করল।

এ সবকিছু দেখে কর্তা স্তব্ধ। সন্তান হওয়ার বাসনা হেতু সিদ্ধবাবাকে আনার যে কি পরিণাম তা স্মরণ করে ভণ্ডতার চিত্র চোখে ভাসে। এইভাবে অন্ধবিশ্বাসে গুরুভক্তির যা পরিণাম রচনায় দেখা গেল তা অত্যন্ত বেদনাদায়ক। এর পাশাপাশি শিক্ষা বিবেচনা বোধ কে জাগ্রত করে তার চিত্রও দেখা গেছে সত্যবতী চরিত্রকে কেন্দ্র করে। বিনা বিচারে এমন গুরুতর সিধান্ত না নেওয়া ও কাউকে অন্ধবিশ্বাস না করার মত সচেতনতার ইঙ্গিত দিয়েছেন লেখিকা পাশাপাশি শিক্ষার সুফলকে তুলে ধরেছেন রচনায়। এছাড়াও লেখিকা

ধর্মগুরুদের নৈতিক অধঃপতনের যে ছবি তুলে ধরেছেন তা অত্যন্ত বেদনাবহুল। এমনকি এই দৃষ্টান্ত হেতু প্রকৃত সাধকদের প্রতিও আস্থা বিনষ্ট হয়। যাই হোক সেই সময়ের একজন লেখিকা হয়েও তিনি যেভাবে সমাজের এই অসঙ্গতিকে তুলে ধরেছেন তা যথেষ্ট হৃদয়গ্রাহী। আজও খবরের কাগজের পাতায় চোখ রাখলে এমন বিভ্রাট চোখে আসে তাই তাঁর লেখা যে যুগেই হোক না কেন তার এই সচেতনতা বোধের অবদান বর্তমানেও অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ। এইভাবেই তাঁর রচিত সাহিত্য বাংলা সাহিত্যকে সমৃদ্ধি দান করেছে যা অতুলনীয়।

এরপর 'কার্য্য-কারণ' গল্পেও দেখা যায় বৈবাহিক সূত্রে এক ব্রাহ্মণ তরুণীর বৈষ্ণবী হওয়ার দৃশ্য। তার স্বামী বনমালী দাস বৈষ্ণব ধর্মে দীক্ষিত হয়ে রজ পেয়ে সংসার ত্যাগ করে। মেয়েটিকে তখন বাড়ি বাড়ি জল বিতরণ করে পাওয়া টাকায় দিনযাপন করতে দেখা গেলেও চরিত্রের স্খালন কিন্তু কোথাও চোখে পড়েনি। একদিন রোজা শেষে এক তৃষ্ণার্ত মুসলিম বৃদ্ধকে জলদান করে তাকে তৃপ্ত করলে সে তাকে আশীর্বাদ করে চলে যান। তখন এই তরুণীর উপর বৈষ্ণব ধর্মের মূল (ঠোরের প্রধান) ব্রজদাস বাবাজীর নজর পড়ে। অনেক সাধাসাধির পরও যখন তরুণীর কাছ থেকে কোনো সদর্থক ইঙ্গিত মিলল না তখন একদিন বাবাজী নিজে পথের মধ্যে সরাসরি তাকে জানায়-

> "দেখ শ্রীমতী ঠাকরুণ, তোমার জেদ ছাড়। আমি তোমার অনেক তেজবাজী সয়েছি, কিন্তু আর সইব না, তুমি মনে রেখো, আমার নাম ব্রজদাস বাবাজী।" ৬৩

এই উক্তিই বাবাজীর চরিত্রের দম্ভ ও নৈতিক হীনতাকে প্রকাশ করে।

একদিন ঘাট থেকে মেয়েটিকে মুখ চেপে তুলে নিয়ে যায়। সাথে থাকা সন্তানের ক্রন্দন ও মেয়েটির আস্ফুট চিৎকার ঘাটের মাঝি শুনতে পায় এবং মেয়েটিকে রক্ষা করে

কিন্তু মেয়েটি শেষে মারা যায়। অবশেষে ব্রজদাস বাবাজীর চেহারা সামনে এলে শাস্তি স্বরুপ আজীবন অনাথ ও বিধবাদের দায়িত্ব নিতে হয় তাকে। এইভাবে পাপের ক্ষয় ও পুন্যের জয় দেখিয়েছেন এবং ধর্মগুরু জাতীয় মানুষের নীচ মানসিকতার ছবি দেখিয়েছেন।

এইরকম অপর একটি গল্প 'বজ্র ঝংকার'। গল্পের শুরুতেই পাঠমগ্ন সুন্দরী কে দেখা যায় তাকে কেন্দ্র করে এক ফকির সাহেবের আগমন ও তাদের কথোপকথন দিয়ে পুরো গল্পের কাহিনী বিস্তৃত। গল্প বিশ্লেষণে ধীরে ধীরে এই সুন্দরী রমণীর পরিচয় আমরা পাব। তবে এ কাহিনীর কেন্দ্রবিন্দু হল সাধনা প্রসঙ্গ। সাধনা নিয়েই নারী ও পুরুষের মধ্যে ভেদাভেদ করা, নারীর স্থান কি, পুরুষের পুরুষত্বের অহংকার ইত্যাদির মত নানান বিষয় আমরা দেখতে পাব।

প্রথমেই তরুণী পাঠে মনোনিবেশ করে, তরুণ ফকির বারবার নানান প্রশ্ন করে তাকে বিরক্ত করে। তরুণী পাঠে মনোযোগ দিলে তাকে উপেক্ষা করলে ফকির বলে এরকম ধৃষ্টতা করলে আর আসব না। এর উত্তরে তরুণী অর্থাৎ তার স্ত্রী আমিরাণ ফকির অর্থাৎ তেজস্বী সিংহকে (আমিরাণের স্বামী) জানায়-

"বাসনা ক্ষোভের হাত এড়িয়ে চলতে গিয়ে আবার জড়িয়ে পড়বার চেষ্টায় আছ। নয় কি?" ৬৪

এই উত্তরে ফকির আমিরাণের উপর ক্রুদ্ধ হয়ে জানায় তার কাছে আসাটাই ভুল হয়েছে। ফকিরের জন্য বন জঙ্গলই ভালো বলে জানায় এবং নির্জন উপাসনা করাকে আমিরাণ শ্রেষ্ঠ বলে মনে করে। তবে ফকির আবারও গৃহী হওয়ার বাসনা জানালে আমিরাণ আবার তাকে স্মরণ করিয়ে দেয় তার সর্ব ত্যাগের ব্রত কেবল ভিক্ষার জন্য নেওয়া হয়েছিল কিনা। ফকিরের মন কিছুতেই সংযত হয় না সে পুনরায় সন্তান কামনার কথা আমিরাণকে জানিয়েই ফেলে, আমিরাণ এর উত্তর বলে-

"দেহের আর গৃহের সংবাদে যোগীর প্রয়োজন কি?" ৬৫

এই কথা শুনে ফকির আবার বলে-

"অদম্য আকর্ষণ!" ৬৬

এভাবেই ফকিরের মনোভাবের এক একটা প্রকাশ আমিরাণকে রাগিয়ে তোলে, সে জবাব দেয়-

"সাধনার পথে অগ্রসর হয়ে, ইতর - কামনার দিকে দৃষ্টিপাত - ও যে নিজের সর্বনাশ!" ৬৭

এইরকম ভাবে প্রশ্ন উত্তর চলনে এই গল্পে আমিরাণ ও ফকিরের মধ্যে যে কথোপকথন আমরা দেখতে পাই সেখানে একজন সাধনার পথে ভক্তি ভরে এগিয়ে যেতে চায় আর অপরজন সাধনার পথে ভন্ডামিকে গ্রহণ করে। তাই উদ্ধত ফকির আমিরাণের সাধনা নিয়ে প্রশ্ন তোলে এবং তাকে আসন ছেড়ে দিতে বলে জানায়-

"গৃহীর আবার আসন! ফেলে দাও আসন! মূর্খ নারী তুমি। এই চার দেয়ালের মধ্যে তুমি চিরদিন আবদ্ধ আছ। তুমি আসন প্রাণায়ামের অর্থ কি বুঝবে? তোমার পক্ষে গৃহীর কর্তব্যপালনই শ্রেয়:।" ৬৮

এভাবে ফকিরের উদ্ধত উক্তিই নারীর স্থান কোথায় আমাদেরকে বুঝিয়ে দেয়। চার দেওয়ালে আবদ্ধ গৃহস্থ জীবনই নারীর শ্রেয় এটাই পুরুষত্বের অহংকারে উদ্ধত ফকিরের কথাতে স্পষ্ট। এখানে সমাজে সাধনা করতে গেলেও পুরুষ ও নারীর মধ্যে একটা সীমারেখা দেখা যাচ্ছে। সাধন ভজন সমস্তটাই পুরুষের দখলে, নারী তাদের চোখে অপারগ। তবে নারী এখানে তার সাধনার পথে সিদ্ধি লাভের দিকে এগিয়ে যেতে চায় ফিরে আসতে চায় না তাই ফকিরকে যোগ্য জবাব দিয়ে বলে-

"তোমার প্রেমত্ব লাভ আমার প্রার্থনীয় নয়। দেবত্বলাভই বাঞ্ছনীয়।" ৬৯

এভাবে আমিরাণের চলে যাওয়া ও ফকিরের প্রতীক্ষার মধ্য দিয়ে কাহিনী শেষ হয়। লেখিকা সাধন ভজন কে কেন্দ্র করে, দুই চরিত্রের প্রশ্ন-উত্তর দানের মাধ্যমে, সমাজে পুরুষত্বের অহংকারের দিকটিকে এবং সাধনার ক্ষেত্রে নারী-পুরুষ ভেদের বিষয়টিকে গল্পে সুন্দরভাবে তুলে ধরেছেন। সময় হিসেবে এটি অনেক আগের সমস্যা হলেও বর্তমানে আমাদের সমাজ থেকে এই ধারণা যে একেবারে মুছে গেছে তা না সার্বিকভাবে দেখা না গেলেও কিছু কিছু ক্ষেত্রে এখনো ভেদাভেদ নজরে পড়ে, তাই বাস্তবতার আবেদনেও রচনাটি প্রশংসনীয়। অনুরুপভাবে 'আদেশ পালন' গল্পে ঈশ্বরপ্রেম, ত্যাগ ও 'ক্ষমতার জয়' গল্পে অসৎ কুলীর মৃত্যুদৃশ্যের মাধ্যমে পাপের শাস্তি দেখানো হয়েছে।

এছাড়াও কয়েকটি গল্পে স্বার্থপরতার চিত্র দেখা যায়। এ প্রসঙ্গে 'ভণ্ডের সার্থকতা' গল্পে দেখা যায় মহাদেব চট্টোপাধ্যায় নামক এটর্নি চরিত্রের ভণ্ডামি ও স্বার্থপরতা। ধর্মভয়, নীতিজ্ঞান, চক্ষুলজ্জা ও আধ্যাত্মিকতা মূল্যহীন তার কাছে। দুর্বলকে সহজে ঠকানো সম্ভব এটা সে জানে। তাইত পীরমহম্মদের কাছে টাকা নিয়ে তার হয়ে ওকালতি করতে গিয়ে হেরে গেলে পীরমহম্মদের জেল হয়। জেল থেকে ফিরে উগ্র মূর্তি ধারন করে বাড়ীতে এসে টাকা ফেরত নিয়ে যায় তখনি মহাদেববাবুকে বলতে শোনা যায়-

"দুর্ব্বলকে ফাঁকি দিবার সময় অনেক জুলুম খাটে, কিন্তু সবল যখন পদাঘাত করিয়া লইতে আসে, তখন আইন কানুন বিশৃঙ্খল বোধ হয়।" ৭০

অপরদিকে জানানা সোয়ারী নামের এক ভদ্রমহিলা বিপদের দিনে দশ হাজার টাকা ধার দেয়। মাঝে এই অসৎ লোক তাকে কোনোক্রমে দুইহাজার টাকা দিতে রাজি ছিল কিন্তু বর্তমানে তাকে একপয়সাও দেবেনা ভেবে নিয়েছিল তাইত জানানা সোয়ারী তার ছেলের মর্মান্তিক অসুখের কথা বললেও তাকে টাকা চুরি হয়ে গেছে এই বাহানায়

খালি হাতে তাড়িয়ে দেয়। এইভাবে তার হীনমানসিকতা ও ভণ্ডামি দেখা যায়। তবে ঈশ্বরের দরবারে বিচার হবে জানানা সোয়ারীর এই ক্ষীণ আশা থেকে ঈশ্বরের প্রতি বিশ্বাসও গল্পে দেখা যায়।

এরপর 'সূক্ষ্ম-ধর্মজ্ঞান' গল্পটি বিশ্লেষণ করলে ভণ্ডামি ও বহুবিবাহের চিত্র দেখা যায়। গল্পে গৌরগোপাল চরিত্রের রায়গিন্নির বাড়িতে এসে ছাগ বিষ্ঠা দেখে তা নিয়ে অনেক পুণ্যক্ষয়ের কথা এবং বাড়ির বউদের কাজের কি ছাঁদ বলার প্রসঙ্গে তার দুই স্ত্রীর উল্লেখ পাই যা বহুবিবাহের প্রচলনকে ইঙ্গিত করে। এরপরে সে ওইপাড়ার মেয়েমহলে গান বেঁধে পরিচিতি গড়ে তোলে। এইভাবেই পাড়ার এক বিধবা সরলা দেবীর সঙ্গে পরিচয়ের সূত্রে তার দোকান বিক্রির ব্যাপার জানতে পেরে সে দালালী করে। দোকান রেজিস্ট্রিবাবদ রামকৃষ্ণ সাহা বিধবাকে সাতশো টাকা দিতে রাজি হয় কিন্তু মাঝখানে গৌরগোপাল তিনশোর বেশি পাবেনা বলে বিধবাকে জানিয়ে দেয়। এইভাবে সে নিজের আখের গোছাতে চায় তবে রায়গিন্নির পুত্র ব্যাপারটা বুঝতে পেরে বিধবার উপকার করে এবং গৌরগোপালের ভণ্ডামি সামনে আনে। এছাড়াও 'ভুমিকম্প', 'কার্য্য-কারণ', প্রভৃতি গল্পেও স্বার্থপরতার ছবি আমরা আগের আলোচনায় দেখেছি।

এরপর একটি ভিন্ন স্বাদের উপন্যাস হল 'রঙিন ফানুস'। এই উপন্যাসে কুর্মী সম্প্রদায়ের জীবনযাত্রা লক্ষ করা যায়। এখানে সমাজের পুলিশি শাসন ব্যবস্থার স্বরূপ, অপরিণত বয়সে বিবাহ অস্বাস্থ্যের মূল এরকম ভাবনা ছাড়াও আরো অনেক বিষয় আমরা 'রঙিন ফানুস' উপন্যাসটা আলোচনা করলে দেখতে পাব। রচনা শুরুতেই বাবুদের বাড়ির কন্যা মনোরমা ও বাবুয়ার মা বলে পরিচিত পার্বতীর রাস্তা দিয়ে বাড়ি ফেরার দৃশ্য দেখা যায়, খন্তর নামের কুর্মী সম্প্রদায়ের একজন রাস্তায় তাদেরকে দেখে এগিয়ে দিয়ে যায়

বাড়ি পর্যন্ত। এদিন পার্বতীর দৃষ্টি ছিল খন্তরের দিকে সেটা খন্তর খেয়াল করে বড় অস্বস্তিতে পড়েছিল। তাদেরকে বাড়ি দিতে গিয়ে ছোট বাবুর স্ত্রীকে প্রণাম করলে ছোট বাবু স্ত্রী যখন বলেন-

"ফের বিয়ে- থা কর, সুখী হও" ৭১

তখন খন্তর এই কথা শুনে এরকম আশীর্বাদ করতে বারণ করে। পরেই খন্তর আবার বেরিয়ে যায়। খন্তর স্ত্রী ও সন্তানহারা তবে পুনরায় বিয়ে করতে সে অনিচ্ছুক। সবাই বিয়ে করা নিয়ে নানান কথা বললেও সে কিছুতেই রাজি নয় সাধনভজন, পূজা পাঠ ইত্যাদি নিয়ে সে থাকতে চায়। সেদিন প্রথমেই মনোরমা ও বাবুয়ার মাকে তাদের বাড়িতে পৌঁছে দিয়ে আসে তারপর গুজন্তী স্টেশনে খন্তরের দাদা জয়পাল থাকে সেখানে যায়, সে দাদার ছেলেদের খুব ভালবাসে। কিন্তু দাদা ও বৌদির বিয়ের প্রস্তাব নিয়ে কুর্মী সমাজে পাত্রী খোঁজার বহর দেখে তাদের ছেড়ে এসে বাড়ি ফিরে ভাইপো দুটোর পড়ার খরচ পাঠিয়ে দেয়। এটাই আপাতত খন্তরের জীবন। ওদিকে বাবুয়ার মা অর্থাৎ পার্বতী ও শনিচরের বউ দুজনে দানাপুরের মেয়ে, তাই একটা দিদি-বোন সম্পর্ক।

খন্তরের জীবনযাত্রা অত্যন্ত সহজ সরল। সে বলশালী, রেলে কাজ করে, মিস্ত্রি হিসেবে বেশ কদর আছে তার এদিকে সুমার, শনিচর, জয়পাল সকলে তাকে বিয়ে করা নিয়ে বড্ড জেদাজেদি করে, কেবল একজনই তাকে বিয়ে নিয়ে কিছু বলে না যার কাছে গেলে সে দুই দন্ড শান্তি পায় সে হলো ডাক্তার বাবু। সে সবাইকে বিয়ে করবে না বলে খরচের রোজগারের অজুহাত দেয়। আর ওদিকে সুমারের পিতা-মাতা, স্ত্রী, কন্যা, চাকরি, অভাব-অনটন সবই বর্তমান তবু সংসার করে সে এবং খন্তরকেও সংসার করতে বলে। খন্তরের অনিচ্ছা থাকায় কিছুদিন এই বিয়ের প্রসঙ্গ আপাততভাবে সবাই বলা বন্ধ করে

এভাবেই খন্তরের কিছুদিন চলে যায়। খন্তর সবাইকে নিয়ে চলে, সকলকে সাহায্য করে, খন্তরের এই গুণ। বর্তমানে খন্তরের গুনগান পার্বতী শোনে এবং তার প্রতি অনুরক্ত হয়। এমন এক সময় খন্তরের পা ভাঙ্গে সে সময় খন্তর খুব অসুবিধায় পড়ে। তখন সবাই আরো আর একবার বিয়ের প্রসঙ্গটা তুলে ধরে। আবার ডাক্তারবাবুর অজুহাত দিয়েই খন্তর বেঁচে যায় এই প্রসঙ্গ থেকে।

কিছুদিন বেঁচে গেলেও এবারে বিয়ের প্রসঙ্গ ঠিক কাকে নিয়ে সেটা উল্লেখ করে দেয় বাকিরা। আভাসে ইঙ্গিতে বিয়ের পাত্রী হিসেবে পার্বতীর নাম খন্তরকে জানিয়েই দেয়। সঙ্গে উল্লেখ করে দেয় সেও স্বামী, সন্তান হারা আর তুইও স্ত্রী, পুত্র হারা তাই দুজনের সংসারটা বেঁধে ফেলা দরকার। খন্তর প্রসঙ্গটাকে বিশেষ পাত্তা দেয় না। তবে বারবার বাবুয়ার মায়ের সাথে তার সাক্ষাৎ হয়ে যায় যেটা বড্ড অস্বস্তিকর। পা ঠিক হবার পর মন্দিরে খন্তর একদিন যায় তখন পার্বতীর সঙ্গে দেখা হয়েছিল সেই সাক্ষাৎটাও কেমন যেন অস্বস্তিকর। এরকম ভাবেই তাদের দিনগুলো কেটে যায়।

এরই মাঝে একদিন পার্বতীর বস্তিতে থাকা নিয়ে কথা উঠে। সমাজের কিছু উচ্ছৃঙ্খল যুবকদের ব্যবহারে সুমারের বাবা বলে-

"ও বয়সের মেয়ে, রূপ আছে,- একা বস্তির মধ্যে বাস করা চলবে না! শেষে একটা কেলেঙ্কারী হবে?...।" ৭২

সমাজে পার্বতীকে নিয়ে যে সমস্যার সৃষ্টি হয়েছে সেটা বোঝা যায়। এই কয়দিনের মাঝে খন্তরের কিন্তু আসা-যাওয়াটা বন্ধ ছিল এদিকে পাড়ায় নানান সমস্যায় পড়ে পার্বতীকে বাড়ি পাঠানো হয়। এখানে বিবাহ সংক্রান্ত একটা কথায় যখন বলা হয়-

"পল্লীবাসী অবিবাহিত বা বিপত্নীক যুবা এবং বিধবা যুবতীদের মধ্যে শীঘ্র শীঘ্র বিবাহ ঘটাইয়া দিয়া, সামাজিক জীবনের অনাচার নিবারণ করাই ছিল পল্লীর চিরাচরিত প্রথা।" ৭৩

তখনই এখানে সমাজটা স্পষ্ট হয়ে ওঠে। তবে এখানে লেখিকা বিধবাদের বিয়ে দেবার বিষয়ে প্রতিবেশীদের উৎসাহ- পূর্ণ মানসিকতার ছবি দেখিয়েছেন। এবার সমাজের পাশাপাশি গল্পের নায়কের কথায় আসা যাক পার্বতীর জীবনের সঙ্গে ঘটে যাওয়া সমস্ত ঘটনা এখনো পর্যন্ত খন্তরের কাছে কিন্তু অজানা। এদিকে এত রাগানোর ফলে খন্তরের মধ্যে মেয়েটিকে নিয়ে ভাবা শুরু হয় এইরকম পরিস্থিতিতে সে স্থান ত্যাগ করে জামালপুরে কাজ নেয় পরে এসে শোনে পার্বতী চলে যাওয়ার ইতিবৃত্ত তখন মনে মনে করুণা অনুভব করে আর ভাবে যে সে থাকলে হয়তো এরকম হতো না পরে জামালপুর থেকে পাটনা ও আরো পরে গয়ায় বদলি হবে ভাবে।

পরবর্তী একটা অংশ যেখানে সুমারের স্ত্রীর সঙ্গে সুমারের দ্বন্দ্ব নিয়ে একটা বিষয় উঠে আসে সেটি হল সুশিক্ষা ও জ্ঞানের প্রসঙ্গ। সেখানে খন্তর যখন বলে-

"অসময়ে যে বালিকাকে শুভ বিবাহে বাধ্য করা হইয়াছে, অল্প বয়সে যাহাকে সন্তানের মাতৃত্বে অভিষেক করা হইয়াছে, সে যদি অস্বাস্থ্যপীড়িত, অলস, অবসাদগ্রস্ত, ক্লান্ত দুর্ব্বল প্রকৃতির না হয়, তবে কে হইবে? বধূর প্রতি অবিচার করিবার পূর্ব্বে অভিভাবকগণের নিজেদের বিবেচনা ত্রুটির প্রতি লক্ষ্য করা উচিত। নিজেদের হিতাহিত বিবেচনা করিবার মত শিক্ষা, বধূকে পূর্ব্বে দেয়া কর্ত্তব্য ছিল।" ৭৪

এখানে সুমার ও তার স্ত্রীর ঝগড়াঝাটিকে কেন্দ্র করে খন্তর যা বলল তাতে খন্তরের সুশিক্ষা এবং উন্নত বিবেচনা বোধের পরিচয় পাওয়া গেল এবং মেয়েদের অল্প বয়সে বিয়ে দিলে তারা যে অস্বাস্থ্যকর পরিস্থিতির শিকার হয় সেই ছবিও আমাদের চোখের সামনে ধরা পড়ল। এখানেও লেখিকার সমাজ সচেতনতা আর একবার আমাদের মনে উদয় হয়।

এরপরে আবার আলোচনার মধ্যে বাবুয়ার মা তথা পার্বতীর প্রসঙ্গ আসে পার্বতী আবার মনোরমার সঙ্গে তাদের বাড়ি আসে তবে এবারে তার স্বভাবে পরিবর্তন আসে। সে ধীর, স্থির ও অন্য ধরনের তার মধ্যে আর আগের মত চপলতা নেই, এ পার্বতীকে দেখে খন্তরের একটা অন্যরকম লাগে। অনেকদিন বিবাহ প্রসঙ্গ নিয়ে কথা বন্ধ থাকলেও পার্বতীর আগমনে আবার সে কথা ওঠে। এরই মধ্যে খন্তর ওদিকে বাড়ির কাজের জন্য লোক খুঁজতে থাকে। এক বৃদ্ধাকে লোক খুঁজে দিতে বললে বৃদ্ধা লোভে পড়ে তার বোনঝিকে পাঠিয়ে দেয়, প্রথম দিন বোনঝি কাজে এলে তার গায়ে পড়া ব্যবহার দেখে খন্তর ক্ষুব্ধ হয় তাকে কাজে আসতে বারণ করে দেয়। এই কিছুটা সময় বৃদ্ধার বোনঝিকে নিয়েও খন্তর বেশ বিপাকে পড়েছিল তবে এখন সে ঝামেলা মুক্ত। এরই মধ্যে খন্তর পার্বতী আসার খবর পায় তবে পার্বতীর সঙ্গে সাক্ষাৎ হলে তাকে বিয়ে করার পরামর্শ খন্তর নিজে থেকে দেয়, ভেবেছিল এই কথা শুনে হয়তো আগের মতোই পার্বতী তার প্রতি অনুরাগের কথা জানিয়ে দেবে। কিন্তু এবারে তা হলো না খন্তর বড় আশ্চর্য বোধ করল। পার্বতীর এরকম ব্যবহারে সে হতাশ হলো এবং ভাবল কি করে সে তার মনের অনুরাগের কথা তাকে জানাবে। একদিন এই কাজটা করার জন্য সে মদ খায় এবং মদের ঘোরে এসে পার্বতীকে বিয়ে করতে চায় একথা জানিয়েই দেয়, সবার মিলিত সহযোগে পার্বতী এবং খন্তরের বিবাহ শেষ পর্যন্ত হয়েই যায়।

শুরু হলো তাদের নতুন জীবন। প্রথমেই পার্বতীকে সংযত থাকতে বলে, সাধন ভজন করতে বলে, এসব পার্বতীর পছন্দ হয় না সে তার দিদির কাছে গিয়ে স্বামী তাকে সময় দেয় না বলে অভিযোগ করে। প্রথমে সবাই খন্তরকে দোষারোপ করে তখন খন্তর পার্বতীর ভালোলাগার ছোট খোকাকে আনে তাও পার্বতীর তখন আর ভালো লাগেনা। অনেকবার পার্বতী খন্তরের কাছে ধরা দিতে চেয়ে ব্যর্থ হলে ক্রমে রাগ জমে এবং

অভিযোগ করে। এভাবে মান অভিমানের মধ্য দিয়ে তাদের দিন কাটছিল। এমন সময় একদিন একটা কুলি সম্প্রদায়ের মেয়েকে কয়েকজন দুর্বৃত্ত তুলে নিয়ে যাওয়ার প্রসঙ্গ দেখা যায়। খন্তর মেয়েটিকে উদ্ধারের জন্য এগিয়ে যায় এবং যখন বলে-

> "অসাধারণ কর্তব্যপরায়ণ পুলিশ কর্ম্মচারী সর্ব্বত্র সুলভ নয়। দেশের সাধারণ পুলিশের দায়িত্বজ্ঞান ও তদন্ততৎপরতা এ সব ক্ষেত্রে কিরূপ হইয়া থাকে, তাহা দেশবাসী ভালোই জানে। বিশেষত: যাহাদের ধন নাই, তাহাদের মান প্রাণের মূল্য পুলিশের কাছে নিতান্ত তাচ্ছীল্যের বিষয়। অতেএব অবস্থার দায়ে পড়িয়া কঠিন পরিশ্রমে আত্মরক্ষার চর্চা ইহাদের রাখিতে হয়।" ৭৫

তখন খন্তরের এই কথাতে পুলিশের শাসন ব্যবস্থার স্বরূপ আমাদের চোখের সামনে উঠে আসে এবং এই পরিস্থিতি থেকে মেয়েদের কিভাবে রক্ষা পেতে হয় তারও পথ জানা গেল তার কথায় মেয়েদেরই আত্মরক্ষা চর্চা মেয়েদেরকে রক্ষা করবে। এই আভাস খন্তরের কথায় আমরা পাই। এইরকমই সমাজ সম্পর্কে ছোটখাটো অভিজ্ঞতা উপলব্ধি চরিত্রের মুখের কথায় লেখিকা তুলে ধরেছেন যা অত্যন্ত বাস্তব।

আবারো খন্তর ও পার্বতীর দাম্পত্য জীবনের দিকে চোখ রাখলে দেখতে পাবো মান অভিমান পর্ব। এটা অনেকটা সময় চললেও সবার অভিযোগ শুনতে শুনতে খন্তর ভাবে পার্বতীর প্রতি একটু যত্নশীল হওয়া দরকার। তখন থেকেই শুরু হয় তাদের জীবন যাপনের অন্যধরন। খন্তর কাজে ফাঁকি দেয়, সারাক্ষণ পার্বতীর চোখের কাছে থাকে এবং পার্বতীকে সোহাগ করে। এইভাবে কাটতে থাকে বেশ কিছুদিন, এক সময় পার্বতী গর্ভবতী হয় তবে পার্বতী মরা বাচ্চার জন্ম দেয় তখন ডাক্তারের কাছে গেলে ডাক্তার উগ্র মেজাজটাই এই পরিস্থিতির কারণ এটা বললে, পার্বতীর বাবার উগ্র মেজাজের প্রসঙ্গ আসে। পার্বতীর বাবার স্বভাব উগ্র ছিল সেটা আমরা রচনায় দেখতে পেয়েছি সেই উগ্র মেজাজের ফল পার্বতী। এমনকি খন্তর আর তার দাম্পত্য জীবনে নানান চাওয়া পাওয়াকে

কেন্দ্র করে পার্বতীর উগ্র রূপের পরিচয় আমরা পেয়েছি, সেটাই মৃত সন্তান প্রসবের কারণ বলে ডাক্তার জানায়। তাই ডাক্তারের মুখে শোনা যায়-

> "অসংযমী বাপ মায়েদের দোষে কলুষিতচেতা নরনারীর সংখ্যা পৃথিবীতে যথেষ্ট বেড়ছে। তুমি তো রামায়ণ পড়, রাবণের জন্ম বৃত্তান্তের অর্থটা বুঝেছ?" ৭৬

এভাবেই নর-নারীর প্রবৃত্তি সংযমের প্রসঙ্গ ডাক্তারের কথায় আমরা পেলাম যার থেকেই খন্তর সিদ্ধান্ত নিল বংশবৃদ্ধি সৃষ্টি করা তাদের জন্য বন্ধ রাখা আপাতত উচিত।

এই সমস্ত কিছুর পর খন্তর নিজেকে সংযমী করে তোলে এবং এতদিন শরীর খারাপ ও পার্বতীর কথায় উঠে বসে অনেক দেনা হয়েছে এখন পার্বতীকে সংযমী ও সাবধানে চলতে হবে তার ভালোর জন্য। এই ভাবনা থেকেই ঘটল অনর্থ। পার্বতী খন্তরের এই পরিবর্তন মেনে নেয় না। সন্দেহ করে, ভাবে খন্তরের গুপ্ত প্রেমিকা আছে। ক্রমে সন্দেহ বাড়তে থাকে। সন্দেহ বাড়তে বাড়তে উন্মাদ পর্যায়ে পৌঁছে যায় পার্বতী যার ফলস্বরূপ খন্তরের পকেটে প্রেমিকাকে খুঁজতে থাকে। এমনকি খন্তর কে মারধরও করতে থাকে। একেবারে পাগলের পর্যায়ে পৌঁছে যায় পার্বতী। এক সময় তার দিদি অর্থাৎ শনি চরের স্ত্রী তাকে অবহেলা করার জন্য খন্তরের প্রতি অভিযোগ করেছিল কিন্তু এখন খন্তরকে এসে বলে সে নাকি তার বোনকেই লাই দিয়ে মাথায় তুলছে। তবে পাগলামির মাত্রা অত্যাধিক হলে তাকে মানসিক চিকিৎসালয়ে পাঠানো হয় এবং সেখানে পার্বতী মারা যায়। আবারও বিয়ের প্রসঙ্গ তোলে খন্তরকে নিয়ে তবে খন্তর এবারে একেবারে নারাজ। এইভাবেই সমাজে বহুবিবাহের প্রচলনের বিষয়টিও নজরে আসে। তবে রচনাটা শেষ হয় এই ঘটনার দশ বছর পর বেনারস ক্যান্টনমেন্ট স্টেশনে ডাক্তারবাবু, মনোরমা এদের সঙ্গে দেখা হওয়ার মধ্য দিয়ে। সেখানে দেখা যায় ডাক্তাররা একটা দল তৈরি করে

মানুষের শারীরিক ও মানসিক স্বাস্থ্যের উন্নতি-বিধানের চেষ্টা করছে এমনকি ভবিষ্যতে মাতৃজাতির সুশিক্ষা ও সৎ প্রকৃতি গঠনের অধ্যাবসায়ের বিষয়েও খেয়াল রাখছেন তাঁরা। খন্তর ও তাদের দলে যোগদান করে। এভাবেই সমাজের নানান দিক লেখিকা এই রচনার মাধ্যমে তুলে ধরেছেন। শিক্ষা, মাতৃত্ব, আত্মরক্ষা যাই হোক না কেন একটা মেয়েকেই জীবনে এগিয়ে যাবার জন্য সব কিছু আয়ত্তে রাখতে হবে, এভাবেই নারী যেকোনো পরিস্থিতিকে জয় করতে পারবে।

'পাহাড়ের পথে' নামক মানভূমের বাংলা ভাষার টানযুক্ত এই গল্পে প্রসাদ নামক চরিত্র কে কেন্দ্র করে কাহিনী এগিয়ে যায়। এখানে গল্পের কেন্দ্রীয় চরিত্র প্রসাদ ও তার দুই স্ত্রী। দুইবার বিবাহের অন্যতম কারণ প্রথম স্ত্রীর সন্তান না হওয়া। দুই বিবাহ যেমন দেখা গেছে তার সঙ্গে সঙ্গে সংসারে কলহ দেখা গেছে। এ কলহ যুক্ত সংসারে দু স্ত্রী কিভাবে অবস্থান করছে সেটাই এখন আমরা গল্পটা আলোচনার মাধ্যমে দেখে নেবার চেষ্টা করব।

মানভূম গল্পের মধ্যে উল্লিখিত জায়গা। পাহাড়ি এলাকার মানুষ আজও ভেষজ ওষুধের উপর নির্ভর করে সেই কাহিনী এখানেও দেখা যায়। তাই গল্পের প্রথমেই লক্ষীকান্ত কবিরাজের সঙ্গে পাহাড়ি পথে ভেষজ ওষুধ সংগ্রহের জন্য প্রসাদ যায়। তবে পথে যেতে যেতেই এক বাউড়ি সম্প্রদায়ের মেয়েকে কাঠ কুড়োতে দেখে সে বারবার তাকিয়ে দেখে এবং কিছু জিজ্ঞাসা করতে গিয়ে সমস্ত মুখের হাসি তার ফিকে হয়ে গিয়ে সে আবার কাজে মন দেয়, না তাকানোর ভান করে। তবে এরকম কিছুক্ষণ চলার পর নিজেকে সংবরণ না করতে পেরে কবিরাজের পিছু পিছু যেতে যেতে প্রসাদ মেয়েটির দিকে এসে ছেলে কেমন আছে জানতে চায়। মেয়েটি হলো পার্বতী, প্রসাদের প্রথম স্ত্রী

সে এক কথায় উত্তর দিয়ে ছেলে ভালো নেই বলে জানায়। এখানে সংক্ষেপে পার্বতীর কথা একটু বলে নেওয়া যাক, পার্বতী প্রথম স্ত্রী, সন্তান না হওয়ার কারণে দ্বিতীয় বিবাহ করে লুইতুনিকে। তবে দ্বিতীয় বিয়ের পরই প্রথম স্ত্রীর সন্তান হয় ও দ্বিতীয় স্ত্রীরও সন্তান হয়, কিন্তু সংসারে দুই স্ত্রীর মধ্যে বড় অশান্তির সৃষ্টি হয়, প্রতিদিন কলহ, মারপিট লেগেই থাকে। অবশেষে অত্যাচার সহ্য করতে না পেরে পার্বতী গৃহত্যাগ করে, শুনতে খারাপ লাগলেও ওই মুহূর্তে প্রসাদ যেন হাঁফ ছেড়ে বাঁচে। এরপর বহুদিন পর এই পাহাড়ের পথে তাদের দেখা, এই দেখা হওয়ার পর ছেলের কথা জেনে প্রসাদ উতলা হয়ে তাকে কেন খবর দেওয়া হয়নি বলে জানতে চায়। উত্তরে পার্বতী বলে-

"তু উয়াকে ডরিস্ কিস্ কে?" ৭৭

এই কথা বলে পার্বতী চলে যাওয়ার উদ্যোগ করলে প্রসাদ তাকে বাধা দেয় তৎক্ষণাৎ উপর থেকে কবিরাজের মহাশয়ের ডাক আসে। তখন প্রসাদ তাকে হনুমান ধারার কাছে অপেক্ষা করতে বললে পার্বতী তৎক্ষণাৎ না বলে জানালে প্রসাদ বলে-

"আমার কিরা ছেলেটার কিরা, শুনি যাস্।" ৭৮

এইভাবে প্রসাদের কথা আর ফেলতে পারেনা আসলে বিবাহিত সম্পর্কে প্রসাদের দায়িত্ব কতটা নিল বা নিলনা এখানে বড় করে দেখা হল না। একপ্রকার অবহেলা অযত্নে পার্বতীর জীবন চলছিল তবুও এই কিরা অর্থাৎ দিব্যি এই ধারণায় বিশ্বাসী সমাজের কিছু মানুষের মতোই পার্বতীও সেদিন প্রসাদের কথা রেখে হনুমান ধারার কাছে বসে তার জন্য অপেক্ষা করেছিল। এখানে এদের এই সাক্ষাৎ পর্বের জন্য উল্লেখিত হনুমান ধারার কথা প্রসঙ্গে এই মানভূম অঞ্চলের বাউড়ি সম্প্রদায়ের মধ্যে দুটি উৎসব হনুমান ধারা ও গাই ধারা এর উল্লেখ পাই, তবে বিস্তারিত বর্ণনা গল্প থেকে তেমন কিছু পাই না। যাইহোক

এবার তাদের দেখা হওয়ার প্রসঙ্গে আসা যাক, কবিরাজের কাছে কাজ মিটিয়ে প্রসাদ তার নির্দেশ করা জায়গায় এসে দেখে পার্বতী তার জন্য অপেক্ষা করছে। তবে সঙ্গে পার্বতীর লোকজনকে দেখে প্রসাদের খুব একটা ভালো লাগেনি, তাই প্রসাদের জন্য পার্বতী একটু আড়ালে সরে যায়। তখনই প্রসাদ বলে-

"তুর লেগে পাহাড় হতি ফুল আনেছিলাম, তু লিয়ে যা-" ৭৯

কথাটা শুনে পার্বতী ফুলটা নিয়ে ছুঁড়ে ফেলে দেয়, এই ঘটনায় প্রসাদ বড় ক্ষুব্ধ হয়, ফেলে কেন দিল জানতে চাইলে পার্বতী জানায় যাতে ছেলের রীতটা প্রসাদের মত না হয় সেই প্রার্থনার জন্যই হনুমানের মন্দিরের কাছে ছুড়ে দিয়েছে। এভাবে রাগে পার্বতী ওই স্থান ত্যাগ করে।

এইরকম ভাবেই এই গল্পের মধ্যে সুন্দর একটা কাহিনীকে তুলে ধরেছেন যেখানে সতীন সমস্যা, কলহ, সংসারের ভাঙ্গন যেমন আছে তেমন প্রসাদের অসহায়তা রয়েছে। সন্তান লাভ করার জন্য দুটো বিয়ে করলেও প্রথম স্ত্রীকে সে মনে মনে স্ত্রীর মর্যাদাই দেয়, তবে দ্বিতীয় স্ত্রীর দাপটে প্রথম স্ত্রীর জন্য কিছু করার কথা সে ভাবতেও পারে না। নিরুপায় ভাবে দায়িত্ব না নিয়েই বসে থাকতে তাকে দেখা যায়। তবে অপমানিতা প্রথম স্ত্রী কিন্তু তার আত্মসম্মান বিসর্জন দেয়নি তাই প্রসাদের দেওয়া ফুল সে গ্রহণ করেনি। এখানেই পার্বতী তার নিজের সম্মান নিজের কাছে ধরে রেখেছে। এইভাবে পার্বতী চরিত্র গল্পে যেন এক আলাদা মাত্রা পায়। এছাড়াও মানভূমের ভাষা চরিত্রের মুখে লেখিকা সংযোজন করেছেন, রয়েছে দৈনন্দিন জীবনের নানা ঘটনায় দিব্যিতে বিশ্বাস করা সমাজের কথা, পাহাড়ি মানুষের ভেষজ ওষুধের প্রতি আস্থা ইত্যাদির মতো নানান বিষয়।

এরপর গৃহস্থজীবনের চিত্র পাই 'ননীখানসামার ছুটি যাপন' (আশ্বিন, ১৩২৩) গল্পে। মা, ভাই, স্ত্রী নিয়ে ননীর সংসার। সেখানে গ্রামীণ জীবনযাত্রা, বৌদিদির রসিকতা এবং মেয়েদের নিয়মমাফিক জীবনযাত্রা দেখা যায়। পান দেওয়াকে কেন্দ্র করে গুরুজনের সামনে সরাসরি স্বামীকে পান না দিতে পারা প্রভৃতির মতো দৃশ্যও দেখা যায়। এধরনের সাধারণ ছাঁদে বাঁধা কয়েকটি গল্প হল 'দুই রূপ', 'পাঠশালার স্মৃতি', 'থিয়েটার দেখা', 'বোকার টুপি', 'তোকে মেলে ইয়া ইয়া খাঁ কলব', 'কর্পূরের মালা' প্রভৃতি।

এছাড়া লেখিকার বিজ্ঞান নির্ভর মানসিকতার চিত্র পাই 'আশ্চর্য সফল স্বপ্ন' (চৈত্র, ১৩২৮) নামক গল্পে। এখানে এক বৃদ্ধার স্বপ্ন প্রসঙ্গ আছে। যে স্বপ্নে পূর্বে কখনও দেখেনি ও ভাবেনি এমন জায়গার চিত্র দেখতে পায়। পরে গয়া ভ্রমণে গিয়ে সে চিত্র দেখে তার চেনা লাগে এবং ভাবে এছবি তার স্বপ্নে দেখা। এমনকি এক এক করে কোনো জায়গায় প্রবেশের আগেই যেভাবে বর্ণনা দেন তা শুনে গাইড অবাক হয়। তবে লেখিকা এমন গল্পে দেখালেও তিনি পাঠককে ভাবতে বলেছেন যা পূর্বে দেখেনি তা নিয়ে স্বপ্ন দেখা যায় কিনা কারন তিনি জানেন মানুষের বাস্তবের ভাবনা অবচেতনে আসে। এইখানেই তাঁর মনঃসমীক্ষণ সম্পর্কে স্বচ্ছ ভাবনা ও যুক্তি নির্ভর মানসিকতার পরিচয় পাই।

'সই' (১৩২৯,বঙ্গাব্দ) উপন্যাসটিতে নায়ক ও নায়িকা যথাক্রমে হিতেন্দ্র চট্টোপাধ্যায় এবং তার স্ত্রী বিদ্যুৎলতা। হিতেন্দ্র চট্টোপাধ্যায় কলকাতা মেডিকেল কলেজের ফিফ্থ ইয়ারের ছাত্র। বাড়িতে মাসিমা থাকেন, তিনি নিঃসন্তান তবে হীতেন্দ্রকে সে মানুষ করেছে। বর্তমানে বিদ্যুৎলতার সঙ্গে তার সংসার এবং একটি শিশুপুত্র আছে। তবে বিদ্যুলতার কোন শিক্ষাগত যোগ্যতার পরিচয় না থাকলেও তার পড়তে পারার দক্ষতা দেখা যায় এবং কথায় কথায় ইংরেজি বলার প্রসঙ্গ আমরা উপন্যাসে দেখতে পাই যার

থেকে ভাবাই যায় সে শিক্ষিতা। বিদ্যুলতার পরিবারে আছে দুই ভাই কৌতুক চন্দ্র এবং প্রশান্ত চন্দ্র এরা কলকাতার স্কুলে পড়াশোনা করে তাই হোস্টেলে থাকে আর সব থেকে ছোট ভাইটি বাবা মার সঙ্গে কর্মস্থলে থাকে। যাইহোক রচনায় মাঝে মধ্যে বিদ্যুৎলতাকে হিতেন্দ্র নানা রকম ভাবে ছোট করে, বিশেষ করে বুদ্ধির দিক থেকে। এই বিষয়টা বিদ্যুৎলতার ভালো লাগেনা তাই মুখে কিছু না বললেও একবার চুপি চুপি হিতেন্দ্রকে শায়েস্তা করার ফন্দি করে এবং বসে বসে মজা দেখে যে এত বড়াই করা লোকটা বিপদে পড়লে কি করে, এটাই বিদ্যুৎলতা দেখে এবং হিতেন্দ্রর সামনে প্রমাণ করে দেয় হিতেন্দ্রের নাকানী চোপানি হওয়ার বিষয়টা। এইরকমই বহু প্রসঙ্গ আমরা উপন্যাসটি আলোচনা করলে দেখতে পাবো।

পুরো রচনা হিতেন্দ্র ও বিদ্যুৎলতার খুনসুটিতে পরিপূর্ণ। শুরুতে একটা লাইব্রেরী ঘরে বই পড়ার দৃশ্য বর্তমান। তাদের কথাবার্তা থেকে বোঝা যায় ডাক্তারি বিদ্যার সাথে সাথে সাহিত্য বিষয়ে হিতেন্দ্রর দখল আছে, এছাড়াও ধূমপানের নেশা আছে তার। এই অভ্যাস সে ছাড়তে পারেনা। তার মধ্যে পুরুষসুলভ একটা অহংকার বর্তমান, কথায় কথায় বিদ্যুৎলতাকে বুদ্ধির দিক থেকে ছোট করে এবং বিভিন্ন বিষয়ে তাদের নানারকম তর্ক চলতেই থাকে। এভাবেই একদিন স্ত্রীর বুদ্ধিকে ছোট করার জন্য তাকে বলে-

> "গ্রে সাহেবের অ্যানাটমী টা মনে আছে? সেই মগজ নিয়ে তর্ক?... স্বীকার করছ কি ছ আউন্স ওজনের তফাৎ আছে?" ৮০

এইভাবে ব্রেন নিয়েও মেয়েদেরকে ছোট করার মানসিকতা দেখা যায় হিতেন্দ্রের মধ্যে কেবলমাত্র মেয়েদের ছোট করতে পারাটাই তার কাছে যেন আনন্দ লাভের উপাদান।

এরই মাঝে একদিন বিদ্যুৎলতার দুই ভাই কৌতুক চন্দ্র ও প্রশান্ত দুজনে হিতেন্দ্রর বাড়ি আসে। এখানে যখন আসে তখন দেখে একটা অনামা লেখকের 'আমার বিদ্যে' নামক একটা প্রবন্ধ নিয়ে দিদি আর জামাইবাবুর মধ্যে কথাবার্তা হচ্ছে। প্রবন্ধ পড়ে প্রবন্ধ লেখা থেকে হিতেন্দ্রের এমন মনে হয়েছে যে পুরো লেখাটা তাকে নিয়েই যেন লেখা হয়েছে। তাই ওই পত্রিকার প্রকাশকদের কাছে গিয়ে যেন তার প্রশ্ন করতে ইচ্ছে করে যে তাকে নিয়ে এমন কেন লেখা। কিন্তু সেই সাহস নাই কারণ জিজ্ঞাসা করতে গেলেই লেখার মূল নায়ক এবং সঙ্গে সঙ্গে তার চরিত্র বৈশিষ্ট্যও সবার সামনে প্রকাশ হয়ে যাবে তাই তার রাগ হলেও কিছু করতে পারে না। ওই দিনের মতো কৌতুক ও প্রশান্ত চলে যায় তবে রবিবারে আসার একটা জায়গা তৈরি করে রেখে যায়।

যথারীতি রবিবার নিমন্ত্রণ রক্ষা করতে কৌতুক ও প্রশান্ত তাদের বাড়ি আসে এবং সঙ্গে বন্ধু অজিতকেও নিয়ে আসে। আর এদিকে হিতেন্দ্রের থেকে বয়সে বড় তার দূর সম্পর্কের ভাগিনেও শিবচন্দ্র সেও আসে। আর সেদিনই একটা চিঠি নিয়ে ঘরে হুলস্থুল কান্ড বেঁধে যায়। সেদিনের আড্ডা এই একটা চিঠিতে নষ্ট করে দেয়। চিঠিতে ঘড়ি চুরি গিয়েছিল, হিতেন্দ্রের সেই ঘড়িকে নিয়ে নাম্বার সহ হেদুয়াতে তাকে দেখা করতে বলে ফেরত দেবার জন্য। এই নিয়ে তাদের মধ্যে আলোচনার শেষ থাকে না এবং ব্যাপারটাকে নিয়ে তারা খুব সিরিয়াস হয়ে যায়। প্রথমে শিবচন্দ্র তাকে দেখা করতে যেতে বারণ করে এবং নিজে ব্যাপারটা একটু তার বন্ধুর সঙ্গে আলোচনা করে দেখতে চায়। যথারীতি আলোচনা সেরে এসে হিতেন্দ্রকে জানায় এটা পাঞ্জাবি ডাকাতের দলের লোক। এদিকে বাড়ির মেয়েরা কিন্তু এই বিষয়টা নিয়ে একদম উদগ্রীব নয়। তাই মামীমা ও দিদা শিব চন্দ্রকে খেতে বলে আর বাহাদুর সিং এর চিঠি নাকি ঠাট্টা এসব বলে। দিদা, চিঠিটাকে ঠাট্টা বললে শিব চন্দ্র রেগে যায় এবং বলে-

"মেয়ে মানুষের বুদ্ধি কিনা! আপনি আর বেশি কি বুঝবেন?" ৮১

এভাবে তার ভাগনার কথাতেও মেয়েদেরকে ছোট করার একটা মানসিকতা দেখা যায়। একবার ঠাট্টা বলেছে বলে, দিদিমা সেটা বিশ্বাস করে নেওয়ায় মেয়েদের অল্প বুদ্ধি বলতেও তার বাঁধে না এই হীন ভাবার ছবি রচনায় মাঝেমধ্যে দেখতে পাওয়া যায়। তবে এত তর্কের পর অজিত খুবই উদ্গ্রীব হয়ে যায় আসল রহস্য কখন উদঘাটন হবে এটা জানার জন্য তাই ঠাট্টাই হোক আর যাই হোক এখন সে আসল ঘটনা জানতে চায়। এই জন্য শিবচন্দ্রকে প্রত্যক্ষ প্রমাণ দেবার কথা বললে শিবচন্দ্র ছোকরা উচ্ছন্নে গেছে বলে জানায় হিতু মামাকে এবং অজিতকে সম্বোধন করে আরও বলে-

"ওহে অজিত বাবাজি,- ভালো মুখেই গোড়া থেকে সাবধান করে দিচ্ছি,- মেয়েদের কাছে যদি খাতির চাও- তবে গোড়া থেকেই ও জাতটাকে প্রাণপণে অশ্রদ্ধা করতে অভ্যাস কর। না হলেই,- মরেছ!" ৮২

তবে অজিত মেয়েদের সম্পর্কে কোন বিদ্বেষ প্রকাশকে কাপুরুষতা জানালে শিব চন্দ্র তার এই উন্নত ভাবনা দেখে ফৌজদারী আদালতের প্রসঙ্গ আনে যেখানে নাকি মেয়েদেরকে যথার্থ চেনা যায়। তবে সমস্ত কথা বাদ দিয়ে আবারও তারা ডাকাতের প্রসঙ্গে কথা বলতে শুরু করে। ডাকাত নিয়ে ভাবনা চিন্তা করে পুলিশ কনস্টেবল মোতায়েন রাখে। এখানে বাড়ির মেয়েরা বেশ চিন্তামুক্ত বলে মনে হয়। যেদিন কনস্টেবল মোতায়েন রাখা হয় সেদিন কোন বিপত্তি ঘটলো না অন্য একদিন বাড়ির বাইরের গলিতে একটা বিকৃত আওয়াজে সবাই চমকে যায় জানলার দিকে গরিলার মত কিছু একটা দেখা যায় সবাই বেশ কিছুক্ষণ এদিক সেদিক খোঁজাখুঁজি করল, অবশেষে সেই আওয়াজ অনুসরণ করে বিদ্যুৎলতার ঘরের দিকে এগিয়ে যায়। সবশেষে বোঝা গেল বাহাদুর সিং সেদিনও আসেনি, ছদ্দবেশী বাহাদুর সিং সেজেছিল তার ভাই কৌতুক চন্দ্র সঙ্গে তার বন্ধু

অজিতও ছিল। এরকম ঘটনা কেন তারা ঘটালো, এই প্রশ্ন শিবচন্দ্র ও হিতেন্দ্র এদের মনে জাগলে তার উত্তরে কৌতুক বলে -

> "মেয়েদের বুদ্ধি বিবেচনার ওপর যে আপনাদের অগাধ অশ্রদ্ধা। সেইটেই যে আপনাদের পৌরুষের প্রধান লক্ষণ গো! ওই স্লাঘাটুকুর দাপটেই যে পৃথিবীতে অবাধে দস্যিবিত্তি করে বেড়াতে পারছেন গো! এখন আবার উলটো সুর কেন? পৌরুষ জাহির করা গেল কোথায় এখন?" ৮৩

এভাবেই যারা সব সময় বিদ্যাবুদ্ধির বড়াই করে বিপদে পড়লে তাদের অবস্থাটা কেমন হয় এটাই দেখা আসল কাজ ছিল। সঙ্গে বিদ্যুৎলতাও তাদের দলে ছিল। এই সময় মনে মনে তাদের যতই রাগ হোক এই রকম ভাবে সবার সামনে এই মুহূর্তে অপমান হওয়া ছাড়া আর তাদের কিছু করার ছিল না। এভাবে বিদ্যুৎলতাকে এক ব্যক্তিত্বময়ী নারী রূপে দেখা গেছে যে অন্যের কথায় নিজেকে ছোট কখনো মনে করে না, প্রকাশ্যে কিছু না বললেও তার জবাব ঠিক দিয়েই দেয়। এভাবেই বিদ্যুৎ লতা চরিত্রকে এক অন্যরকম মাত্রায় আমরা দেখতে পেলাম।

বাহাদুর শিং এর প্রসঙ্গ আপাতত ইতি টানলো তবে হিতেন্দ্রের মনে এক প্রশ্ন থাকে বিদুৎলতার অজানা এক 'সই' য়ের প্রসঙ্গ নিয়ে। মাঝেমধ্যেই ঠিকানা জানতে চাইতো হিতেন্দ্র এবার সেই রহস্য উন্মোচনের পালা। এই সই আসলে আর কেউ নয় বিদ্যুৎলতা নিজেই, বিদ্যুতের নিজের মধ্যেই ওই সই এর অস্তিত্বের কথাটা জানাতে স্বামীকে একটা ছোট কবিতার মাধ্যমে লেখে-

> "তারে ধরবে কোথা মুঠোর মাঝে
>
> বিদেহী সে নেহাত বিদেশী।
>
> তারে দেখবে কোথা, চোখের দেখায়

সে যে দূরের সুদূর প্রবাসী!

ঠিকানা তার চাইছ কোথা?

নাইক ত সে সবাই যেথা।-

কোলাহলে উধাও সে যে,-

বিরাগী সে,- বিষম উদাসী!

বাকচাতুরির হট্টগোলে

মেলে না তার মোটেই পরিচয়

ভিড়ের মাঝে চিনবে কারে

অচিন্ জনার চিহ্ন সে তো নয়!-

তড়িৎ চমক চকিত লেখা,

যখন খুশি যায় না দেখা,

অকস্মাতের মাঝখানে সে

উঠে হঠাৎ- হঠাৎ উদ্ভাসি!" ৮৪

এই ভাবেই সই তার নিজের প্রয়োজনেই তৈরি। বিদ্যুৎ পুরো উপন্যাসটা জুড়ে স্বামীর কথার উত্তরে কেবল উত্তর দিয়েছে, স্বামী তাকে তার মতো করে বোঝার চেষ্টাও করে না এই জন্যই এই সমস্ত কিছুর গণ্ডি অতিক্রম করে তার নিজের মনের কথা বলার জন্য যেন কাউকে প্রয়োজন হয় আর সেই প্রয়োজন মেটানোর জন্যই এই সই চরিত্রের অবতাড়ণা। এই ভাবেই পুরুষের পুরুষত্বের অহংকার বিদ্যুতের মনে একটুও আঁচড় কাটতে পারেনি সে নিজের মনকে নিজেই শান্তি দেওয়ার দায়িত্ব নিয়েছে। এমনি করেই

সাংসারিক কলহ, সাংসারিক জীবন, তর্ক, সমস্ত কিছুর বাইরে গিয়ে বিদ্যুৎলতা চরিত্র যেন এক অন্যভাবে ধরা দিয়েছে। এরকম ভাবেই শৈলবালা ঘোষজায়া এক চাপা সাসপেন্স এর মধ্য দিয়ে পুরুষত্বের অহংকার, নারীকে হীন ভাবার মানসিকতা, নিজের মধ্যে নিজেকে খুঁজে নেওয়ার ঘটনা এবং প্রতিবাদের এক অন্য ভাষা এই উপন্যাসে দেখিয়েছেন।

'শঠে শঠ্যাং' গল্পে রবিবার মধ্যাহ্নভোজনের পর কোন কাজকর্ম না থাকায় গল্পের কথককে মনোযোগ দিয়ে খবরের কাগজ পড়তে দেখা যাচ্ছে। সারা সপ্তাহের সঞ্চিত দৈনিক, সাপ্তাহিক, মাসিক পত্রের সম্ভার নিয়ে বসার ঘটনা দিয়ে গল্প শুরু। এ কাগজে নানা রকম খবর পড়ে শেষে নিজেদের লেখালিখির খবরে এসে যখন দেখতে পায় সামাজিক অবস্থা ব্যবস্থা, বিধি- বিধান নিয়ে কিছু লেখা, সেখানে কথকের চোখে পড়লো কয়েকটি কথা যেখানে বলা থাকে-

"প্রচলিত বিধিবন্ধনের যেখানটা কালের ঘর্ষণে ক্ষয়প্রাপ্ত হইয়াছে এবং শাসন- কসন যেখানটায় ঢিলা হইয়া পরিবার যো হইতেছে, সেখানে নতুন লাগাম কসিবার বন্দোবস্ত উৎসব।" ৮৫

পড়তে গিয়ে দেখল যে এই বিধি-বিধান নিয়ে বেশ জমকালো করেই লেখা হয়েছে এবং সেখানে মেয়েদের সমস্যা নিয়েই লেখা হয়েছে। লেখিকা নারীকে বেওয়ারিশ বলছেন বলার কারণ হিসেবে তিনি বলেছেন-

"বে ওয়ারিশ বলিতেছি এইজন্য যে- এ সমস্যাটার বিচারে যার যেমন খুসী তিনি তেমনি কর্তৃত্ব করিতে পারেন- বাধা দিবার কেহ নাই।" ৮৬

লেখাটার মধ্যে দেখা যায় মেয়েদের উন্নতি নিয়ে কেউ একজন আপত্তিকর মন্তব্য করেছেন। সমাজে সে সময় মেয়েদের কি রকম ভাবা হতো সেই বিষয়টা লেখিকার

উপরের উক্তিটি থেকে আমরা আগেই পেলাম। এরপর মেয়েদের উন্নতির জন্য যদি কিছু বিধানের প্রসঙ্গ আসছে তাতে একদল মতামত দিচ্ছেন, একদল মতামত দিচ্ছেন না, এভাবেই আমাদের সমাজ এগোচ্ছে। এই সময় মেয়েদের অবস্থা বর্ণনা দেওয়ার জন্য তাদেরকে জগন্নাথের সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে অর্থাৎ কোন ভাবনা-চিন্তা, সিদ্ধান্ত নেওয়ার ক্ষমতা যার নেই। এমনকি মেয়েদের সঙ্গে হওয়া অন্যায়ের প্রতিবাদ করলেও যিনি প্রতিবাদ করতে যাবেন তার কপালেও জুটত অনেক কষ্ট তাই লেখিকা বলেছেন-

"বাস্তবিক, এই দুনিয়াটা নির্জলা জুলুমের রাজত্ব। এখানে যার জোর আছে,- মুলুকের মালিক হইবার অধিকার মাত্র- তারই।" ৮৭

এই কথায় আমাদের সমাজের চেহারাটা পরিষ্কার ভাবে নজরে এলো। যাইহোক আবারও পত্রিকার সেই লেখার কথায় ফিরে যাই সেখানে ছিল মেয়েদের উন্নতির জন্য যে সমস্ত বিধান আছে সেগুলোকে সমর্থনকারী একজন লেখিকার উদ্দেশ্যে জঘন্য শ্লেষ বর্ষণ করে লেখা প্রবন্ধ। যিনি ব্যঙ্গ করে প্রবন্ধটা লিখেছেন তার নাম দিয়েছেন সুনিলা দেবী। পড়া শেষ করে লেখিকা সম্পর্কে যেই একটু ভাবছিলেন কথক, সেই সময়েই তার কাছে ভৈরব বাবু এলেন। শুরুতেই ভৈরব বাবুর একটু পরিচয় দিয়ে দেওয়া যাক ইনি কথকের প্রতিবেশী, শিক্ষিত, পত্রিকার লেখক এনার চালচলন পল্লী গ্রামের নেকা মেয়ে সুলভ। তিনি কথকের কাছে ঐ বিশ্ববার্তার লেখাটা পড়েছে কিনা জানতে চায় এবং ঐ পত্রিকার রমরমার কথাটাও জানান। পড়া হয়ে যাবার খবর শোনামাত্রই কেমন হয়েছে এই নিয়ে তার আগ্রহ খুবই দেখা যায়। যে পত্রিকায় তারা লেখেন নাম হচ্ছে বিশ্ব বার্তা এখানে এই লেখালেখির জন্য বেশ নাম আছে পত্রিকাটার। প্রথম শ্রেণীর পত্রিকা। কেমন হয়েছে আগে জিজ্ঞাসা করেছিলেন তার উত্তরে যখন বললেন মেয়েদের কথা নিয়ে এরা একটু বেশি যেন অনধিকার চর্চা করে ফেলছেন বলে কথকের মনে হচ্ছে, এটা জানালে ভৈরব বাবু

একটু ক্ষুন্ন হন। ভৈরব বাবুর সম্পর্কে এই প্রসঙ্গে আরেকটি কথা বলে নেওয়া যাক ইনি প্রথম জীবনে আধুনিকতার উপাসক ছিলেন সেই সূত্রে তাঁর গুটিকতক বিবাহ এবং গুটিকতক সন্তান লাভের প্রসঙ্গ দেখা যায় গল্পে। আবার পণপ্রথার কথাও দেখা গেছে তিনি পণপ্রথার বিরুদ্ধে বিরোধিতা করেন কিন্তু শুধু নিজের কন্যার বিয়ের সময়। পরের কন্যা ঘরে আনার সময় কিন্তু পণ প্রথার উপর তার শ্রদ্ধা দেখা যায়। এমনকি নিজের সংসারের দায়িত্ব তিনি শ্বশুর ঘরের ওপরই চাপিয়ে থাকেন সব সময়। এই ঘটনাগুলো আমরা গল্পের মধ্যে দেখতে পেয়েছি। এনার চরিত্রটা আরো স্পষ্ট হবে লেখিকার লেখা উক্তিতে-

"নিজের কন্যার বিবাহ প্রসঙ্গে পণপ্রথার বিরোধী। কিন্তু পরের কন্যাদের বিবাহ করিয়া গৃহে অনিবার সময় তিনি পণপ্রথার উপর প্রগাঢ় শ্রদ্ধাবান।" ৮৮

কথকের লেখা নিয়ে যেমন উত্তর দিয়েছিলেন তা পছন্দ হয়নি তাই কিছুক্ষণ একটু অল্প কথা বলে আবারও লেখা নিয়েই জিজ্ঞাসা করতে থাকলেন ভালো না লাগার কারণ, এমনকি সবাই যে লেখাটা ভালো বলছে সেটাও জানালেন। লেখাটা নাকি বেশ নাম কামিয়েছে, এসব বলতে থাকেন। কথক লেখা নিয়ে ভালো না লাগার কথা বললেও বার বার ভৈরববাবু উৎসাহের সঙ্গে একই প্রশ্ন করতে থেকে বলেন-

"কেমন পড়লেন বলুন দেখি? '...কে 'আচ্ছা জুতো দিয়েছে নয়? খাসা লিখেছে নয়?" ৮৯

এইরকম ভাবেই নিজের আনন্দোচ্ছাস বারবার প্রকাশের পর অবশেষে বলেই ফেললেন লেখার আসল ইতিবৃত্ত। এই সুনিলা দেবী তাঁর ছোট মেয়ে টেঁপি, ওর নাম সুনিলা দেবী। কথক আবারও বলল আপনার মেয়ে লিখেছে বলে তো মনে হয় না সেই উত্তরে ভৈরব বাবু বললেন-

"মেয়েদের গালাগালি দিতে হলে মেয়েদের নামের আড়ালে আশ্রয় নেওয়াই নিরাপদ। নইলে পুরুষদের কেউ পাল্টা জবাব দিয়ে বসতে পারেন! বুঝলেন দাদা, এ হচ্ছে একটা বেষ্ট্ পলিসি!" ৯০

তখনই তার নীচ মানসিকতার পরিচয় পাওয়া গেল।

এরপর গল্পে আসে অমূল্যর প্রসঙ্গ যে বিশ্ব বার্তা কাগজে বর্তমানে লেখালেখি করে। এই খবর ভৈরব বাবুর সামনে এলে সেটাকে ঠিক ভালো ভাবে মানতে পারেনি। তাই এই ব্যাপারেও সে ব্যঙ্গ করে বলে-

"নরা হরা যে খুশি সেই আজকাল লিখছে! বাংলা সাহিত্যটার আর জাত রাখলে না দেখছি।" ৯১

উত্তরে অমূল্য জানায়-

"সাহিত্য সাধারণের সম্পত্তি।" ৯২

এ কথার পরও ভৈরব বাবু শান্ত হলেন না। তিনি আবারও নিজে বিয়ে পাস পত্রিকার বড় লেখক তাই তিনিও লিখবেন আর একজন রাস্তার কয়লা ওয়ালাও লিখবে তা কেমন করে হবে এটা বললে অমূল্য জানায় যদি তার দক্ষতা থাকে লেখার তাহলে সেও লিখতে পারে এ কথা শুনে ভৈরব বাবু রেগে যান। আবার তিনি একই মানসিকতা নিয়ে বলেন-

"মেয়েদের বেশি লেখাপড়া শেখা আর সমাজের সর্বনাশ করা,- একই কথা।" ৯৩

এভাবে মেয়েদের উপন্যাস, নাটক পড়া নিয়েও বিরুপ মন্তব্য করেন। এই সমস্ত পড়ার কারণে মেয়েদের উশৃঙ্খলতা বেড়ে যাচ্ছে এমন তিনি ভাবছেন। আসলে মেয়েরা উচ্চশিক্ষিত এবং লেখালেখির জগতে গেলে তাদের মতো লোকেদের লেখা হয়তো সুনামের আওতায় আসবেনা এই ভয় ভৈরব বাবুর মধ্যে কাজ করে। মেয়েদের কবিতা পাঠ করার অধিকার সংক্রান্ত বিল পাস হলে তাতেও ভৈরব বাবু খুশি হয় না।

এত সমস্ত কথা বলার পরও ভৈরব বাবু তাঁর লেখা নিয়ে বড়াই করতে ছাড়ে না। আবার সেটা অমূল্যকে ভালো করে পড়তে বলে। অপমানিত হয়ে এতটাই মন থেকে ক্ষুন্ন হয়েছেন যে লেখাটি তার মেয়ের ছদ্মনামে সে নিজে লিখেছে কথকের কাছে এই স্বীকার করে নেওয়ার কথাটা ভুলেই গেছেন। তাই অমূল্য কথকের ভাগ্নার বন্ধু জেনেও তার কাছে মিথ্যা বলে, কেমন হয়েছে লেখা সেটা আবার জানতে চায়। এবারে আর সহ্য করতে না পেরে কথক ভৈরব বাবুকে বললেন-

"ইনি যে মেয়ে মানুষ নন, সেটা আপনি ভালই জানেন।" ৯৪

এই উত্তরে ভৈরব বাবুর আর কিছু বলার থাকে না। একেবারে মুখের ওপর যোগ্য জবাবটা কথক দেন। অনেক আগে থেকেই অমূল্য কি লিখেছে সেটা জানার আগ্রহ তাঁর ছিল এবং সে নিয়ে অনেকবার লেখাটি দেখার ইচ্ছা প্রকাশ করেছেন। তবে তাকে বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয়নি কিন্তু সবশেষে অমূল্য যখন বলে-

"কপিত্ব বিকাশক ন্যাকামি প্রকাশের দুচেষ্টা ছেড়ে বাস্তব জগত সম্বন্ধে জ্ঞান অর্জন করতে, এবং ব্যক্তিগত ঈর্ষা-বিদ্বেষ ছেড়ে তাকে মনুষ্য জনোচিত কাণ্ডজ্ঞান স্মরণ রেখে চলতে অনুরোধ করেছি। অপরের শক্তি-মত্তায় হিংসা করে, তিনি নিজে যে সকলের অশ্রদ্ধেয় হচ্ছেন সে কথাটা তার কান্ডজ্ঞানের এলেকায় আসেনি- বন্ধু ভাবে তাই একটু সৎপরামর্শ দিয়েছি।" ৯৫

এভাবেই গল্পের শেষে ভৈরব বাবুর মুখ একেবারে ম্লান হয়ে যেতে দেখা যায়। মেয়েদের শিক্ষাকে সমর্থন করা না করা এর মধ্য দিয়েই পুরো রচনাটা পরিণতির দিকে এগিয়েছে। এই গতিময়তার পথে বাধা দানকারী লোককেও যেমন পাওয়া গেল, সেরকম সমর্থনকারী মানুষজনও দেখা গেল। এই দুই আধারেই লেখিকা মেয়েদের শিক্ষা সংক্রান্ত অবস্থাটা এবং পুরুষতান্ত্রিক সমাজে মেয়েদেরকে গৃহের মধ্যে আবদ্ধ রাখতে চায় এই মানসিকতা

আবার উঠে এলো এই রচনায়। এইভাবেই পণপ্রথা, বহুবিবাহ মেয়েদের শিক্ষা এই সমস্ত বিষয়কে কেন্দ্র করে তিনি এই গল্পের মধ্যে সমাজকে তুলে ধরেছেন।

'মহিমা দেবী' (১৩২৭, বঙ্গাব্দ) উপন্যাসটিতে রাজ বিদ্রোহ, হিংসা, প্রবঞ্চনা, ভাই ভাই বিরোধ, কলহ, যুদ্ধ, স্বার্থপরতা, শিক্ষা, জহর ব্রত, সতীদাহ প্রথা, রাজপুত যুদ্ধনীতি এবং যুদ্ধের বিভিন্ন পরিস্থিতি ইত্যাদি বিভিন্ন রকম বিষয় আমরা দেখতে পাব আলাউদ্দিনের বিশ্বাসঘাতকতা এবং স্বার্থপরতার মোড়কে ঢাকা এই উপন্যাসের মধ্যে। একদিকে দেখতে পাব দিল্লির সিংহাসন অন্যদিকে রাজপুত রাজসভা। কিভাবে কথার মার প্যাঁচে এক একটা চরিত্রকে নিজের করায়ত্তে করে ভাইয়ে - ভাইয়ে দ্বন্দ্ব লাগিয়ে রাজত্ব বিস্তার করতে হয় সেই ছবি আলাউদ্দিন চরিত্র কে কেন্দ্র করে দেখতে পাওয়া যায়। আছে সতীদাহ প্রথা, দিল্লি সিংহাসন এর বর্ণনা, আর পাশাপাশি রাজপুতদের সাহস, নির্ভীকতা ইত্যাদির পরিচয়। ঐতিহাসিক কাহিনীর আশ্রয়ে লেখিকা বিভিন্ন বিষয়কে তার উপন্যাসে উপস্থাপনা করেছেন, এখন কাহিনীটি আলোচনা প্রসঙ্গে সমস্ত বিষয়গুলি আমরা এক এক করে দেখতে পাব।

আলাউদ্দিন খাঁ দায়িত্বপ্রাপ্ত হওয়ার আগের কিছু ঘটনা বলে নেওয়া যাক, সম্রাট জালালুদ্দিন যখন দিল্লীর সিংহাসনে ছিলেন তখন ভ্রাতুষ্পুত্র আলাউদ্দিন ও ভাগ্নেয় মহবুব খাঁ এদের দুজনকে রাজকার্য পরিচালনার দায়িত্ব দেন। রচনায় আলাউদ্দিনকে কূটনীতির দাসত্ব রূপে দেখা গেলেও মাহবুব খাঁকে মানবতা সম্পন্ন, পরোপকারী, সৎ হিসেবে দেখা গেছে।

রচনার শুরুতেই দেবগিরি দখলের কথা আছে। আলাউদ্দিন খিলজী মাহবুবের ভাইকে ও মুলতানের রাজসাহেব ভূপসিংহকে নিয়ে জোট বাঁধে, ভূপসিংহের দুই ভাই

আছে তাদের মধ্যে শুদ্ধেন্দু সিংহ জয়সলমেরের রাজকন্যা মহিমা দেবীর পাণিপ্রার্থী ছিলেন। তবে তার ভাই ভুপসিংহ এই বিষয়টা ভালো চোখে দেখেননি। এইজন্য ভাইদের অনুপস্থিতিতে ভূপসিংহ আলাউদ্দিন খিলজীকে সহযোগিতা করেছিল তাদেরই রাজত্ব দখল করে নেওয়ার জন্য। বিনিময়ে আলাউদ্দিনের কাছ থেকে ভাইদের সঙ্গে লড়বার মতো সাহায্য চেয়েছিল।

এইভাবেই ভাইদের প্রতি ভূপসিংহের হিংসাত্মক মনোভাব আলাউদ্দিন খিলজির পথের পাথেয় হয়ে উঠেছিল। তবে মহবুব খাঁ ভূপসিংহকে বোঝানোর চেষ্টা করে ভাইয়ে ভাইয়ে শত্রুতা যাতে না করে। এই কথাও ভূপসিংহের ভালো লাগেনা, তখন মহবুবের ভাই ইসমাইলের সঙ্গে দল পাকায় ভাইদের সঙ্গে বিরোধ করার জন্য। তবে মহবুব খাঁ নিজের অসৌজন্যতার জন্য মার্জনা চেয়ে ভূপসিংহ কে জানায়-

"নিজের ভাইয়ের মাথার উপর অন্যায় বিদ্বেষের খড়গ উত্তোলনে সহায়তা করবার জন্যে, পরের কাছে কপট ভাতৃ স্নেহ ভিক্ষা করা, আপনার মত মহৎ বংশজাত ব্যক্তির শোভা পায় না।" ৯৬

এই কথা ভূপসিংহের ক্রোধকে আরও বাড়িয়ে দেয়।

সর্বক্ষণ কি করে মহবুব খাঁকে ফাঁকি দিয়ে তার ভাই ইসমাইলকে হাত করে তার সঙ্গে যুদ্ধে নামানো যায় সেই চেষ্টাই ভূপসিংহ এখন করতে থাকে এই জন্যই ইসমাইলের সঙ্গে দেখা করে ইসমাইলের সুখ্যাতি করে এবং মহবুবের নামে নালিশ করে। এরকম করে একটু একটু করে ইসমাইলের মনটা জিততে থাকে। এইভাবে দুজনে একটু ভাব জমলে সেনা নায়ক নুরুদ্দিন কে সিরাজি আনতে বলে, দুজনের পরামর্শ দেখে নুরুদ্দিন ইসমাইলকে উদ্দেশ্য করে বলে-

"নাবালকটি সদ্য অধঃপাতে যাবার পথ ধরেছে!- হুঁ!" ৯৭

ভূপসিংহ একটু একটু করে এইভাবেই ইসমাইলকে উস্কানি দিতে থাকে। প্রথমেই তাকে বলে দাদা দিলেও যা আর আপনি দিলেও তো একই কথা তাই সৈনিকদের অনুমতি দিয়ে আমাকে লড়াইয়ে সাহায্য করুন একথা শুনে আবেগে ইসমাইল সেনা প্রস্তুত করতে বলে তখন সেনা নায়ক বলে-

" দাস আজ্ঞানুবর্তী। কিন্তু নবাব সাহেবের কঠোর আদেশ,- নিরপেক্ষ, নিরস্ত্র, বালক, বৃদ্ধ ও স্ত্রী লোকের উপর কোন অত্যাচার করলেই, সৈন্যদের প্রাণ দণ্ড হবে। সুতরাং এ ক্ষেত্রে-" ৯৮

তার কথার এমন অমান্য হলে ইসমাইল আবারও রেগে যায় এবং সিরাজির পাত্র থেকে মাদক নিয়ে খেতে শুরু করে এবং সেনা নায়ক তার আদেশ না মানার জন্য বেয়াদব বলে গালিগালাজ করতে থাকে। ইসমাইলের এইরকম অপ্রকৃতিস্থ মন অসাধ্য সাধনের জন্য জেদ ধরে। মনে মনে ভাবে দেবগিরি জয়ের পর ধন রাশি লুঠ করবে এবং বুদ্ধি বলে কর্তৃপক্ষের চোখে ধুলো দিয়ে দেবে, এমন পণ নেয় মনে মনে। এভাবেই ক্রোধের বশে ইসমাইল ভূপসিংহের পক্ষ নেয়।

অপরদিকে মহবুব খাঁ আলাউদ্দিনকে ভূপসিংহকে সাহায্য করতে বারণ করলে সরাসরি আলাউদ্দিন মহবুবকে কিছু জানায় না কারণ ২০০০ খোরশানী সৈন্য মহবুবের আছে যেটা খসে গেলে আলাউদ্দিনের বড় বিপদ, তাই চুপ থাকে। সবাইকে বজায় রেখে আলাউদ্দিন নিজের উদ্দেশ্যকে চরিতার্থ করতে চায়। এমনকি ভূপসিংহ ও ইসমাইল যে দল পাকিয়ে দেবগিরির উদ্দেশ্যে যাত্রা করেছে যুদ্ধ করার জন্য সেটা আলাউদ্দিন জানলেও মাহবুব জানতো না, আলাউদ্দিন ওকে জানাতেও চায়নি ।

এভাবে আলাউদ্দিনের সঙ্গে নিষেধের কথা বলে ভাই ইসমাইলের পিছু নেয় মহবুব। কিন্তু ওদিকে ইসমাইল ও ভূপসিংহ দুজন মিলে বিনা প্রস্তুতিতে বিবাহ থেকে

ফেরত আসার সময় পূর্ণেন্দু সিংহকে অসহায় ভাবে হত্যা করে ফেলে। তারপরে ইসমাইল নিজের শক্তির মত্ততায় যখন আত্মহারা হচ্ছিল ঠিক সেই সময় দুই একজনকে (শুদ্ধেন্দুদের) বাঁচায় এবং পূর্ণেন্দু সিংহের মৃতদেহ ভাইদের কাছে পাঠায়। এদিকে মহবুবের ভয়ে এরা ফিরে এসে শত্রু সংখ্যার খবর দিতে আলাউদ্দিনের কাছে সেনারা এসে জানায় আলাউদ্দিনের পক্ষের ৫২ জন আহত, সাতজন মৃত। শুদ্ধেন্দুদের ১৮ জন মৃত, দুজন আহত । এইরকম হিসাব শুনে ২২ জনের থাকার কথা উল্লেখ করে আরো দুজন কোথায় জানতে চাইলে বাকি দুজনকে দিয়ে আরেকজনের দেহ পাঠানো হয়েছে বলে জানায়। এরকম ভাবে চোখের সামনে ঘটতে দেখা পাশবিক তাণ্ডবকে ধিক্কার জানায়। মহবুব খাঁ কে দেখে আলাউদ্দিন সে কি চায় তা জানতে চাইলে মহবুব জানায়-

"অভিপ্রায়, দক্ষিণাপথের নবাগত আগন্তুক আমাদের,- বিশেষত আমার এই মূর্খ নির্বোধ ভ্রাতার, পর- ইঙ্গিত- নির্দিষ্ট পৈশাচিক কীর্তির অঙ্কে, একটু মনুষ্যত্বের চিহ্ন অঙ্কিত করা আর কিছু নয়।" ৯৯

২২ জন শ্রান্ত পথিকের উপর এইরকম অমানবিক প্রহার একেবারেই মেনে নিতে পারেননি তাই মর্মাহত হয়েছেন। সবশেষে এরকম ঘটনায় ক্ষিপ্ত মহবুব আলাউদ্দিন কি চায় তা জানতে চেয়েছে। প্রশ্ন শুনে আলাউদ্দিন একটুও খুশি না হয়ে মহবুবকে পুনরায় সে কি চায় জানতে চাইলে মাহবুব বলে-

"উচ্ছৃঙ্খলতাবশে বিস্তর অমানুষিকতার পরিচয় দেওয়া হয়েছে, এবার কিঞ্চিত মনুষ্যত্বের সম্মান স্মরণ রেখে চলা যাক।" ১০০

মহবুবের এই কথায় আলাউদ্দিন রুষ্ট হয় এবং এই প্রসঙ্গে সে মনে মনে ভাবে যে- সে অবৈতনিক সহযোগী পদ কেন পেয়েছে বেতনভোগী হলে সবার উপর স্বেচ্ছায় চোখ

রাঙানো যেত। এই প্রসঙ্গ থেকে তাহলে আমরা পদ অনুযায়ী ক্ষমতা কি রকম তার রূপ দেখতে পেলাম।

এরপর আবারো আলাউদ্দিন আর্যাবর্তের মধ্যপ্রদেশ, রাজপুতনায় যুদ্ধাভিযানের কথা বললে, মহবুব জানায় হিন্দু জাতিদেরকে আলস্যপ্রিয় ভেবে মুসলিম জাতি যে সাম্রাজ্য বিস্তার করতে চাইছে সেটা অত্যন্ত মর্ম বেদনার। এটা জেনে আলাউদ্দিনও রাজ ধর্মের সঙ্গে ফকির ধর্মের পার্থক্য দেখিয়ে কথা বললে, মহবুব খাঁ তারও অভিপ্রেত জানিয়ে বলেন-

"পৈশাচিক দম্ভে পৃথিবীর মানুষকে উদ্ব্যস্ত করে- সোনার পাহাড় গড়ে, তার উপর সিংহাসন পেতে বসে- গর্বিত হতে আমি চাই না- আমি চাই, নিজের মনুষ্যত্ব- বলে- পৃথিবীর সজীব মানবের- সজীব হৃদয়ের মধ্যে- শ্রদ্ধার নীড়ে- এতটুকু স্থান !-" ১০১

এভাবেই মাহবুব খা চরিত্রে আমরা মানবতার বৈশিষ্ট্য দেখতে পাই। তবে এত কথা শোনার পরেও ইসমাইলের কোন পরিবর্তন হয় না সে আসর থেকে বেরিয়ে এসে সিরাজীর পাত্র নিয়ে আবার জাঁকিয়ে বসে এই পরিস্থিতিতে আলাউদ্দিন তাকে ডাক পাঠায়।

আর অন্যদিকে ওই রাজপুতদের মধ্যে শোকের ছায়া নামে। স্বামীর শব দেহের পাশে স্ত্রীর কান্না হাহাকার শোনা যায় যা অত্যন্ত মর্মান্তিক। এইখানে এই মৃত্যু দৃশ্যের প্রেক্ষিতে আমরা দেখতে পাই সতীদাহ প্রসঙ্গ। তাই লেখিকা যখন লেখেন-

" জাতীয় প্রথামত স্বামীর শবদেহের সঙ্গে সাধ্বী চিতানলে দেহ বিসর্জন করিয়াছেন।" ১০২

তখন ওই সমাজে সতীদাহের একটা ইঙ্গিত পাওয়া যায়।

এই সমস্ত কিছুর মধ্যেই ইসমাইল ভিক্ষুক বেশে তাদের রাজ অভ্যন্তরে ঢুকে, নিজে দন্ডিত বলে তার প্রাণ রক্ষা করার জন্য শুদ্ধেন্দুর কাছে অনুরোধ জানায়। রাজপুত তার নীতি অনুযায়ী তার দ্বারে উপস্থিত প্রাণ ভিক্ষার্থীর প্রার্থনা ফেলতে পারে না তাই জন্যই শুদ্ধেন্দু আলাউদ্দিনের পরোয়ানায় জড়িয়ে পড়ে। যে পরোয়ানায় থাকে শুদ্ধেন্দু সিংহের স্বাধীনতা। তবে এই স্বাধীনতা ফিরিয়ে দেওয়ার শর্ত হিসেবে জানায় কোন এক শত্রু রাজ্য ইসমাইল সহযোগে জয়লাভ এবং রাজার কাছে তা নিবেদন। সবাই নিষেধ করা সত্ত্বেও দ্বারে আসা প্রাণ ভিক্ষার্থীর প্রাণ ফিরিয়ে দেবার জন্য এই শর্তে রাজি হয়ে যায় শুদ্ধেন্দু। তাইতো তিনি বলেন-

"ঈশ্বরের শপথ, আত্মজীবন বিনিময়ে আপনার জীবন - রক্ষায় প্রতিশ্রুত হলাম, নিশ্চিন্ত হোন।" ১০৩

এমনকি মহবুব খাঁ এসে এই সমস্ত কর্মকাণ্ডের পিছনে ইসমাইল এবং ভূপসিংহ দায়ী সেটা জানালেও শুদ্ধেন্দু আর কোনো কথাই শুনতে নারাজ কারণ সে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ তাই প্রাণ ভিক্ষার্থীর প্রাণ রক্ষা করা তার কর্তব্য। রাজপুতদের কাছে অসি ছুঁয়ে প্রতিজ্ঞা করা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ কাজ যার অন্যথা হয় না তাই তার ভাইকে এই সমস্ত কর্মকাণ্ডের জন্য মারতে উদ্যোগী হলে শুদ্ধেন্দু তাকে বাধা দিয়ে তার প্রাণ রক্ষা করার উদ্দেশ্যে বলেন-

" আপনার ভাইয়ের হৃৎপিণ্ড আচ্ছাদন করে আমার হৃৎপিণ্ড বিস্তৃত হয়েছে,- লক্ষ্য ঠিক করুন-" ১০৪

এই কথায় মহবুব খাঁ অনেক বোঝায় শুদ্ধেন্দুকে কিন্তু সে তার কর্তব্য থেকে এক চুল নড়ে না। কর্তব্যের প্রতি অবিচল থাকতে দেখে রাজপুত জাতির এই ধর্ম সম্পর্কে এবং বীরত্ব সম্পর্কে মহবুব খাঁ বলে-

" আপনাদের এ উদার সরলতাকে ধন্যবাদ দেওয়ার চেয়ে অভিশাপ দেওয়াই উচিত।" ১০৫

এইভাবে অনেক বাধা দান করার চেষ্টা করেও মহবুব খাঁ পারেনি তাঁকে সরাতে এবং তাঁর বীরত্ব দেখে অবশেষে চলেই যায়। শুরু হলো ইসমাইলকে নিয়ে শুদ্ধেন্দুর শিবিরের উদ্দেশ্যে যাত্রা। তাই মহিমা দেবীর কাছে দেখা করে, মহিমা দেবীর ভাই সাগর সিংহ ও রতন সিংয়ের আপত্তি সত্ত্বেও সহ-সৈন্য নিয়ে সুলতানের প্রাসাদের দিকে যাত্রা শুরু করেন। তারপর দেবগিরি অধিকার করে প্রচুর সৈন্য জোগাড় করে তাদের শিক্ষার ভার শুদ্ধেন্দুর উপর দেয়। অন্যদিকে মহিমা দেবী নিষ্কাম কর্মব্রতী সন্ন্যাসী হিসেবে জীবন কাটায়।

এরপর আলাউদ্দিন তার কূটনৈতিক চালের খেলা পুনরায় শুরু করে। মহবুব খাঁ এই সমস্ত কিছু দিল্লিতে জালালউদ্দিনের কাছে জানানোর জন্য বের হলে আলাউদ্দিন মহবুবের দাদা আলম খাঁর সহযোগিতায় জালাল উদ্দিনকে আগে থেকেই জানিয়ে দেয় যে কেউ যদি বিনা অনুমতিতে দেবগিরি দখলের জন্য আপনার কানে কোন কথা তোলে আপনি বিশ্বাস করবেন না আমি সাক্ষাতে গিয়ে সমস্ত আপনাকে বলব এভাবে জালাল উদ্দিন কে প্রথমে হস্তগত করে নেয় আলাউদ্দিন। তার সাক্ষাতে আসতে চাওয়ার খবর শুনে জালাল উদ্দিন নিজেই রাজধানী মালিকপুরে আসতে চায় এবং আসার সিদ্ধান্ত নিয়ে নেয়। তাকে আপ্যায়নের জন্য সাম্রাজ্যে মহা ধুম পড়ে যায়। অন্যদিকে ইসমাইলকে তার দাদার সম্পর্কে বিষিয়ে তোলে আলাউদ্দিন, তাকে ঘুমিয়ে না থেকে জাগার কথা বলে এবং জানায় তাহলে রাজত্ব ও রাজকন্যা ইসমাইলের লাভ হবে। এই সূত্রে মহবুব খাঁর পাণিপ্রার্থী আয়েশার কথা উল্লেখ করে। প্রথমে ইসমাইল এইরকম কুরুচিকর মন্তব্যে আপত্তি জানায় তখনই আলাউদ্দিন বলে-

"ধর্ম জ্ঞানের বুজরুকি রাখো ! ওগুলো নিতান্তই বিশ্রী- ভীরু কাপুরুষতা মাত্র।" ১০৬

এইভাবেই আলাউদ্দিনের খল, ঈর্ষা, নীচ মানসিকতা, ছল দেখা যায়। সে ইসমাইলের কাছে নিজের পরামর্শ কে সুপরামর্শ বললেও এই প্রথম ইসমাইল তার কথা মানতে একটু ইতস্তত বোধ করল সে নিজের ভাইকে সব জানিয়ে দেবে আলাউদ্দিনের কাছেই বলে ফেলে সঙ্গে সঙ্গে আলাউদ্দিন তার কাছে কয়েকটা পথ উল্লেখ করে জানিয়ে দেয় আজ রাতেই জালালুদ্দিনের বধ হবার পর সমস্ত রাজ্য তার ইশারায় চলবে তাই যদি মহবুবকে হত্যা করতে পারে তাহলে ইসমাইলের সমস্ত মনস্কামনা পূর্ণ হবে অন্যথায় তার পরিণতি খুব ভয়ানক হবে। এইভাবে নিজেকে ভালো রাখার কথা ভাবতে গিয়ে দাদাকে হত্যা করার মত সিদ্ধান্ত সে এক নিমেষে নিয়ে ফেলে। আলাউদ্দিনের কু চক্রান্তের শিকার হয় ইসমাইল।

পথের মধ্যে ইসমাইলকে শুদ্ধেন্দু ভ্রান্তভাবে ঘুরতে দেখে মহবুবকে সে জানালে মহবুব সেটা বিশ্বাস করতে চায় না কারণ ভাইয়ের প্রতি তার আর কোন আস্থা নেই এবং সে নিজেও বিচলিত হয়ে পড়ে। কিন্তু ওদিকে দেখা যায় আলাউদ্দিন পুরো জনগণকে জালাল উদ্দিনের নামে ভুল কথা রটিয়ে ক্ষিপ্ত করে তোলে যার ফলে জালালউদ্দিন এসে প্রবেশ করলেই তাকে প্রকাশ্য জনসভায় বধ করা হয়। এইভাবে আলাউদ্দিন তার ভয়ংকর নীচ মানসিকতার প্রমাণ দেয়।

এই খবর মহবুব খাঁ নুরুদ্দিনের মাধ্যমে পায় সঙ্গে সঙ্গে লড়াই করার জন্য ক্ষিপ্ত হয়ে উঠলেও শুদ্ধেন্দু তাকে বোঝায় যে এই সময়টা জনতা সহযোগে আলাউদ্দিন প্রচন্ড ক্ষমতাশালী তাই এই মুহূর্তে যুদ্ধ করা একদম শ্রেয় নয়। তখন ইসমাইলের চিঠির কথাও বলে, ইসমাইল ধরা পড়েছিল চিঠি সহযোগে সেটাও জানায় নুরুদ্দিন। চিঠিতে সংকটের কথা লেখা থাকলেও কি সংকট সেটা জানা যায়নি কারণ চিঠির বাকি অংশ ছেঁড়া ছিল।

অন্যদিকে ইসমাইল পলাতক। এই পালিয়ে যাওয়ার সুযোগটা আলাউদ্দিন ব্যবহার করে তার নামেও মিথ্যা রটিয়ে দেয় যে সে নাকি গুপ্ত মারফতে কিছু একটা খবর ছড়িয়ে দিতে চেয়েছিল তাই সে চিঠির টুকরোটা কেটে নিয়েছে। এইভাবে আলাউদ্দিন তার সমস্ত পরিকল্পনাগুলো এক এক করে সার্থক করে তোলে। একের পর এক করে কূটনৈতিক চাল অবলম্বন করে সার্থক হওয়াতে আলাউদ্দিনের কিছুতেই আর খিদে মিটছিল না এরপর আবারও এক চাল সেখানে নিজে শর্ত দিয়েছিল যে কোন একটা শত্রু রাজ্য জয় করলে শুদ্ধেন্দুর স্বাধীনতা সে ফিরিয়ে দেবে। কিন্তু এখন সে আবার শর্ত পরিবর্তন করেছে। বর্তমান শর্ত অনুযায়ী ছ বছর আগের টাট্টা ও মুলতান বিজয়ী আলাউদ্দিনের উপর হামলা করে রতন সিংহ ধনরত্ন সব লুট করে নিয়েছিল সেই অপমানের প্রত্যুত্তর আজ সে নিতে চায় এবং সেই কাজ শুদ্ধেন্দুকে করতে হবে তবেই সে মুক্তি পাবে, বীরের মত শুদ্ধেন্দু রাজি হয়ে যায়।

হয় শত্রুর স্বাধীনতা নয় শত্রুপুরী ধ্বংস এই উদ্দেশ্যকে মাথায় রেখে জয়সালমীরের উদ্দেশ্যে রওনা হওয়ার আগে দিল্লির অবস্থা সম্পর্কে জানতে চেয়ে জালালউদ্দিন সাহেবের বড় ছেলের মুলতানে হাওয়া খেতে যাওয়া এবং সেই সুযোগে আলাউদ্দিনের রাজধানী দখল করার খবর পায়। এসব শুনে বিচলিত না হয়ে কাজের উদ্দেশ্যে বের হয় মহবুব খাঁ ও শুদ্ধেন্দু। এখানে এসে মহবুব খাঁ প্রথমে তাদের পূর্ববর্তী যুদ্ধের কথা কিছুক্ষণ স্মরণ করে, তারপর নতুন কাজে মন দেয়।

এদিকে জয়সালমীরের মেয়েদের, অসমর্থ্য বৃদ্ধ, বালক, অকর্মনা নারীগণকে ইতিপূর্বে মরুভূমির মাঝে পাঠানো হয়েছিল নিরাপদ স্থানে। একদিকে মহিমা দেবী কুমারী জীবনেই রাজ্যের বালিকাদের নিয়ে ‘শিক্ষার্থিনী সংঘ’ গঠন করেছিলেন এবং শিক্ষা দান

করতেন। তবে এখানে শিক্ষা প্রসঙ্গে দুই বালক বালিকার কথোপকথনে বালকটি যখন বলে-

"ওই নাও, উনি মেয়ে, আমার চেয়ে পন্ডিত তুই চুপ কর, আমি বলছি-" ১০৭

তখন এই বাচ্চাদের কোলাহলের মধ্য দিয়ে লেখাপড়ায় যে ছেলেরাই শ্রেষ্ঠ সমাজের সেই কথাটি পরিষ্কারভাবে উঠে আসে। তবে সামগ্রিকভাবে এই ঐতিহাসিক কাহিনিতে যুদ্ধের যা ঘনঘটা তাতে এই শিক্ষার প্রসঙ্গ বড়ই ম্রিয়মান। যাই হোক এই বাচ্চাদের পড়াশোনার মাঝে শুদ্ধেন্দু প্রবেশ করে সাগর সিংহ তাকে চিনতে পারে সবার কাছে পরিচয় দেয় ও আবেগ বিহ্বল হয়ে তাঁকে সম্মান জানায়। যুদ্ধের নিয়ম অনুযায়ী সব সময় শুদ্ধেন্দু জয়সালমীরের অভ্যন্তরে আসতে পারবে না, কেবলমাত্র যুদ্ধ স্থগিত কালে যত্রতত্র যাবার অধিকার শুদ্ধেন্দু পেয়েছিল। এভাবে নিয়ম মেনে পুনরায় আসার কথা জানিয়ে তারা একে অপরের থেকে বিদায় নেয়।

শুরু হয় যুদ্ধ পরিস্থিতি সেখানে সৈনিকরা নিজেদের মধ্যে যুদ্ধের জন্য তৈরী। এইভাবে খাওয়া ও ঘুম হয়ে জীবনটা একঘেঁয়ে হয়ে যাচ্ছে বলে তারা একে অপরে কথা বলে। এর পাশাপাশি আলাউদ্দিনের দিল্লি দখলের খবরও পায়। এমনকি জানতে পারে বাদশা জাদা রুকন সাহেব, মা বোনদের নিয়ে বেঁচে মুলতানে বড় দাদার কাছে উঠেছে, একথা শোনা মাত্র মাহবুব খাঁকে বিচলিত হতে দেখা যায়। তবে শুদ্ধেন্দুর কথায় সে নিজেকে সংযত করে নেয়। যাই হোক এই যুদ্ধের বিরতিকালীন পর্বে মহবুব খাঁ ও রতন সিং এর মধ্যে একটা পারস্পরিক সম্পর্ক তৈরি হয় যাতে করে তারা দুজন দুজনের প্রতি আপ্লুত। আবার তারা একসাথে দেখা করার কথা দিয়ে নিজেরা নিজেদের মতো দায়িত্ব পালন করে।

হয় শত্রুর স্বাধীনতা নয় শত্রুপুরী ধ্বংস এই লক্ষ্য রেখে তারা যুদ্ধ করতে থাকে। তবে ধীরে ধীরে দেখা যায় দুর্গের মধ্যে খাদ্যের অভাব, সেখানে কেবল শাক খেয়ে জীবন চলতে লাগলো এমন পরিস্থিতিতে সাগরও যুদ্ধে নামে। এইসময় দিল্লি থেকে খবর আসে কোন এক আমির ওমরাহরা একযোগে আলাউদ্দিনের বিরুদ্ধে দাঁড়ায়, এই সময় কিছুটা বিরতি দিয়ে দিল্লির উদ্দেশ্যে যাত্রা করে সৈনিকরা। এই সুযোগে দুর্গবাসীরা কিছুটা স্বস্তি অনুভব করে। এই খাদ্য সংকটের সময় মহীমাদেবী দুর্গের অভ্যন্তরে শাক পালন করে, খাদ্যের সংকট কিছুটা কাটায়। এই পরিস্থিতির মধ্যে ঘোড়া নিয়ে শুদ্ধেন্দুকে দুর্গের মধ্যে আসতে দেখা যায়, এ সময় আবারো ক্ষুধার্ত ইসমাইলের সঙ্গে দেখা হয় তাকে দুর্গের ভিতর আসতে বললে প্রথমে ইতস্তত বোধ করলেও পরে আসে। শুদ্ধেন্দু এখানে এসে রতন সিংহের থেকে দিল্লির সমস্ত খবর জানতে পারে, তবে পরক্ষণেই এখান থেকে ইসমাইল তাদেরকে কৃতজ্ঞতা জানিয়ে বেরিয়ে যায়।

এরপর হঠাৎই দুর্গের বাইরে মুসলমান পক্ষে যুদ্ধ ঘোষণা সূচক তূর্যনাদ। দুর্গবাসী অবাক এবং মুসলমানকে মনে মনে বিশ্বাসঘাতী ভাবে। মহবুব খাঁ এটির মাধ্যমে 7000 সৈন্য নিয়ে প্রভাতেই দুর্গ আক্রমণ হবে এটা জানিয়ে চলে যায়। এবার দুর্গের মধ্যে শুরু হয় মর্মান্তিক পরিণতি মেয়েদের জহর ব্রত পালনের দৃশ্য, যেই ব্রত পালনের উদ্দেশ্যে মহিমা দেবী স্বয়ং অগ্নিকুণ্ডে ঝাঁপ দেয় যা অত্যন্ত ভয়াবহ। এরপর যুদ্ধে দুর্গ ধ্বংস হয়, বন্ধু রতন সিং এর বালক পুত্র দুটিকে মাহবুব খাঁ লালন পালনের ভার নেয়।

সবশেষে শুদ্ধেন্দু মহবুবকে বলে শর্ত অনুযায়ী আমি এখন স্বাধীন। মহবুবকে যুদ্ধের জন্য আহ্বান জানায়। যুদ্ধের নিয়ম অনুযায়ী যুদ্ধের আহ্বানে সাড়া দেওয়াই বীরের

ধর্ম। তাই মহবুব দ্বন্দ্বের জন্য প্রস্তুত হয়। শুদ্ধেন্দু মহবুবের উপর অস্ত্র চালালে প্রথমে মহবুব স্থির থাকলে শুদ্ধেন্দু বলে-

" বীর আপনি, আপনার বীরধর্মের দোহাই! ক্ষত্রিয় সন্তানকে ক্ষাত্রধর্ম পালন করে অক্ষয় স্বর্গের অধিকারী হতে দেন!- ঈশ্বরের শপথ, আঘাত প্রতিরোধ করুন।" ১০৮

এভাবে যোদ্ধার কর্তব্য প্রকাশ দেখা যায় এবং যুদ্ধের বিভিন্ন নিয়ম নীতিও আমাদের জানা হয়। সবশেষে মহবুবের অস্ত্রের আঘাতে বিদ্ধ হয়ে শুদ্ধেন্দু মৃত্যুর মুখে ঢলে পড়ে এবং ক্ষীন কণ্ঠে বলে ওঠে-

"বিশাল কর্মভূমি মর্তধাম।" ১০৯

এমনি করে আলাউদ্দিনের খলপূর্ণ চালের মধ্যে দিয়ে এবং রাজপুত জাতির বীরত্ব প্রকাশের মধ্য দিয়ে রচনায় সতীদাহ প্রথা, জহরব্রত, মেয়েদের শিক্ষা, যুদ্ধনীতি, মানবিকতা বিভিন্ন বিষয়গুলি দেখতে পাওয়া যায়। পাশাপাশি এই ঐতিহাসিক কাহিনীর মধ্য দিয়ে দুর্গ রক্ষা করার জন্য মহীমা দেবীর ত্যাগ, কর্মপরায়ণ জীবন, শিক্ষা এবং জীবন উৎসর্গের দৃশ্য দেখতে পাই যা অত্যন্ত ভয়াবহ।

এই ভাবে তাঁর রচনায় সাধারন ছাঁদের ঘরোয়া জীবনের ছবি যেমন পাওয়া যায় তেমনি বিজ্ঞান নির্ভর মানসিকতা, যুদ্ধনীতি, ডাকাতির ক্ষেত্রে ব্যবহার করা সাঙ্কেতিক ভাষা সম্পর্কে অভিজ্ঞতারও পরিচয় মেলে। পাশাপাশি মেয়েদের শিক্ষা, মানুষের স্বার্থপরতা, হিন্দু-মুসলমান প্রেম, সতীদাহ প্রথা, পণপ্রথা, বহু বিবাহ, বিধবা বিবাহ ইত্যাদির প্রসঙ্গও দেখা যায়। তবে বিধবার বিবাহ প্রসঙ্গে তিনি সাধারণ নিম্নবিত্ত কূর্মী সমাজের মধ্যে বিধবার বিবাহ না হওয়াকেই সমস্যা হিসাবে দেখাচ্ছেন। এই সমাজের মধ্যে বিধবার বিবাহ হওয়াটাকে কেউ খারাপ চোখে দেখছে না। কিন্তু হিন্দু-মুসলমান

সমাজের মধ্যে প্রেমের সম্পর্ক দেখিয়ে তিনি সাহসের পরিচয় দিয়েই খান্ত থেকেছেন বিবাহ বন্ধনে বাঁধার সাহস দেখাতে পারেননি। তাই এই হিন্দু-মুসলমান প্রেম দেখাতে গিয়ে বিধবার বিবাহও দেননি, এখানে তাঁর পুরানো ভাবধারার প্রতি আনুগত্য দেখা যায়। হিন্দু সমাজের মধ্যে অত্যাচারী স্বামীর ছবি যেমন দেখিয়েছেন, তেমনি মুসলমান সমাজের মধ্যে দায়িত্ববান, মানবিক চরিত্রই বেশি দেখা গেছে। এছাড়াও প্রভুর জন্য ভৃত্যের আনুগত্য, জাত-পাতের ভিত্তিতে পেশা নির্বাচন, নারী হরণ ও সতীত্ব নষ্ট, জমিদার শ্রেণীর মানুষের টাকার জোরে কুকর্ম চাপা পরে যাবার দৃশ্য, পুলিশের শাসনের স্বরূপ ইত্যাদি নানান বিষয় তাঁর রচনায় দেখা যায়। এইভাবে রচনার মধ্যে তৎকালীন সময়, আধিকার দাবির লড়াই, প্রতিবাদ দেখা যায় তাঁর রচিত চরিত্রের কণ্ঠে। যে কণ্ঠের আবেদন আজও আমাদের সমাজ রাখে। সময়ের হিসাবে লেখা অনেক আগের হলেও বর্তমানে সময়েরও উপযোগী কথা ও ভাবনা তাঁর রচনায় আমরা দেখতে পাই। এইভাবেই তিনি বাংলা সাহিত্যকে সমৃদ্ধি দান করেছেন, যা অতুলনীয়।

তথ্যসূত্র

১। রাজশ্রী বসু ও বাসবী চক্রবর্তী (সম্পা.), জুন ২০০৮, প্রসঙ্গ মানবীবিদ্যা, কলকাতা, উর্বী প্রকাশন, পৃষ্ঠা- ৩৯

২। মৈত্রেয়ী চট্টোপাধ্যায়, জানুয়ারি ১৯৯৯, বাঁধন ছেঁড়ার সাধন, কলকাতা, প্রতিক্ষণ পাবলিকেশনস প্রাইভেট লিমিটেড, পৃষ্ঠা- ১০

৩। ঐ, পৃষ্ঠা- ১০

৪। শৈলবালা ঘোষজায়ার গল্প সংকলন, ২০০০, কলকাতা, দেজ, পৃষ্ঠা- ৮৩

৫। ঐ, পৃষ্ঠা- ৮৬

৬। ঐ, পৃষ্ঠা- ১৬৯

৭। ঐ, পৃষ্ঠা- ১৭০

৮। ঐ, পৃষ্ঠা- ১৭২

৯। ঐ, পৃষ্ঠা- ১৭৪

১০। ঐ, পৃষ্ঠা- ৬৭

১১। ঐ, পৃষ্ঠা- ৬৮

১২। ঐ, পৃষ্ঠা- ৭০

১৩। ঐ

১৪। ঐ, পৃষ্ঠা- ৭৪

১৫। ঐ, পৃষ্ঠা- ৩৩

১৬। অরুণ মুখোপাধ্যায় (সম্পা.), ১৪২৬ ব, *শৈলবালা ঘোষজায়া সেরা পাঁচটি উপন্যাস*, কলকাতা, মিত্র ঘোষ, পৃষ্ঠা- ৩৫৭

১৭। ঐ, পৃষ্ঠা- ৩৭২

১৮। ঐ, পৃষ্ঠা- ৩৯০

১৯। শ্রী শৈলবালা ঘোষজায়া, আশ্বিন ১৩২৮, *জন্ম অভিশপ্তা*, কলকাতা, গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এন্ড সন্স, পৃষ্ঠা- ১০৮

২০। শ্রী শৈলবালা ঘোষজায়া, ফাল্গুন ১৩৩১,*অবাক*, কলকাতা, গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এন্ড সন্স, পৃষ্ঠা- ৬

২১। ঐ, পৃষ্ঠা- ১৪

২২। ঐ, পৃষ্ঠা- ১৫

২৩। ঐ, পৃষ্ঠা- ২৫

২৪। শৈলবালা ঘোষজায়া, *তেজস্বতী*, কলকাতা, গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এন্ড সন্স, পৃষ্ঠা- ২৩

২৫। ঐ, পৃষ্ঠা- ২১

২৬। ঐ, পৃষ্ঠা- ৩৩

২৭। শৈলবালা ঘোষজায়ার গল্প সংকলন, ২০০০, কলকাতা, দেজ, পৃষ্ঠা- ২১৩

২৮। ঐ, পৃষ্ঠা- ২১৯

২৯। অরুণ মুখোপাধ্যায় (সম্পা.), মাঘ ১৪২৬, শৈলবালা ঘোষজায়া সেরা পাঁচটি উপন্যাস, কলকাতা, মিত্র ও ঘোষ, পৃষ্ঠা- ১৬

৩০। ঐ, পৃষ্ঠা- ১৭

৩১। ঐ, পৃষ্ঠা- ৩৫

৩২। ঐ, পৃষ্ঠা- ৫৫

৩৩। ঐ, পৃষ্ঠা- ৫৫

৩৪। ঐ, পৃষ্ঠা- ৫৫

৩৫। ঐ, পৃষ্ঠা- ৫৬

৩৬। ঐ, পৃষ্ঠা- ৬৫

৩৭। ঐ, পৃষ্ঠা- ৬৬

৩৮। ঐ, পৃষ্ঠা- ৯৭

৩৯। ঐ, পৃষ্ঠা- ১১৬

৪০। ঐ, পৃষ্ঠা- ১১৭

৪১। ঐ, পৃষ্ঠা- ১১৭

৪২। ঐ, পৃষ্ঠা- ১১৮

৪৩। শৈলবালা ঘোষজায়ার গল্প সংকলন, ২০০০, কলকাতা, দেজ, পৃষ্ঠা- ১৮০

৪৪। ১। অরুণ মুখোপাধ্যায় (সম্পা.), ১৪২৬, শৈলবালা ঘোষজায়া সেরা পাঁচটি উপন্যাস, কলকাতা, মিত্র ঘোষ, পৃষ্ঠা- ৩০০

৪৫। ঐ, পৃষ্ঠা- ২৯৮

৪৬। ঐ, পৃষ্ঠা- ৩১১

৪৭। ঐ, পৃষ্ঠা- ৩১১

৪৮। ঐ, পৃষ্ঠা- ৩১২

৪৯। ঐ, পৃষ্ঠা- ৩১৫

৫০। ঐ, পৃষ্ঠা- ৩১৬

৫১। ঐ, পৃষ্ঠা- ৩১৮

৫২। ঐ, পৃষ্ঠা- ৩২৩

৫৩। ঐ, পৃষ্ঠা- ৩২৬

৫৪। ঐ, পৃষ্ঠা- ৩২৭

৫৫। ঐ, পৃষ্ঠা- ৩৩২

৫৬। ঐ, পৃষ্ঠা- ৩৩২

৫৭। ঐ, পৃষ্ঠা- ৩৩৩

৫৮। ঐ, পৃষ্ঠা- ৩৩৩

৫৯। ঐ, পৃষ্ঠা- ৩৩৪

৬০। ঐ, পৃষ্ঠা- ৩৩৬

৬১। ঐ, পৃষ্ঠা- ৩৩৭

৬২। ঐ, পৃষ্ঠা- ৩৩৮

৬৩। শৈলবালা ঘোষজায়ার গল্প সংকলন, ২০০০, কলকাতা, দেজ, পৃষ্ঠা- ১১

৬৪। শ্রী শৈলবালা ঘোষজায়া, করুণাদেবীর আশ্রম, কলকাতা, গুরদাস চট্টোপাধ্যায় এন্ড সন্স, পৃষ্ঠা- ৯৫

৬৫। ঐ, পৃষ্ঠা- ৯৭

৬৬। ঐ, পৃষ্ঠা- ৯৭

৬৭। ঐ, পৃষ্ঠা- ৯৮

৬৮। ঐ, পৃষ্ঠা- ১০১

৬৯। ঐ, পৃষ্ঠা- ১০২

৭০। শৈলবালা ঘোষজায়ার গল্প সংকলন, ২০০০, কলকাতা, দেজ, পৃষ্ঠা- ৫৯

৭১। শ্রী শৈলবালা ঘোষজায়া, রঙিন ফানুস, কলকাতা, গুরদাস চট্টোপাধ্যায় এন্ড সন্স, পৃষ্ঠা- ১১

৭২। ঐ, পৃষ্ঠা- ৪১

৭৩। ঐ, পৃষ্ঠা- ৪১

৭৪। ঐ, পৃষ্ঠা- ৭৪

৭৫। ঐ, পৃষ্ঠা- ২৬৬

৭৬। ঐ, পৃষ্ঠা- ২৯৯

৭৭। শ্রী শৈলবালা ঘোষজায়া, করুণাদেবীর আশ্রম, কলকাতা, গুরদাস চট্টোপাধ্যায় এন্ড সন্স, পৃষ্ঠা- ৩০

৭৮। ঐ, পৃষ্ঠা- ৩২

৭৯। ঐ, পৃষ্ঠা- ৩৫

৮০। অরুণ মুখোপাধ্যায় (সম্পা.), ১৪২৬, শৈলবালা ঘোষজায়া সেরা পাঁচটি উপন্যাস, কলকাতা, মিত্র ঘোষ, পৃষ্ঠা- ২০৬

৮১। ঐ, পৃষ্ঠা- ২৪৮

৮২। ঐ, পৃষ্ঠা- ২৫০

৮৩। ঐ, পৃষ্ঠা- ২৭৩

৮৪। ঐ, পৃষ্ঠা- ২৭৬

৮৫। শ্রী শৈলবালা ঘোষজায়া, করুণাদেবীর আশ্রম, কলকাতা, গুরদাস চট্টোপাধ্যায় এন্ড সন্স, পৃষ্ঠা- ১০৪

৮৬। ঐ, পৃষ্ঠা- ১০৪-১০৫

৮৭ । ঐ, পৃষ্ঠা- ১০৬

৮৮। ঐ, পৃষ্ঠা- ১০৮

৮৯। ঐ, পৃষ্ঠা- ১০৯

৯০। ঐ, পৃষ্ঠা- ১১০

৯১। ঐ, পৃষ্ঠা- ১১১

৯২। ঐ, পৃষ্ঠা- ১১১

৯৩। ঐ, পৃষ্ঠা- ১১৪

৯৪। ঐ, পৃষ্ঠা- ১১৬

৯৫। ঐ, পৃষ্ঠা- ১১৭

৯৬। অরুণ মুখোপাধ্যায় (সম্পা.), ১৪২৬, শৈলবালা ঘোষজায়া সেরা পাঁচটি উপন্যাস, কলকাতা, মিত্র ঘোষ, পৃষ্ঠা- ১২৩

৯৭। ঐ, পৃষ্ঠা- ১২৮

৯৮। ঐ, পৃষ্ঠা- ১৩০

৯৯। ঐ, পৃষ্ঠা- ১৩৪

১০০। ঐ, পৃষ্ঠা- ১৩৬

১০১। ঐ, পৃষ্ঠা- ১৩৭

১০২। ঐ, পৃষ্ঠা- ১৪১

১০৩। ঐ, পৃষ্ঠা- ১৪১

১০৪। ঐ, পৃষ্ঠা- ১৪৮

১০৫। ঐ, পৃষ্ঠা- ১৪৯

১০৬। ঐ, পৃষ্ঠা- ১৫৭

১০৭। ঐ, পৃষ্ঠা- ১৭৫

১০৮। ঐ, পৃষ্ঠা- ১৯৭

১০৯। ঐ, পৃষ্ঠা- ১৯৮

তৃতীয় অধ্যায়

শৈলবালা ঘোষজায়ার রচনার গদ্য শৈলী

শৈলবালা ঘোষজায়ার রচনা সম্ভারের যে পরিসর, তা প্রাচুর্যের আতিশয্যে ভরপুর। সেই সম্ভারে আছে গল্প, উপন্যাস, নাটক প্রভৃতি নানাবিধ প্রকরণ। কথাসাহিত্য নিয়ে আলোচনার সূত্রে যে সমস্ত রচনার সঙ্গে পরিচিত হয়েছি তা থেকে লেখন রুচি, মেজাজ, চরিত্র যা তরতরিয়ে এগিয়ে যায়। তাঁর গদ্যরীতি অত্যন্ত সুখ পাঠ্য, সেখানে শুরু থাকলেই শেষ করার ধাপে এগিয়ে যায় মন দ্রুত গতিতে। তাঁর সাহিত্যসম্ভারে থাকা যে বিষয়গুলি এখন আমি তার গদ্যশৈলির আলোচনায় সাজিয়েছি সেগুলি হল নিম্নরূপ-

১। চরিত্র অনুযায়ী ভাষা যোজনা।

২। শব্দদ্বিত্বের ব্যবহার।

৩। মেয়েলি ভাষা ছাঁদ।

৪। সাঙ্কেতিক ভাষার ব্যবহার।

৫। প্রশ্নোত্তর চলনের গদ্য ব্যবহার।

৬। কথন।

৭। কথনকাল-কাহিনীকাল, চরিত্র ও সংলাপ।

৮। লোকগত উপাদানের ব্যবহার।

৯। সমান্তরাল বাক্যের চলন।

১। চরিত্র অনুযায়ী ভাষা যোজনা-

শৈলবালা ঘোষজায়ার গল্প, উপন্যাস পড়ার সূত্রে যে সমস্ত চরিত্রের সঙ্গে পরিচিত হয়েছি, সেখানে নানান ধরনের চরিত্রের উপস্থিতি লক্ষ করা যায়। সেইমত তাদের ভাষা ব্যবহারের একটা তালিকা রইল-

(ক) উচ্চ শ্রেণীর নারীর ভাষা।

(খ) উচ্চ শ্রেণীর পুরুষের ভাষা।

(গ) অনগ্রসর শ্রেণীর নারীর ভাষা।

(ঘ) অনগ্রসর শ্রেণীর পুরুষের ভাষা।

(ঙ) ছোটদের ভাষা।

(চ) ব্যতিক্রমী নেতিবাচক দিক।

(ছ) মানভূম অঞ্চলের ভাষা।

চরিত্র অনুযায়ী ভাষা দিয়েছেন লেখিকা। আমাদের সমাজে স্থান ভেদে, কাল ভেদে ভাষার বদল হয়। তাইতো ক্লাসরুমের ভাষা, বাজারে ক্রেতা বিক্রেতার ভাষা, রিক্সাওয়ালার ভাষা বিভিন্ন ছাঁদের। এইরকমই আরো নানান ক্ষেত্রে ভিন্নতা আমরা দেখতে পাই, তার বর্ণনা আর এখানে বিস্তৃত করলাম না। এখন আমরা শৈলবালা ঘোষজায়ার রচনার মধ্যে যে প্রকারভেদ পেলাম সেটাই দেখে নেওয়ার চেষ্টা করব। এই প্রসঙ্গে ওনার রচনার মধ্যে অনেক চরিত্রের ভিড়ে কিছু চরিত্রকে বেছে নেব এই প্রকারের ভাষার নমুনা প্রদর্শনের

জন্য। এইভাবে মৌখিক ভাষা ও অল্প কিছু ক্ষেত্রে আঞ্চলিক ছাঁদের সঙ্গেও পরিচিত হব। এখন আমরা প্রত্যেক ধরনের চরিত্রের মুখের ভাষার কিছু দৃষ্টান্ত নিম্নোক্ত আলোচনার মাধ্যমে দেখে নেওয়ার চেষ্টা করব।

(ক) উচ্চ শ্রেণীর নারীর ভাষা-

এই শ্রেণীর মুখের ভাষার দৃষ্টান্ত দেখাতে অনেক চরিত্রের মধ্যে যে সমস্ত চরিত্রকে বেছে নিয়েছি তা হল-

'সই' উপন্যাসের বিদ্যুৎলতা চরিত্র।

'মনীষা' গল্পের মনীষা চরিত্র ।

'ইমানদার' উপন্যাসের সুমতি দিদি চরিত্র।

'দীপ্তি' গল্পে দীপ্তি চরিত্র।

প্রথমেই 'সই' উপন্যাসের বিদ্যুৎলতা চরিত্রের প্রসঙ্গে আসা যাক। পুরো রচনাতে বিদ্যুৎ-এর পড়াশোনা কতটা তার হিসাব না থাকলেও তার কথাবার্তায় তার আধুনিক মানসিকতা, শিক্ষার ও বুদ্ধির পরিচয় পাওয়া যায়। তাই তার স্বামী হিতেন্দ্রর সঙ্গে বিদ্যুৎ লতাকে নানান বিষয়ে আলোচনা ও তর্ক করতে দেখা যায় রচনার নানা অংশে। এইরকমই একদিন তার স্বামী হিতেন্দ্র মেয়েদের বুদ্ধি কম এ প্রসঙ্গ নিয়ে বলতে গিয়ে মেয়েদের মস্তিষ্কের ওজন পুরুষদের থেকে ছয় আউন্স কম বলে গ্রে সাহেবের এনাটমীর কথা মনে করতে বললে সজোরে বিদ্যুৎলতা আপত্তি জানিয়ে যখন বলে-

"অর্থহীন আত্মম্ভরিতা ছাড়া এর মধ্যে এক ফোঁটাও সত্যি নাই,- যা হোক করে মেয়েদের ছোট করতে পারলেই অমনি ওঁদের পরমার্থলাভ হয় কিনা !" ১

তখনই স্বামীর প্রতি বিদ্যুৎ লতার এই রেজিষ্টারে সমাজটাও আমাদের চোখের সামনে উঠে আসে। পাশাপাশি তার যা চরিত্রের বৈশিষ্ট্য আমরা জেনেছি ভাষাটিও তারই অনুরূপ হিসাবেই দেখা গেল।

এরপর 'মনীষা' গল্পে মনীষাকে দয়ালু, পরোপকারী নারী হিসেবে দেখা গেছে। এর পাশাপাশি মনীষা হল অসহায় মা যে কিনা শিক্ষার ও পয়সার অভাবে তার সন্তানের চিকিৎসা করাতে পারেনি, যার ফলস্বরূপ আজ সে সন্তানহারা। অন্যদিকে তার স্বামী মনীষার বাইরে যাওয়া বন্ধ করে দেয় কারণ মেয়েদের যত্রতত্র বের হওয়া শোভনীয় নয়। এই অবস্থায় শিশুকে হারিয়ে ঘরে আবদ্ধ মা যখন হাহাকার করে বলে-

"পয়সার অভাবে, নিজেদের শিক্ষার অভাবে - ছোট শিশুর ছোট সেবায় কত বৃহৎ হইতেও বৃহত্তম অমার্জ্জনীয় ত্রুটি ঘটিয়াছে! ওঃ! নিরুপায় ক্ষোভে বুক যে ফাটিয়া যায়।" ২

তখনই অসহায় মায়ের ক্রন্দন শোনা যায়। এই ভাবেই মনীষার মুখের মার্জিত শব্দ তার বোধ বুদ্ধি ও স্বচ্ছ ভাবনাকে যেমন প্রকাশ করেছে তেমনি তার রুচি ও পরিবেশকেও স্পষ্ট করেছে।

'ইমানদার' উপন্যাসে সুমতি চরিত্রকে সম্ভ্রান্ত পরিবারের মেয়ে ও বউ হিসাবে দেখা গেছে। পাশাপাশি দয়ালু, কর্তব্যপরায়ণ, স্পষ্টবাদী, সৎ হিসাবে ও তাঁর চরিত্রটি এঁকেছেন লেখিকা। তার শ্যামল নামের এক পুত্র সন্তানও আছে। এই সন্তান সবসময়ই সমস্ত বিষয়ে বাড়ির মানুষদের প্রশ্নের বানে ব্যতিব্যস্ত করে রাখে। তবে একদিন এই সন্তান সবাইকে বকাবকি করতে থাকলে মা সুমতি তাকে কয়েকটা কথা বললে সে বাড়ি ছেড়ে চলে যায়, ফৈজু নামের এক চরিত্রের তত্ত্বাবধানে সে সন্তান বাড়ি ফেরে এবং তাকে নিয়ে

ও তার বাড়ি ছাড়ার কারণ নিয়ে নানারকম রঙ্গ তামাশার কথা বলতে থাকে। সেই সঙ্গে তার বিভিন্ন রকম কাজের কথা বলতে গিয়ে সুমতি যখন বলে-

"পিসিমা মালাটি হাতে নিয়ে বসলেই - দুটি বেলা, অমনি ছুটে এসে ঝগড়া জুড়ত! পিসিমার হরি ঠাকুর আস্ত, কি হাত-পা - ভাঙ্গা নুলো, ঠুঁটো - সেটা জেনে ওর কি চতুর্ব্বর্গ লাভ হবে, তোরা আমায় বুঝিয়ে দিতে পারিস্ সুনীল! সাধে ওর ওপর আমি চটেছি।" ৩

এই কথাতেই তার উচ্চারণের বৈচিত্রে যেমন শ্যামলের বাচ্চা সুলভ কৌতূহল প্রকাশ দেখা যায় ও শিশু মনের নানান প্রশ্ন যুক্ত মন যে কেবলই উত্তরের সন্ধানে ব্যস্ত তার পরিচয় পাওয়া গেল। তেমনি মায়ের (সুমতির) মুখের উচ্চারণ বৈচিত্রে তার পরিবেশেরও পরিচয় পাওয়া যায়।

'সেখ আন্দু'- উপন্যাসের জ্যোৎস্না ও লতিকা এই দুই চরিত্রকে শিক্ষিতা ও সম্ভ্রান্ত ঘরের পরিবেশে বেড়ে উঠতে দেখা যায়। তবে জ্যোৎস্না বিবাহিতা, আর লতিকার ডাক্তার পাত্রের সঙ্গে বিবাহ স্থির। এরই মধ্যে লতিকা আন্দুর নানান কাজে মুগ্ধ হয়ে তার প্রতি দুর্বল হয়ে পড়ে। এইরকমই এক মুহূর্তে দুই বান্ধবীর কয়েকটা কথোপকথন, যেখানে লতিকাকে তার ডাক্তার বন্ধুর (হবু স্বামী) কথা জিজ্ঞেস করে জ্যোৎস্না। ডাক্তার চিঠির উত্তর দিয়েছে কিনা জানতে চাইলে লতিকা ডাক্তার উত্তর দেয়নি বলে জানালে পরক্ষণে জ্যোৎস্না যখন ডাক্তার কেমন আছে জানতে চায় তখনই লতিকা ভালো নেই জানিয়ে দেয়। ডাক্তার হয়েও এত শরীর খারাপের কারণ জ্যোৎস্না জানতে চাইলে লতিকা বলে-

"স্বাস্থ্য ভালো থাকব কোত্থেকে, ব্যায়াম চর্চা যে মোটে করেনা, একটু হাঁটতে, একটু খাটতে মোটে চান না, কুড়ের বাদশা যে, শুয়ে শুয়ে দিনরাত পড়ছেন আর ঝুড়িঝুড়ি নোট লিখে আলমারি বোঝাই কচ্ছেন, কিন্তু হাসপাতাল অ্যাটেন্ড করবার সময়, হাতেকলমে কাজ শেখবার সময়, একেবারে বেবাক ফাঁকি। তাঁর পছন্দ শুধু পুঁথিগত বিদ্যে, তাই করেই তো বছর বছর ফেল হচ্ছেন-" ৪

এই কথায় জ্যোৎস্না নিস্তব্ধ, লতিকা আবারও উত্তেজিত হয়ে বলতে থাকলো-

"তোমরা বল শিক্ষিত, শিক্ষিত - শিক্ষিত কি ? - শিক্ষার ভারে মনুষ্যত্বটুকু রোলারের চাপে খোয়ার মতো গুঁড়িয়ে যাচ্ছে - তাঁরা শিক্ষিত! স্বাধীন চিন্তা শক্তি, স্বাভাবিক বুদ্ধি বৃত্তি,- সবই পরস্ব মতের মোমজামায় মুড়ে এক কিম্ভুতকিমাকার হয়ে দাঁড়াচ্ছেন - এইতো শিক্ষার সার্থকতা! ঝাঁটা মার! তোতা-পাখির মত খানকতক বই মুখস্ত করলেই মানুষ হয় না, মনুষ্যত্ব আলাদা জিনিস।" ৫

একথায় জ্যোৎস্না হেসে বলে-

"শিক্ষিতদের ওপর তোমার আজন্মের ভক্তি হঠাৎ এমন মূর্তিমান নাস্তিক হয়ে দাঁড়ালো কেন ?" ৬

প্রশ্নের উত্তরে লতিকা গম্ভীর ভাবে বলে-

"শিক্ষিতদের অপদার্থতা দেখে।" ৭

যাইহোক এই দুই বন্ধুর কথোপকথনে তাদের বোধ - বুদ্ধি, শিক্ষা, স্বাস্থ্য সচেতনতার ছবি দেখা গেল। এই শিক্ষিত, সচেতন মানুষের মুখের ভাষাই তাদের চরিত্র ও সমাজকে স্পষ্ট করে।

'দীপ্তি' গল্পে দীপ্তি চরিত্রকে শিক্ষিত, যুক্তিবাদী হিসাবে দেখা যায়, যাকে অন্যায়ের বিরুদ্ধে সম্মুখে কণ্ঠ তোলার মতো সাহস প্রকাশ করতেও দেখা যায়। গল্পে সরকার বাবু নামের এক চরিত্রকে তার ভাতৃ বধূকে ঠকাতে দেখা যায়। তাই ভাতৃবধূর পাঠানো নালিশ ওয়ারেন্ট নিয়ে কথা তুললে দীপ্তি যখন সরকার বাবুকে জানায়-

"আজ আইনের তাড়া খেয়ে ভাসুর গুরুজন সেজে মানের কান্না কাঁদলে চলবে কেন? সময়ে নিজের গুরুত্ব মর্য্যাদা রক্ষা করা উচিত ছিল।" ৮

এই মুখের ভাষার মধ্যেই আমরা শিক্ষিত, যুক্তিনির্ভর ও প্রতিবাদী দীপ্তিকে দেখতে পাই। এই ভাবেই আমরা লেখিকার গড়া চরিত্রের ভান্ডার থেকে এই কয়েকটি চরিত্রের মুখের ভাষার সঙ্গে পরিচিত হলাম, যা তাদের চরিত্র অনুযায়ী যথাযথ রূপ লাভ করেছে।

(খ) উচ্চ শ্রেণীর পুরুষের ভাষা-

শৈলবালা ঘোষজায়ার রচনার মধ্যে অনেক উচ্চ শ্রেণীর পুরুষ চরিত্রের উপস্থিতি লক্ষ করা যায়। সবার মুখের ভাষা দৃষ্টান্ত হিসাবে দেখানো খুব একটা সহজ হবে না তাই এক্ষেত্রেও বেছে নেওয়ার পথেই হাঁটতে হল। এই শ্রেণীর ভাষার দৃষ্টান্ত দেখাতে যেকটি চরিত্র বাছলাম তা হল-

'শঠে শাঠ্যং' গল্পের কথক এক বৃদ্ধ চরিত্র।

'অরু' উপন্যাসের জামাইবাবু রজনীবাবু চরিত্র।

'ইমানদার' উপন্যাসের সুনীল চরিত্র।

'শঠে শাঠ্যং' গল্পের কথক একজন বয়স্ক ভদ্রলোক। রুচিশীল, মার্জিত, শিক্ষিত ব্যক্তি। তিনি লেখালিখি নিয়ে চর্চা করেন। গল্পে উপস্থিত অন্য এক চরিত্র ভৈরব বাবু তিনিও লেখালিখি করেন। এই ভাবেই একদিন কাগজে মেয়েদের লেখাপড়া করাটা যুক্তিযুক্ত নয়– এর পক্ষে একটা লেখা নিয়ে কথকের কাছে এক বয়স্ক ভদ্রলোক এসে মেয়েদের শিক্ষা নিয়ে নানান সমালোচনা করে বলেই ফেলেছিলেন লেখাটি তাঁর মেয়ের, নাম সুনীলা দেবী বলে প্রকাশ পেয়েছে। তবে কাহিনী যত এগোতে থাকে তার কথার পক্ষে আর কাউকে তিনি না পেয়ে উত্তক্ত হয়ে মেয়েদেরকে আরো নানান অপমান করতে থাকেন তাদের শিক্ষাকে কেন্দ্র করে। এমনকি সমালোচনাতে এতটাই তিনি বুঁদ ছিলেন যে লেখা

সম্পর্কে কথকের কাছে সত্য শিকারের প্রসঙ্গটা ভুলে যান তাই আবারও নিজের কথাকে মজবুত করার জন্য মিথ্যা লেখাটি একজন শিক্ষিতা মহিলার বলে দাবি করেন। তাঁর যুক্তি শিক্ষিতা হয়েও শিক্ষার বিপক্ষে লিখেছেন তাই ভৈরববাবুর বক্তব্য অনেকটাই প্রতিষ্ঠিত। এই মুহূর্তেই কথক প্রতিবাদী কণ্ঠে যখন গর্জে বলে ওঠেন-

"ভৈরব বাবু অনেকগুলোই মিথ্যা বললেন! আর নয়, মাপ করুন এবার! আপনার এই এম- এ পাশ সুনীলা দেবী পুরুষ মানুষ না হতে পারেন, কিন্তু ইনি যে মেয়ে মানুষ নন, সেটা আপনি ভালই জানেন। কেন আর আপনার পোষাকের বাহারের মর্য্যাদাটা নষ্ট করছেন ? অনুগ্রহ করে বাড়ী যান।" ৯

এই ভাবেই শিক্ষিত প্রতিবাদী চরিত্রে তার উপযুক্ত কণ্ঠস্বর ধ্বনিত হতে দেখা যায় যা অত্যন্ত যথাযথ।

'অরু' উপন্যাসে রজনী বাবু চরিত্রের যে বৈশিষ্ট্য পাই তার থেকে বোঝা যায় তিনি যুক্তিনির্ভর, পরোপকারী মানুষ। তিনি উপন্যাসের নায়িকা অরুর সম্পর্কে জামাইবাবু হন। রচনায় প্রতাপ এর সঙ্গে বিবাহিতা অরু প্রতাপ এর দ্বারা অত্যাচারিত। প্রতাপ এর কাছে টাকাই সব, টাকার জন্য সে সমস্ত কিছু কাজ করতে পারে। নিজের কাজ সম্পর্কে মিথ্যা বলে বিয়ে করে অরুকে ঠকায় ও অত্যাচার করে। একসময় তার কৃতকর্ম ধরা পড়ে, সে জেলে যায় তখন অরুর দূর সম্পর্কের দিদি শান্তি দেবী ও তাঁর স্বামী রজনী বাবু অরুকে শান্তি দেবীর মায়ের দেখাশোনার জন্য থাকতে বলেন, তবে সেটা অবশ্যই অরুর ইচ্ছায়। এরই মাঝে অরুর জেল ফেরত স্বামী ঠিক অরুর খোঁজ করে অরুর কাছে পৌঁছায়। পুনরায় টাকার লোভে চলে নানান ফন্দি ও কুৎসা রটানোর মতলব। এখানেও নানা রকম সমস্যা পাকিয়ে অরুকে নিয়ে যাবার কথা যখন তোলে তখন শান্তি দেবী সেই কথা তাঁর স্বামীকে জানালে তা শুনে রজনী বাবু যখন বলেন-

"যার কাণ্ডজ্ঞান বলে কোনও জিনিস নেই, তাকে না ঘাঁটানো- ই ভাল। প্রতাপের আহাম্মকি দ্যাখো। শ্রাদ্ধের দান - তাও নিয়ে জোচ্চুরি। বারোয়ারি ব্যাপারে দানের জন্যে ওর হাতে তিনশো টাকা দিয়েছিলাম। গোটা পঞ্চাশেক টাকা দান করে, বাকি সমস্ত টাকা-" ১০

এই সমস্ত কথা শুনে অরু তার প্রাপ্য টাকা থেকে টাকা কেটে নিতে অনুরোধ করলে রজনী বাবু আবারো জানায়-

"বাঃ তুমি দন্ড দেবে কেন? ব্যবসা করবার জন্য প্রতাপ কে কিছু দান করব মনে করেছিলাম, ধরো ওটা সেই দান। বারোয়ারির টাকা আমি আলাদা মিটিয়ে দেব।" ১১

এইভাবে রজনী বাবু এত অন্যায় কাজ করার পরও প্রতাপকে ছেড়ে দিয়ে তাঁর উন্নত মানসিকতার পরিচয় দিয়েছেন। তাঁর মুখের ভাষাই তাঁর মার্জিত, বিবেচক চরিত্রানুসারি ভাষা।

'ইমানদার' উপন্যাসের সুনীল চরিত্রটিকেও শিক্ষিত, বিবেকবান মানুষ হিসাবে দেখা গেছে। উপন্যাসের এক চরিত্র ফৈজুদ্দীন, সুনীলদের বাড়ির কাজ দেখাশোনা করে, সে বিশ্বস্ত। একদিন ফুল তোলা নিয়ে মোহন্ত এক বাচ্চাকে মেরে ফেলার উপক্রম করলে ফৈজু তাকে বাঁচায় এবং এই নিয়ে নানান কাণ্ড বেঁধে যায়। ফৈজুকে নখখত দিতে হবে এ কাজের জন্য, এটা মোহন্তর ইচ্ছা। তখনই মোহন্তর এই ইচ্ছার প্রতিবাদে সুনীল বলে ওঠে-

"বেশ, আমায় ছেলেমানুষীই করতে দাও তাহ'লে। ভন্ডামীকে আমি ভক্তি করতে পারবো না, আর অন্যায়ের চোখ-রাঙানিকে আমি ভয়ও করব না। তাতে আমি নির্ব্বংশই হই.... আর যাই হই! খবর্দ্দার সর্দ্দার, তুমি ফৈজুকে মোহন্তর কাছে নিয়ে যেতে পারবেনা।" ১২

এই ভাবেই সুনীল চরিত্রকে তার প্রতিপক্ষের যোগ্য জবাব দিয়ে ফৈজুর মান বাঁচানোর মধ্য দিয়ে তার শিক্ষার মান রাখতে দেখা গেছে। এখানেও চরিত্রের কণ্ঠের ভাষা চরিত্রকে জীবন্ত করে তুলেছে।

(গ) অনগ্রসর শ্রেণীর নারীর ভাষা-

এই শ্রেণীর ভাষার দৃষ্টান্ত দানের জন্য যে সমস্ত চরিত্রকে বেছে নিয়েছি তা হল -

'রঙীন ফানুস' উপন্যাসের শনিচরের স্ত্রীর চরিত্র।

'ননী খানসামার ছুটি যাপন' গল্পে ননীর স্ত্রী সুষা ও ননীর মাতা চরিত্র।

'রঙিন ফানুস' উপন্যাসে নায়িকা পার্বতীর এক চাচার মেয়ে শনিচরের স্ত্রী। সম্পর্কে তারা দিদি বোন। বিবাহের পর শনিচরের স্ত্রী যেখানে থাকে সেখানকার প্রতিবেশী খন্তর চরিত্র। সেও বিবাহিত কিন্তু স্ত্রী, সন্তান তার মারা গেছে, বর্তমানে একা। এদিকে খন্তর ঠিকঠাক রোজগার করে, বয়সও কম তাই তার বিয়ে দেবার জন্য খন্তরের পরিবার ও প্রতিবেশীরা বড়ই উদ্যোগী। এইরকমই একটা সময়ে প্রতিবেশী শনিচরের স্ত্রী ছেলেকে উপলক্ষ করে খন্তরকে জানায়-

"তোর চাচাকে জিজ্ঞাসা কর,- সাগা করে বউ আনতে চায় না, কিন্তু বরের মত সেজে গিয়েছিল কোথা?" ১৩

এই পরিস্থিতিতে ভাইপোর দিকে তাকিয়ে ভাতৃজায়াকে সাহেবের কাছে গেছিল বলে জানিয়ে অন্ন জোগারের জন্য এমন সাজ বলে উত্তর দেয়। জামালপুরে শ্রমজীবী পল্লীতে সে বর্তমানে কাজ নিয়েছে সেটাও জানায়। তবে ভাতৃজায়া আপন খেয়ালে আবারও পুত্রের উদ্দেশ্যে বলে-

"তোর চাচাকে বল, অত রাগ জানাতে হবে না। যাতে জলদি বহু ঘরে আসে, তার ব্যবস্থা করছি।"১৪

এই ভাবেই ভাতৃজায়ার মুখে ব্যবহৃত ভাষায় অনেক নতুন ধরনের শব্দ যোজনা দেখা যায়। যা এই শ্রেণীর নারীর ভাষাকে পরিপুষ্টি দান করেছে।

'ননী খানসামার ছুটি যাপন' গল্পে ননী বাড়ি থেকে দূরে খানসামার কাজ করে। সারা বছর কর্ম ক্ষেত্রে থাকতে হয়, মাঝেমধ্যে সময় করে ছুটি নিয়ে বাড়ি আসে। গল্পটিতে লেখিকা অত্যন্ত সহজ ছাঁদে গ্রাম বাংলার প্রকৃতি, মানুষের রীতি রেওয়াজ, ঘর ও বাইরের কথা খুব সুন্দরভাবে কেবলমাত্র ননীর জীবনযাপন প্রণালী ব্যক্ত করার মধ্য দিয়ে ফুটিয়ে তুলেছেন। সংসারের সমস্ত দায়িত্ব ননীর কাঁধে। তাই কাজের জায়গা থেকে কাউকে কিছু না জানিয়ে হঠাৎ এসে পড়ায়, তাকে খেতে দিতে উদ্যোগী স্ত্রী সুষা যখন জিজ্ঞাসা করে-

"তোমার মনীব যে এখন তোমায় ছেড়ে দিলেন! সেদিন ঠাকুরপো বল্লে, চিঠিতে তুমি নিকেছ যে এখন তুমি মনীবের সঙ্গে খড়গপুর যাবে, এখন আর আসবে না। সেই পুজোর পর তবে। তা হলে কি রকম হল?" ১৫

এই প্রশ্নের মধ্যেও প্রকাশ পায় তার অবস্থান। এখানেও ভাষা ও শব্দের বৈচিত্রে চরিত্রকে জীবন্ত হতে দেখা যায়। এছাড়াও গল্পে অসময়ে চলে আসা ননীর সঙ্গে ননীর মাতারও কথা হয়। সবকিছুর খবরা-খবর ও ছেলে কি খাবে এই নিয়ে ব্যতিব্যস্ততার মধ্যেও মাথা যখন ছেলের কাছে জানতে চায়-

"তা হ্যাঁরে ননী, মনীবরা যত্নছেদ্ধা করে ? ভালটাল বাসে কেমন ?" ১৬

তখনই ওই সমস্ত শব্দের মাঝে একজন গ্রামীণ মায়ের স্নেহ আমরা দেখতে পাই। এখানেও চরিত্রের মুখে ভাষা ব্যবহারের ক্ষেত্রে লেখিকার দক্ষতার পরিচয় পাওয়া যায়।

(ঘ) অনগ্রসর শ্রেণীর পুরুষের ভাষা-

এই শ্রেণীর চরিত্রের দৃষ্টান্ত দেখাতে যে সমস্ত চরিত্র বেছে নিয়েছি, তা হল-

'নিরঞ্জন সর্দার' গল্পের নিরঞ্জন চরিত্র।

'ননী খানসামার ছুটি যাপন' গল্পের ননী চরিত্র।

'রঙিন ফানুস' উপন্যাসের সুমারের বৃদ্ধ পিতার চরিত্র।

'নিরঞ্জন সর্দার' গল্পে নিরঞ্জন বাগদী সম্প্রদায়ের অন্তর্গত এক লাঠিয়াল। বাড়ি থেকে ষোলো ক্রোশ দূরে এক জমিদার বাড়িতে সে লাঠিয়ালের কাজ করত। বাড়িতে তার মা-বাবা, স্ত্রী ও শিশু পুত্র ও এক ভাই বর্তমান। কাজের ক্ষেত্রে নিরঞ্জন অত্যন্ত সৎ ও বিশ্বাসী একজন মানুষ। বিনা কারণে সে কখনও ছুটি নেয় না। একদিন মায়ের অসুস্থতার কথা জানানো এক চিঠি জমিদার বাবু পেয়ে নিরঞ্জনকে ছুটি দেয়, কিছু টাকাও দেয়। দ্রুত পায়ে হেঁটে অতটা পথ এসে বাড়িতে মাকে যখন সুস্থ দেখল এবং চিঠি কেউ পাঠায়নি জানল তখনই জমিদার বাড়িতে ডাকাতি হওয়ার আঁচ করে যখন বলে-

"অ! বুঝেছি, এ তাহলে সেই শালাদের কাজ! তোমার অসুখ বলে লিখে আমাকে সরিয়ে দিয়েছে- মতলব- আমার মনিব-বাড়ী লুঠবে! না মা, আমি বসব না, এখনি চললুম।" ১৭

এরপরই কোনোরকমে তাল এর মাড়ি দিয়ে চালের গুঁড়ো মাখিয়ে খেয়ে দ্রুত বেরিয়ে যায় এবং মাকে সতর্ক করে জানিয়ে যায় পরের বার যাতে চিঠি না পাঠায়। বদলে জরুরি পরিস্থিতিতে লোক পাঠিয়ে ডাক পাঠায়। আবারও ষোলো ক্রোশ পার করে মনীবকে বাঁচিয়ে ছিল সেদিন। যাই হোক দৃষ্টান্ত থেকে পাওয়া তার ভাষা থেকে মনীবের প্রতি

দায়িত্ববান মনের ও বুদ্ধিমত্তার পরিচয় পাওয়া যায়। এখানেও দৃঢ়চেতা, কর্তব্যপরায়ণ নিরঞ্জনকে তার ভাষার মাধ্যমে আমরা পেলাম।

'ননীখানসামার ছুটি যাপন' গল্পে ননীকেও কাজের জন্য বাড়ির বাইরে থাকতে দেখা যায় সেও মনীবের বাড়িতেই কাজের জন্য থাকে। প্রয়োজনে ছুটি নেয়। এমন অবস্থায় একদিন হঠাৎ ছুটিতে আসা ননীকে তার মা মনীব কেমন খাতির করে, কেমন খাটায়, কেমন থাকে সেখানে এসব জানতে চাইলে ননী তার উত্তরে জানায়-

"আমি হামে হাল খাড়া থাকি, দিনকে দিন বলি না, রাতকে রাত বলি না। ধর, দুপুর রাত্রে খেটে খুটে শুইচি, হয়ত তন্দ্রাটি এসেছে, এমন সময় বাবু ডাকলেন। তক্ষুণি উঠে পড়নু। ঘুমে চোখে দেখতে পাচ্ছি না- চোখে এক ঝাপটা জল দিনু, বাবুর ঘরে গেনু- হয়ত বল্লেন সোডা ভেঙে দে। সোডা ভাঙনু, গেলাসে ঢালনু, বাবুর খাওয়া হোল, তারপর চুরুট সরিয়ে দিনু- তবে ছুটি। আবার সেই ভোর পাঁচটা হোতে না হোতে এক ডাকে উঠে কাযে লাগতে হবে। পয়সা কি আর অম্নি হয় মা!" ১৮

তখনই ননীর জীবনের দুঃখ কাহিনী উঠে আসে যা তার মায়ের কাছে আনন্দের নয়। তাই কথাটা ঘোরানোর জন্য সে যে এবারে পুরী গিয়েছিল মাকে তা জানায়। সঙ্গে সঙ্গে মা জগবন্ধু দর্শন করেছে কিনা ছেলের কাছে জানতে চাইলে ননী আবারও যখন বলে-

"ফুরসুৎ পেনু না মা। সাতদিন ছিনু বটে, কিন্তু হলে কি হবে, চব্বিশ ঘন্টাই কাজ।" ১৯

এই ভাবেই এমন মুখের ভাষায় গ্রাম্য ননী ও তার মার স্নেহ কোমল হৃদয়ের ছবি দেখা যায়।

'রঙিন ফানুস' উপন্যাসের কুর্ম্মি সমাজের এক চরিত্র খন্তর। যার স্ত্রী ও সন্তান মৃত। এইসব পরিস্থিতির পরও সে ভাইপোর দায়িত্ব ও সকলের সঙ্গে ভালো ব্যবহার বজায় রেখে দিন যাপন করতে থাকে। তবে তার বয়স অল্প, রোজগার পত্রও ভালো তাই বাড়ির

লোক ও প্রতিবেশীরা চায় সে আবার বিবাহ করুক। এই পরিস্থিতিতে একদিন অন্য ভাইরা যখন বিয়ের কথা তুলে রাগায় তখন বিছানার পাশ থেকে একটা 'তুলসী দাসের দোঁহার' বই বের করে এবং তাদের কাছে এগিয়ে আসা এক ভাইয়ের বাবাকে সেটা পড়ে শোনাতে চায়। তবে চাচা শুনতে চায় কিনা এটা জানতে চাইলে বৃদ্ধ চাচা যখন বলেন -

" রাখ্ রাখ্ খন্তরা, ঢের শুনেছি। কাঁচা বয়স তোদের ! এখন ও সবের সময় তোদের নয়। ওতেই তোর মন বাউরা হয়েছে। বে কথা হচ্ছে, সে কথায় মনদে।"২০

এইভাবেই কুর্ম্মী সমাজের ভাষার সঙ্গে আমাদের পরিচয় হয়। যেখানে নতুন করে অনেক শব্দ ভাষার মধ্যে চলে আসছে। এইভাবে স্থানভেদে, চরিত্র ভেদে, ভাষা দিয়েছেন লেখিকা। যা চরিত্রকে আরও বেশি প্রাণবন্ত করে তোলে।

(ঙ) ছোটদের ভাষা-

ভাষা ব্যবহারে পুরুষ, নারী ভেদে, উচ্চ ও নিম্ন শ্রেণি ভেদে যে যথাযথ ও বিচিত্র রূপ আমরা দেখতে পেয়েছি তা যেমন সার্থক। সেরকমই বাচ্চার মুখের ভাষা কেমন হবে সেই হিসাবেও ভাষা ব্যবহারে তিনি সিদ্ধহস্ত। এই বাচ্চার ভাষার দৃষ্টান্ত প্রদানের জন্য লেখিকার- 'তোকে মেলে মেলে ইয়া-ইয়া খাঁ কলব !' গল্পটির দিকে আমরা এখন চোখ রাখব। গল্পটি লেখিকার বয়ানে লেখা বিষ্ণুমায়া নামের এক খুদে চরিত্রের কথা ও তার কর্মকাণ্ডর দলিল। গল্পের শুরুতেই তার রুটি বেলতে চাকি নেওয়া এবং সেটা এক পাচক এর কেড়ে নেওয়ার দৃশ্য আছে। এর ফলেই সে কেঁদে কেঁদে ওই পাচকের উদ্দেশ্যে বলতে থাকে-

"তোকে মেলে মেলে ইয়াইয়া খা কলব !"২১

এই কথায় পাচকের হাসি যত বাড়ছে, বাচ্চার ক্রন্দনও ততই বাড়ছে। এভাবেই দুবার করে জোর দিয়ে বলা কথা থেকে কান্না ও রাগ দেখা যায় গল্পে। তবে এই বাচ্চা সকলকে ধমক দেয়, আবার খাবার সময় যত্ন করে জিজ্ঞাসা করে-

"পেৎ ভলেছে ত?" ২২

এই বাচ্চা সবাইকে খাওয়াতে ভালোবাসে। তবে পুরো বাড়ির মধ্যে প্রপিতামহী কে নোনো বলে ডাকে এবং তাকে নিজের সম্পত্তি ভাবে। তাইতো নোনোর কাছে অন্য কেউ অর্থাৎ পাশের বাড়ীর ছয় বছরের সর্বাণী এসে গল্প শুনে ফেললে তাকে সতর্ক করে জানায়-

"তুই যদি নোনোর সঙ্গে আর কথা বলবি, তবে তোকে খামচে দেব। কামলে দেব। এমন মাল্ মালব যে কাঁদতে কাঁদতে পালাবি !" ২৩

এমনকি বেশিক্ষণ কেউ নোনোর কাছে থাকুক সেটাও সে চায় না তাই বেশিক্ষণ কেউ থাকলে তাকেও দেয় সতর্কবার্তা-

"যা, এবাল বালী যা।" অর্থাৎ, "যা, এবার বাড়ী যা।" ২৪

আবারও বিষ্ণুমায়া অর্থাৎ মুনতুর নোনোর গাঁয়ে ঠেস দিয়ে থাকার প্রসঙ্গ ধরে যখন নোনোকে কার্ত্তিক ঠাকুর ও নিজেকে (মুনতুকে) ময়ূর বলে তখন পাচক হঠাৎ নোনোকে অসুর বললে মুনতু তার পিছন ধাওয়া করে কামড়ানোর জন্য এবং বলে-

"নোনোকে ওচুল বল্‌বি না।" ২৫

এই পুরো গল্পে এই বাচ্চাটির রাগ, কান্না, মায়া দেখা যায়। এমনকি সবশেষে এক মাসিক পত্রিকা খুলে দেখতে দেখতে শিশু মনে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধীর সুন্দর মূর্তিটি দেখে ছবিটিতে হাত বোলাতে বোলাতে বলতে শোনা যায-

"এই মেয়েতা এই মেয়েতা

আমাদেল বালী যাবি ?

এক পয়সার ছোলা দেবো

বচে বচে তাবি ?" ২৬

বাচ্চার মুখে ভাষা যোজনায় এভাবেই লিখিকা তাঁর নিপুণতার দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছেন।

(চ) ব্যাতিক্রমী নেতিবাচক দিক-

ধর্মগুরু জাতীয় মানুষের পরিচয় ও তাদের ব্যবহার যে চরিত্র গুলির মধ্যে দিয়ে প্রকাশ পায় তা হল-

'কার্য্য - কারণ' গল্পের বৈষ্ণব ঠোরের প্রধান ব্রজদাস বাবাজি চরিত্র।

'বিভ্রাট' উপন্যাসে মঙ্গলার দীক্ষাগুরু চরিত্র।

'কার্য্য - কারণ' গল্পে বৈবাহিক সূত্রে এক ব্রাহ্মণ তরুণীর বৈষ্ণবী হওয়ার দৃশ্য আছে। তার স্বামী বনমালী দাস বৈষ্ণব ধর্মে দীক্ষিত হয়ে রজপেয়ে সংসার ত্যাগী। এই পরিস্থিতিতে মেয়েটি একাই লোকের বাড়ি বাড়ি জল বিতরণ করে যা টাকা পায় তা দিয়েই দিন কাটায়। এই সময়ে তার উপর নজর পড়ে বৈষ্ণব ঠোরের প্রধান ব্রজদাস বাবাজীর। অনেকবার ওই তরুণীর কাছে তার মনের কথা বলেও যখন কোন সদর্থক ইঙ্গিত মেলেনি তখন সরাসরি ব্রজদাস বাবাজি যখন বলেন-

"দেখ শ্রীমতি ঠাকুরুন, তোমার জেদ ছাড়। আমি তোমার অনেক তেজবাজী সয়েছি, কিন্তু আর সইবো না, তুমি মনে রেখো, আমার নাম ব্রজদাস বাবাজী।" ২৭

এই মুখের ভাষাই ব্রজদাস বাবাজীর চরিত্রের দম্ভ ও হীনতাকে প্রকাশ করে। চরিত্রটি যেমন দাম্ভিক, নৈতিকতা বর্জিত তেমনই সেই চরিত্রকে জীবন্ত করার জন্য চরিত্র অনুযায়ী তিনি যে ভাষা দিয়েছেন তা অত্যন্ত সার্থক।

এই একইরকম অসাধুতার দৃষ্টান্ত দেখা যায় 'বিভ্রাট' উপন্যাসের মঙ্গলার দীক্ষাগুরু এক সিদ্ধ বাবা চরিত্রকে কেন্দ্র করে। এই সিদ্ধবাবা চরিত্রটিও মঙ্গলাকে যোগ সাধনা দেওয়ার ছুতোয় তাকে নানা মিথ্যা যুক্তির জালে আবদ্ধ করে ভোগ করার মতলব আঁটে। সিদ্ধবাবার মিথ্যা যুক্তি জালে আষ্টেপৃষ্ঠে বাধা পড়ে যায় মঙ্গলা। যার ফলস্বরূপ মঙ্গলাকে সন্তানসম্ভবা হয়ে উঠতে দেখা যায়। একইভাবে আরও এক চরিত্র সত্যবতীকেও জালে জড়ানোর উদ্দেশ্যে যখন সিদ্ধবাবা বলেন-

"ক্ষুধা-তৃষ্ণার মত, যৌবনে মানুষ মাত্রেরই একটা স্বাভাবিক তৃষ্ণা থাকে। যথা সময়ে সেটার দাবি না পূর্ণ করলে মহা অনিষ্ট ঘটে।" ২৮

তবে যাই হোক সত্যবতীর তীক্ষ্ণ বিচক্ষণ মানসিকতার কাছে তাঁর যুক্তি খাটেনি। এক্ষেত্রে তার মুখে ব্যবহৃত ভাষাই তাঁর বিকৃত রুচির পরিচয় বহন করে। এভাবেই লেখিকা এক এক রকম চরিত্র সৃষ্টিতে দক্ষতার পরিচয় রেখে গেছেন।

(ছ) মানভূম অঞ্চলের ভাষা-

প্রত্যেক চরিত্র আপন আপন স্তর থেকে কথা বলতে বলতে কাহিনী যখন মানভুম অঞ্চলের মধ্যে পৌঁছেছে তখনই চরিত্ররা সেই অঞ্চলের ভাষা বলেছে। এই দৃষ্টান্ত দেখতে পাওয়া যায় 'পাহাড়ের পথে' গল্পের পার্বতী ও তার স্বামী প্রসাদ চরিত্রকে কেন্দ্র করে। প্রসাদ এর প্রথম স্ত্রী পার্বতী। প্রথমে বাচ্চা না হওয়ার জন্য দ্বিতীয় বিয়ে করে প্রসাদ। তবে দ্বিতীয় বিয়ে করার পরেই দুই স্ত্রীরই সন্তান হয় এবং শুরু হয় দুই স্ত্রীর মধ্যে ঝগড়াঝাটি।

এই পরিস্থিতিতে পার্বতীই আলাদা থাকত। তবে প্রসাদ পাহাড়ের পথে কবিরাজের সঙ্গে ভেষজ সংগ্রহ করতে যাবার পথে পার্বতীকে দেখে তার সন্তানের খবর জানতে চাইলে উত্তরে ছেলের অসুস্থতার কথা জেনে উতলা হয়ে পার্বতী কেন তাকে খবর দেয়নি এটা জানতে চাইলে পার্বতীও তাকে জানায়-

"তু উহাকে ডরিস্ কিস্ কে ? " ২৯

এই বলে চলে যেতে উদ্যোগ করলে প্রসাদ তাকে বাধা দেয় তখনই কবিরাজ মশাইয়ের হাঁক আসে, তাই তাকে চলে যেতে হবে বলে হনুমান ধারার কাছে পার্বতীকে অপেক্ষা করতে বলে তৎক্ষণাৎ পার্বতী না বলে জানালে প্রসাদ বলে-

"আমার কিরা ছেলেটার কিরা, শুনি যাস্।" ৩০

এই 'কিরা' অর্থাৎ দিব্যি এর বসেই পার্বতী অপেক্ষা করেছিল। যাইহোক তাদের মধ্যে এই বন্ধনহীন যে বাঁধন তাও বেশ মন্দ নয়। তাইতো প্রসাদ পার্বতীর জন্য পাহাড় থেকে ফুল এনে বলেছিল-

"তুর লেগে পাহাড় হতি ফুল আনেছিলাম, তু লিয়ে যা-" ৩১

তবে পার্বতী সে ফুল ছুঁড়ে ফেলে দেয়। এই ভাবেই লেখিকা পার্বতীর সংসারের কলহ, সতীন সমস্যা, সংসারের ভাঙ্গন যেমন দেখিয়েছেন তেমনি দুই স্ত্রীকে নিয়ে প্রসাদের অসহায়তাও দেখিয়েছেন। এমনিকরেই চরিত্রদের সমাজ স্তর, শিক্ষা, পরিবেশ অনুযায়ী কথা বলতে দেখা যায়। শব্দ যোজনার সুনিপূণ দক্ষতায় চরিত্র পরিবেশ অনুযায়ী ও তাদের অবস্থান অনুযায়ী বেশ মানানসই।

২। শব্দ দ্বিত্বের ব্যবহার-

শৈলবালা ঘোষজায়ার রচনার মধ্যে শব্দদ্বিত্বের ব্যবহার অধিক পরিমানেই দেখা গেছে। এই শব্দদ্বিত্বের ব্যবহার বেশিরভাগ ক্ষেত্রে নারী চরিত্রের মুখে শোনা যায় তবে পুরুষ চরিত্রের মুখেও অল্পবিস্তর ব্যবহার দেখা যায়। এবার কত রকম শব্দ দ্বিত্ব ও কত পরিমাণ শব্দদ্বিত্ব ব্যবহৃত হয়েছে তা জানার আগে শব্দদ্বিত্ব কি, এর প্রকার কেমন তা জেনে নেওয়া দরকার।

'শব্দদ্বিত্ব' হল সেই শব্দজোড় যা সম শব্দ বা প্রায় সমুচ্চারিত শব্দ পাশাপাশি বসার ফলে সৃষ্টি হয়।

শব্দদ্বিত্বের প্রকার-

(a) সমার্থক শব্দদ্বিত্ব --> উদাঃ- থেকে থেকে, চমকে চমকে।

(b) বিপরীতার্থক শব্দদ্বিত্ব --> উদাঃ- আকাশ - পাতাল, গতা গতি ইত্যাদি।

(c) অনুকার শব্দদ্বিত্ব --> উদাঃ- কোন আওয়াজের অনুকরণে যদি শব্দদ্বিত্বের সৃষ্টি হয় তবে তাকে অনুকার শব্দত্ব বলে। যেমন- ছল ছল, হৈ চৈ ইত্যাদি।

এই রকমই বহু শব্দদ্বিত্বের ব্যবহার শৈলবালা ঘোষজায়ার লেখা 'লাফো', 'কর্পূরের মালা', 'বিজয়ার নমস্কার', আশ্চর্য্য সফল স্বপ্ন',' ভূমিকম্প', 'ননীখানসামার ছুটিযাপন', 'থিয়েটার দেখা', 'বোকার টুপি', 'আদেশপালন', 'দুই রূপ', 'দীপ্তি', 'নিরঞ্জন সর্দার', 'অকাল কুষ্মাণ্ডের কীর্তি', 'কোন রোগ?', বুনো ওল ও বাঘা তেঁতুল', 'সূক্ষ্ম-ধর্মজ্ঞান', প্রভৃতি গল্পে ও 'অবাক', 'সই', 'সেখ আন্দু', 'রঙিন ফানুস', 'ইমানদার', 'অরু',প্রভৃতি উপন্যাসের মধ্যে পাওয়া যায়। তারই একটা তালিকা নিচে দেওয়া হল-

(ক) সমার্থক শব্দদ্বিত্ব-

হয়ে হয়ে	সত্যি সত্যি	সুটতে সুটতে
আসি আসি	হাঁপাইতে হাঁপাইতে	মৃদু মৃদু
জপিতে - জপিতে	তোবা তোবা	পুনঃ পুনঃ
হাপাইতে - হাপাইতে	হাতড়াইতে হাতড়াইতে	টুক টুক
সঙ্গে - সঙ্গে	হাড়ে হাড়ে	জড়াইতে জড়াইতে
হাঁ হাঁ	কেটে কেটে	দপ্ দপ্
হাতে হাতে	ঝুড়ি ঝুড়ি	টিপিয়া টিপিয়া
প্রকাণ্ড - প্রকাণ্ড	পালাই পালাই	খুদে খুদে
বলকি! বলকি!	তুড়্ তুড়্	সদ্যঃ সদ্যঃ
রসো রসো	বড় বড়	দিতে দিতে
চাপড়াইতে চাপড়াইতে	করিতে করিতে	যাইতে যাইতে
চলতে চলতে	কহিতে কহিতে	বাছিয়া বাছিয়া
চোখা চোখা	মাঝে মাঝে	স্থানে স্থানে
মিটি মিটি	ঝক ঝক	মুছিতে মুছিতে
রাখিতে রাখিতে	দেখিতে দেখিতে	ছিঁড়িতে ছিঁড়িতে।

ঢুলু ঢুলু	ছুটিতে ছুটিতে	নামিতে নামিতে
চুপি চুপি	চন চন	ধীরে ধীরে
বলিতে বলিতে	পশ্চাৎ পশ্চাৎ	ঘুরিতে ঘুরিতে
চোখে চোখে	দূরে দূরে	দূরে দূরে
ঢের ঢের	ঠুকিয়া ঠুকিয়া	বকিতে বকিতে
টস টস	কাঁদ কাঁদ	কেহ কেহ
ধূ ধূ	হটিতে হটিতে	মনে মনে
ঘরে ঘরে	টলিতে টলিতে	চাহিতে চাহিতে
সাধু সাধু	থামিয়া থামিয়া	নিজ নিজ
লিখিতে লিখিতে	পড়িতে পড়িতে	তন্ন তন্ন
নল্ নল্	চলিতে চলিতে	রাম রাম
চালাইতে চালাইতে	ঘুরিয়া ঘুরিয়া	কেউ কেউ
টিপিতে টিপিতে	আগে আগে	বড় বড়
যায় যায়	হাড়ে হাড়ে	অল্প অল্প
চুষতে চুষতে	শুনতে শুনতে	

(খ) বিপরীতার্থক শব্দদ্বিত্ব-

ব্যথা টোথা	গল্পস্বল্প	চটে মটে
বিয়ে থা	হাবা গোবা	বিন্দু বিসর্গ
হুকম দকম	ঝটপট	ভিক্ষে-সিক্ষে
হেথা হোথা	ভাঙিয়া - চুড়িয়া	সোজাসুজি
কষ্টে সৃষ্টে	ফেলিয়া - ছড়াইয়া	বুঝে সুজে
বুদ্ধি সুদ্ধি	ছুটা ছুটি	বিগড়ে - শিগড়ে
মা - রা	ডাকাডাকি	রকম - সকম
হাড়গোড়	লাফালাফি	বলতে - কইতে
পাকাপাকি	চটপট	লুটা পুটি
বোধ - সোধ	গালাগালি	মিটমাট
তাড়াতাড়ি	শূলো শূলি	উঁকিঝুঁকি
খাওয়া - দাওয়া	চড়চাপড়	আলু থালু
মুখ - টুক	উসখুস	টপাটপ
বাড়াবাড়ি	পিয়াসা - টিয়াসা	টিকা টিপ্পনি
চুলোচুলি	ঝাড়ফুক	গোটা কতক

বকুনি টকুনি

গান - টান

খেটে - খুটে

চুরি - টুরি

পড়া পড়ি

চটিতং মটিতং

ঝগড়াঝাঁটি

ভাব - সাব

ছেলে - পিলে

গাল টাল

স্পষ্টা - স্পষ্টি

দয়া মায়া

ভাব টাব

চা টা

ট্যাভাই ম্যাভাই

লাফালাফি

তুকতাক

লেইফে - ঝেইফে

মুখোমুখি

ভদ্দর - সদ্দর

হৃষ্টপুষ্ট

চেঁচামেচি

মনে টনে

হতভাগা হতভাগী

ছিনিমিনি

বর্ষা বাদল

পাশাপাশি

কথাবার্ত্তা

ধর ফর

ধমক চমক

বই টই

মালা টালা

ঝট্ পটে

লট্ পটে

ব্যস্ত বিব্রত

আখরোট -

ফাখরোট

ফলটল

চা, ফা

মামলা-টামলা

খাক-দাক

ভয়ডর

ছুটাছুটি

বিকৃত-বিষাক্ত

বিশাল বিস্তার

নামধাম

আগাগোড়া

হুটোপাটি

ক্ষত-বিক্ষত

পীড়া পীড়ি	টগবগ	ভুলিয়া ভালিয়া
ফড়িং টরিং	দমাদম	দেখাদেখি
নরম - সরম	লুটপাট	চুরমার
গালচে দুলচে	মশ মশানি	কাঁচুমাচু
সাজান গোজান	যখন তখন	এদিক-ওদিক
কুচকুচে	তাড়াহুড়ো	ঝটপট
বেটে খাটো	রাগা রাগি	কটমট
চাপকান টাপকান	ঝাড়িয়া ঝুড়িয়া	লতা পাতা
ধবধবে	হুড়োহুড়ি	দেখিয়া শুনিয়া
ঝিকিমিকি	চকমকে	ছুটোছুটি
লুটোপুটি		

(গ) অনুকার শব্দদ্বিত্ব-

দুড়দাড়	হুড় মুড়	গুন্ গুন্
মসমস	গুম্ গুম্	ঠুকঠাক
খিলখিল	দুম্ দুম্	দপ্ দপ্

ফুঁসিতে ফুঁসিতে	দুপ্ দাপ্	ধুধু
হু হু	গজ গজ	ঝাঁ ঝাঁ
বিড় বিড়	হৈ হৈ	টং টং
ঝমঝম	চুক্ চুক্	

৩। মেয়েলি ভাষা ছাঁদ-

ভাষা ব্যবহারের ক্ষেত্রে নারীর ভাষার শ্রেণীগত ভেদ আগের আলোচনায় দেখতে পাওয়া যায়। তবে কেবল মেয়েদের ভাষার মধ্যে একটা আলাদাই ছাঁদ লক্ষ করা যায়। শব্দ ব্যবহারের বৈচিত্র্যে যা মেয়েলি ভাষা হিসাবে আলাদা মাত্রা পায়। এই মেয়েলি ভাষার ছাঁদ কেমন তা দেখে নিতে তাঁর রচনা থেকে কিছু দৃষ্টান্ত নিম্নে উল্লেখ করা হল।

'ননীখানসামার ছুটি যাপন' গল্পে ননী কাজের জন্য ঘরের বাইরে থাকে। একান্ত প্রয়োজনে ছুটি নিয়ে তবেই বাড়ি আসে। অত্যন্ত সাধারণ ছাঁদে জীবনযাপনের ছবি এখানে দেখানো হয়েছে। এই গল্পে পরিবারের জন্য ননী খানসামার দায়িত্ব দেখা যায়। এ দায়িত্বের মান রাখতেই এবং সংসারের সুবিধার জন্য ননীকে বাড়ি থেকে অনেক দূরে থাকতে হয়। এইরকম ভাবে কেটে যাবার মাঝে কোন একদিন হঠাৎ ছুটিতে বাড়ি এলে তার সঙ্গে তার স্ত্রী ও তাঁর মায়ের নানান কথাবার্তা থেকে মেয়েলি ভাষার ছাঁদ লক্ষ করা যায়। স্বামীর হঠাৎ আসায় স্ত্রী যখন জানতে চায়-

" সেদিন ঠাকুরপো বল্লে, চিঠিতে তুমি নিকেছ যে এখন তুমি মনীবের সঙ্গে খড়গপুর যাবে, এখন আর আসবে না। সেই পুজোর পর তবে। তাহলে কি রকম হল ? " ৩২

এই **ঠাকুরপো** শব্দে যেমন সংসারে বৌদি দেবর সম্পর্ক স্পষ্ট তেমনি পুরো উক্তিতে স্বামীর প্রতি একটা অনুযোগও দেখা যায়। তারপরে স্ত্রীর প্রশ্নের উত্তরে ননী মনীবের ইচ্ছায় ছুটি পেয়েছে বলে জানায়। এরপরে স্বামী আসার পর তার জামাকাপড় ননীকে কাচতে বারণ করলে ননী তার নিজের হাতে কূট হওয়ার কথা বললে স্ত্রী বাধা দিয়ে বলে-

"ওগো তা হয়নি জানি। কিন্তু গোলামীর ধাতে এত বরদাস্ত হবে কেন ?" ৩৩

এই **'ওগো'** শব্দের ব্যবহারে মেয়েলি ভাষা ফুটে ওঠে নতুন প্রাণ পেয়ে। এছাড়া ননীর স্ত্রী স্বামীকে পাণ দিতে চাইলে ননীর মা যখন বলে-

"পাণ এখন থাক বাছা, আগে তুমি ননীকে জল খেতে দাও।" ৩৪

এই **'বাছা'** শব্দের ব্যবহারে তাঁর মাতা রূপটি পরিস্ফুট হতে দেখা যায়। এইভাবে এক এক রকম শব্দের ব্যবহারে এক একটা ভূমিকা কে একটা সম্পর্কে আবদ্ধ হতে দেখা যায়। এখানেও মুখের ভাষা ভাতৃজায়া সত্ত্বা, স্ত্রীরূপ ও জননী রূপকে আলাদা করছে।

'আদেশ পালন' গল্পের কেন্দ্রীয় চরিত্র কনক ও ভাই লাল। গল্পের স্থান মহারাষ্ট্র। সেবা দাসীদের জীবন নিয়ে লেখা এক রচনা। এখানে কনক ব্রহ্মচারীণী, দেবসেবায় নিজেকে নিবেদন করে বিঠোবার মন্দিরের পাশের এক কুঠীরে আশ্রয় নিয়ে দিন কাটায়। এমনভাবে চলতে চলতে হঠাৎ একদিন তার কুটির প্রান্তে একজনকে পড়ে থাকতে দেখে পরিচারিকা যখন কনককে ডেকে বলে-

"মা শুনছো গা, আহা কোথাকার কে ভিনদেশি অচেনা লোক, একলা এসে বিঘোরে প্রাণটা হারালে বাছা!-"৩৫

এই বলার মধ্য দিয়ে পরিচারিকা চরিত্রের কোমলতা ও **'মা'** শব্দ ব্যবহারে যার পরিচারিকা তার প্রতি শ্রদ্ধা দেখা যায়। এইভাবে এক একটা চরিত্রকে ভাষা ব্যবহারের মধ্যে দিয়ে জীবন্ত হতে দেখা যায়।

'কার্য্য-কারণ' গল্পে এক তরুণীকে স্বামী ছেড়ে চলে যায়, যার ফলস্বরূপ তাকে জীবন চালিয়ে নেবার জন্য লোকের বাড়ি বাড়ি জল দেবার কাজ করতে দেখা যায়। এইভাবে চলতে চলতে বৈষ্ণব ঠোরের প্রধান ব্রজদাস বাবাজির নজরে পরে ওই তরুণী। নানান ভাবে প্রেম ও বিবাহের প্রস্তাব দিতে থাকে ব্রজদাস বাবাজি তবে তরুণী তা আমোল দেয়না। এই অবস্থার কথা যখন চারিদিকে জানাজানি হয় তখন প্রতিবেশীরা ওই তরুণীকে নিয়ে নানান কথা বলতে থাকে। একদিন পথের মধ্যে ওই তরুণীকে (শ্রীমতিকে) নীরবে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে প্রতিবেশীরা যখন কটাক্ষ করে বলেন-

" অ মা - ছুঁড়িটা কে গা, দাঁড়িয়ে কেন এমন ভঙ্গীতে ?" ৩৬

তখন এক বৃদ্ধ মুসলমান একথা শুনতে পেয়ে শ্রীমতিকে বাড়ি যেতে বলেন। এনাকে একদিন শ্রীমতি জল খাইয়ে প্রাণে বাঁচিয়েছিলেন। এ কথার মাঝেই এক প্রতিবেশী শ্রীমতি কে চিনতে পারায় তার কাছে বৃদ্ধ খুব ভালো মানুষ এবং একজন নৌকার মাঝি বলে পরিচয় দেয়। এসব কথায় কান না দিয়ে একজন স্থূলাঙ্গিনী প্রতিবেশী শ্রীমতিকে আপাদমস্তক দেখে নিয়ে সে কোথায় থাকে জানতে চাইলে আর একজন সঙ্গিনী বলে-

"ওমা! জান না, উনিই যে বনমালী দাস বাবাজির...!! ৩৭

এটা শুনে অন্য সঙ্গিনী বলে-

"অ মা, ইনি!" ৩৮

এ সমস্ত কথা শোনার পর শ্রীমতি সমস্ত কথা তো সব চুকে গেছে বলে, আবার কথা ওঠার কারণ জানতে চাইলে স্থূলঙ্গিনী বলে-

"চুকে ত গেছে, তা হলেও বৈষ্ণবের সেবায় দেহ দান না করলে কি জীবের মুক্তি আছে গা।" ৩৯

এই ভাবেই প্রতিবেশী চরিত্রের মুখের ভাষাতেই তাদের স্বভাব ধর্ম প্রকাশ পায়। একাধারে তারা কিছু ভুল ধারণাকে মেনে চলছে, অন্য ধারে তারা অন্যের বিষয়ে মাথা ঘামাচ্ছেন এমনকি অন্যকে না বুঝেই তারা নানা মন্তব্য করছেন। কানে কানে কথা, অর্ধ সমাপ্ত কথা ইত্যাদির মাধ্যমে তাঁদের নীচ মানসিকতার নমুনা পাওয়া যায়। এই ভাবেই প্রতিবেশী চরিত্ররা যে যেমন স্বভাব ধর্মে হাজির ঠিক তেমনই তার মুখের ভাষা দেখা যায় রচনায়। যা অত্যন্ত যথাযথ।

'অবাক' উপন্যাসে বেগম ও সোফিয়া দুই বোনকে আমরা দেখতে পাই। বেগম শিক্ষিত এবং শিক্ষাকে অবলম্বন করে নিজের পায়ে দাঁড়াবার স্বপ্ন দেখে, অন্যদিকে দিদি সোফিয়া বিবাহিত, স্বামী - সন্তান নিয়ে যার সাংসারিক জীবনযাত্রা দেখা যায় রচনায়। বেগম শিক্ষিত হওয়ার দরুন স্বাস্থ্য, সমাজ বিভিন্ন দিক দিয়ে তাকে সচেতন নারী হিসেবে উপন্যাসে লেখিকা দেখিয়েছেন। রচনার মধ্যে দুই বোনের খুনসুটির নানান দৃশ্য বর্তমান। এই খুনসুটির পর্ব থেকেই তাদের মুখের ভাষাকে দেখে নেবার চেষ্টা করব। একটা গান শোনাকে কেন্দ্র করে বেগম-সোফিয়ার খুনসুটি খুবই মজাদার। কি গান সোফিয়া জানতে চাইলে বেগম উঁচু ভাবের গান এসব নানান কথা বলে, সে নিজের একটা আধ্যাত্মিক ভাব দেখিয়ে সোফিয়ার কাছে সত্যিই সে আধ্যাত্মিক হচ্ছে কিনা জানতে চাইলে সোফিয়া বলে-

"হাঁ হাঁ, সবুর! বিয়ের জোয়াল কাঁধে পড়লে, ও আধ্যাত্মিকতা তিনদিনে চিরকুটে যাবে!" ৪০

এ কথা শুনে বেগম ব্যঙ্গ করে। তবে এ বিষয়ে তার ভয়ের কথা জানালে সোফিয়াও কিন্তু নিজের অল্প বয়সে বিয়ে করা নিয়ে আফসোস করে। সে নাকি আধ্যাত্মিক হবার সুযোগ পেল না এমন কথা শুনে বেগম আবারও ঠাট্টা করে যখন বলে-

"বলকি! বলকি! শুনে যে আমার আহ্লাদে হার্টফেল করবার যোগাড় হয়েছে!" ৪১

সোফিয়াও তখন বেগমকে ফাজিল আখ্যা দেয়। এমনকি বেগম সন্তান মানুষ করা নিয়ে সোফিয়াকে নানান পরামর্শ ও সতর্ক বার্তা দিলে সোফিয়া বেগমের উদ্দেশ্যে জানায়-

"তুই হচ্ছিস আস্ত পাষণ্ড ক্লাসের লোক! নিজের ওপর কি তোদের দয়ামায়া আছে, তাই দুখ্ দরদ বুঝবি? -তুই চিরদিনই এক অদ্ভুত সাইজের হয়ে রইলি।" ৪২

বেগম আবারও সেটা তার নসিবের ফল বলে সোফিয়া কে জানায়। এভাবেই দুই বোনের মধ্যে নানান বিষয়ে খুনসুটি, ঠাট্টা, সমঝদারী মনোভাব লক্ষ্য করা যায়। দুই বোনের মুখে যে ভাষা আমরা পাই তা থেকেই তাদের সম্পর্কের ছাঁদেরও পরিচয় মেলে। এই সম্পর্ক যেন আমাদের আর পাঁচটা পরিবারের মতই অত্যন্ত কাছের ও অত্যন্ত চেনা। তাই বলা চলে এ যেন মুখেরভাষা বনাম সম্পর্কের ছাঁদের আত্মদর্শন।

'রঙীন ফানুস' উপন্যাসেও মেয়েলি ভাষার ছাঁদে মনীব বাড়ির মেয়ে ও তার দেখভালের জন্য থাকা এক বিহারী দাসী (পার্বতী ওরফে বাবুয়ার মা) এবং কুর্মী সমাজের এক বাসিন্দা খন্তর চরিত্র জীবন্ত হয়ে ওঠে। কাহিনীর কেন্দ্রস্থল উত্তর বিহারের গয়া স্টেশন, তখন ফাল্গুনের পাহাড়ি শীত বিদ্যমান। মনোরমা নিঃসন্তান, বিধবা। একদিন স্কুলের এক বয়স্ক মেমের সঙ্গে দেখা করতে গিয়ে ফেরার পথে পার্বতীর সঙ্গে হাঁটতে হাঁটতে তাকে বলে-

"কি ঠান্ডা, পা দু'খানা যেন কেটে নিচ্ছে। কষ্ট হচ্ছে বাবুয়ার মা ?" ৪৩

উত্তরে পার্বতী জানায়-

"ডর লাগছে, বড় আঁধার।" ৪৪

এই কথার মাঝে নাগড়া জুতোর শব্দে তাকিয়ে দেখে খন্তরকে তারা দেখতে পায়, পরক্ষণেই খন্তর তাদেরকে এগিয়ে দেবার জন্য তৎপর হয়। এই যাবার পথে বিহারী দাসীরূপী পার্বতীর পরিচয় লাভ ও খন্তর কি করছে এসব প্রশ্নোত্তর আদান-প্রদান হতে দেখা যায় এবং জানা যায় সে পাহাড়ে গিয়েছিল। এসব শুনে মনোরমা তার কাছে আবদার রেখে বলে-

"আহা আগে যদি বলতে! আমরাও সঙ্গে যেতাম। তার বাবুর মা-বোন সকলের ইচ্ছা একদিন পাহাড়ে যান, লোকের অভাবে - হয় না। এবার যখন যাবে, বোল বাপু।" ৪৫

যাবার ইচ্ছের কথা শুনে খন্তর তাদের 'সুখী-দুবলা' মানুষ বললেও মনোরমা কিন্তু তার সিদ্ধান্তে অটল, পরবর্তীতে সে যেতে চায় পাহাড়ে। এই ভাবেই আলাপ আলোচনার পর বাড়ির কাছে পৌঁছে কাকিমাকে প্রণাম জানানোর কথা মনোরমাকে জানিয়ে যখন যেতে উদ্যত তখন মনোরমা তার উদ্দেশ্যে বলে-

"এস বাবা। গোবিন্দ মঙ্গল করুন। ধর্ম্মে মতি হোক। বাড়-বাড়ন্ত হোক। ফের বিয়ে-থা কর, সুখী হও।" ৪৬

যাইহোক এতসব কথার পর যখন বাড়ি যায় খন্তর তখন বাবুয়ার মা তাঁর পরিচয় জানতে চাইলে মনোরমা বলে-

"কে, খন্তর ? খুব ভাল ছেলে। ওদের ঝাড়টা ভাল। ওর মার কাছে আমি ছোটবেলায় মানুষ হয়েছি। আহা কি ভালই বাসত বুড়ি। তার কথা মনে এলে এখনো আমার মন কেমন করে। ছোট বয়সে আমার মা বাপ গিয়েছেন। তাকে আর কাকিমাকেই মা বলে জানতুম। চল, রাত বাড়ছে।" ৪৭

এই ভাবেই কিছু শব্দের ব্যবহারে মেয়েলি ভাষা যেমনই জীবন্ত তেমনই কুর্মি সমাজ ও তার বিবাহ রীতি ও মানুষের ব্যবহার অত্যন্ত সুন্দরভাবে পরিস্ফুট হতে দেখা গেল। মালিকের বাড়ির মেয়ে হিসেবে তার ভাষা ও তার দেখভালের নিমিত্ত দাসীর ভাষাও চরিত্র অনুযায়ী অনুকূল।

এই ভাবেই মেয়েলি ভাষায় মাতা, স্ত্রী, বোন, মনীব বাড়ির মেয়ে, দাসী ইত্যাদি নানান চরিত্র জীবন্ত হতে দেখা যায় তাঁর রচনায়। যা দেখে তাদের খুব কাছের পরিচিত চরিত্র বলে আমাদের মনে হয়। মেয়েলি ভাষার ছাঁদের এমন ধরনই আমরা লেখিকার রচনায় দেখতে পাই।

৪। সাঙ্কেতিক ভাষার নমুনা-

প্রথমেই আমরা সাঙ্কেতিক ভাষা কি সেটা সম্পর্কে একটু বলে নেওয়ার চেষ্টা করব। আসলে সাঙ্কেতিক ভাষা এমন সেখানে যেটা শুনতে পাওয়া বা দেখতে পাওয়া হয় তার একটা আলাদা অর্থ থাকবে অর্থাৎ চিহ্ন, প্রতীক বা ইশারায় এর প্রকাশ করা হয়। এটা মৌখিক ও লিখিত দুই ধরনেরই হয়। তাই বলা যায় এই ভাষাকে মুখের অভিব্যক্তি, শরীরের অঙ্গভঙ্গি, চোখের পাতা ইত্যাদি প্রায়ভাষিক উপাদান দ্বারা প্রকাশ করা হয়। এইরকমই সাঙ্কেতিক ভাষার ছবি আমরা শৈলবালা ঘোষজায়ার 'নিরঞ্জন সর্দার' গল্পে পাই। গল্পের কেন্দ্রীয় চরিত্র নিরঞ্জন সর্দার, সে বাড়ি থেকে ষোলো ক্রোশ দূরে এক জমিদারের বাড়িতে লাঠিয়ালের কাজ করে। বিশেষ প্রয়োজন ছাড়া সে ছুটি নেয় না। একদিন তার মার অসুস্থতার খবর লেখা এক চিঠি পড়ে জমিদার বাবুই তার বাড়ি যাবার ব্যবস্থা করে দেন। বাড়ি পৌঁছে মা সুস্থ আছে দেখে এবং কোনো চিঠি তাকে পাঠানো হয়নি জানতে পেরে সে মনীবের বিপদ ও সমস্তটা ডাকাত দলের কাজ ভেবে তৎক্ষণাৎ

ষোলো ক্রোশ পথ পার করে যখন পৌঁছায় দেখে সত্যিই ডাকাত এর দল জমিদার বাড়ির ভিতরে ঢুকে পড়েছে। সঙ্গে সঙ্গে প্রচন্ড জোরে ভয় নেই বলে জানিয়ে নিরঞ্জন তার উপস্থিতি জমিদার বাবুকে জানায়। নিরঞ্জনের জানা ছিল ডাকাতের মূল মাথা কখনো ভিতরে প্রবেশ করে না, সে বাইরে থেকে নানান সতর্কবার্তা প্রেরণ করে। যারা দলের মধ্যে অল্প শিক্ষিত তারাই ভিতরে ঢুকে লুটপাট, ভাঙচোর করে। তাই কৌশলে নিরঞ্জন ভেবেচিন্তে এগোয়, দেখতে পায় প্রকাণ্ড ঘরের মধ্যে চারজন সুদক্ষ খেলোয়াড়-ডাকাত ভীষণ হুংকারে লাঠি ও তরোয়াল খেলতে খেলতে এক কোন হইতে অন্য কোনে ছুটাছুটি করছে। এই খেলাটার একটা নাম আমরা লেখিকার লেখা থেকে জানতে পারি। সেখানে লেখিকা লিখেছেন-

"ডাকাতি- ভাষায় এ-দেশে ই ইহাকে 'কালীর পাক খেলা' বলে।" ৪৮

এই খেলার দৃশ্য নিরঞ্জন দেখার পরে আরো অন্য দৃশ্য তার নজরে আসে সে দেখতে পায় এখানে খেলায় মত্ত ডাকাতেরা ভিতরের ডাকাতের দলের উদ্দেশ্যে চিৎকার করে বলছে-

"মাছি পড়েছে - জাল গুটো --"৪৯

অর্থাৎ প্রবল শত্রু সামনে, তাই পালিয়ে যাবার পথ বাছতে নির্দেশ দেওয়া হচ্ছে সাঙ্কেতিক ভাষা ব্যবহারের মধ্য দিয়ে। এই সমস্ত কিছু দেখে ও শুনে সে বীর বিক্রমে ডাকাতের মাথাতেই আক্রমণ করে প্রথমে তারপর যা কিছু নিয়েছে সমস্ত কিছু রাখার কথা জানায়। ডাকাতের দলের লোকজন ধরা পড়ে তার কথা শুনতে বাধ্য হয়। এভাবেই সেদিন নিরঞ্জন সর্দার নিজের বুদ্ধি বলে ও শক্তি বলে জমিদার বাড়িকে ডাকাতির হাত থেকে রক্ষা করে। এই ডাকাতির ঘটনার মধ্যে দিয়ে লেখিকার সাঙ্কেতিক ভাষা সম্পর্কে সম্যক জ্ঞানের

পরিচয় আমরা পেলাম। সঙ্গে সঙ্গে ডাকাতদের ব্যবহৃত সাংকেতিক ভাষা থেকে আমাদেরও সেগুলো সম্পর্কে ধারণা তৈরি হল। এই ভাবেই সাঙ্কেতিক ভাষার প্রয়োগ ও বার্তা প্রেরণের দৃশ্য আমরা রচনার মধ্যে দিয়ে দেখতে পেলাম।

৫। প্রশ্নোত্তর চলনের গদ্যের ব্যবহার-

শৈলবালা ঘোষজায়ার রচনার মধ্যে কয়েকটি রচনায় প্রশ্নোত্তর চলনের গদ্যের ব্যবহার লক্ষ্য করা যায়। পুরো রচনাটাই একটা প্রশ্ন ও উত্তর দানের মধ্যে কাহিনী এগিয়ে যাচ্ছে পরিণতির দিকে। এইরকমই কতকগুলি রচনা হল 'বজ্র ঝংকার' গল্প, 'লাফো' গল্প, 'অবাক' উপন্যাস। এই রচনাগুলি থেকে নমুনা প্রদর্শনের মধ্যে দিয়ে এখন আমরা বিষয়টি দেখে নেওয়ার চেষ্টা করব।

এ প্রসঙ্গে প্রথমেই 'বজ্র ঝংকার' গল্পটির দিকে চোখ রাখলে দেখতে পাওয়া যায়, এক পাঠমগ্ন সুন্দরী (আমিরাণ) ও এক ফকির সাহেবকে। এই ফকির সাহেব তথা তেজস্বী সিংহ আসলে আমিরাণের স্বামী এই দুই চরিত্রের কথোপকথন প্রশ্নোত্তর প্যাটার্নে আবদ্ধ। এখানে সাধনাকে কেন্দ্র করে সমাজে নারী ও পুরুষ ভেদ, নারীর স্থান, পুরুষের পুরুষত্বের অহংকার ইত্যাদির মত বিষয়গুলিকে দেখা যায়। এই সাধনা নিয়েই আমিরাণে নামের ওই তরুণীর একনিষ্ঠতা লক্ষ করা যায় এবং এই পথকে বিচলিত করতেও ফকিরের নানান মন্তব্য দেখা যায় গল্পটিতে।

পাঠমগ্ন তরুণীকে (আমিরাণকে) ফকির জানায় সে এমন ধৃষ্টতা করলে আসবে না। ফকিরের কথায় সে বলে-

"বাসনা ক্ষোভের হাত এড়িয়ে চলতে গিয়ে আবার জড়িয়ে পড়বার চেষ্টায় আছ। নয় কি ?"৫০

উত্তরে ফকির নিজের মনের অশান্তি ও অস্থির চিত্তের কথা জানিয়ে বাড়ির পথে পা বের করাকে ভুল বললে আমিরাণও জঙ্গলকে ফকিরের জন্য শ্রেয় বলে জানায়। ফকির আবার প্রশ্ন করে-

"গৃহকোণে নির্জ্জনতা আছে কি ?"৫১

আমিরাণও জানায়-

"আছে যদি মনে নির্জ্জন করে নিতে পারা যায়।"৫২

এই উত্তরে আমিরাণের দিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থাকলে আমিরাণ বলে-

"কি দেখছ ফকির ?"৫৩

ফকির বলে-

"দুর্ব্বোধ্য প্রহেলিকা ! যদি স্ত্রী না হতে, তোমায় পূজা করতুম !"৫৪

আবারো আমিরাণ প্রশ্ন করে-

"স্ত্রী হওয়ার অপরাধেই বুঝি-পদাঘাত করেছিলে ?" ৫৫

প্রশ্নের মুখে পাল্টা প্রশ্ন দিয়ে ফকির জানায়

"পদাঘাত তোমায়? তোমায় পদাঘাত ?"৫৬

আমিরাণের উত্তর-

"আমার নয়। আমার লৌকিক সম্মানকে! রাগ হল আমার আত্মীয়দের ওপর, তুমি শাস্তি দেবার জন্য ত্যাগ করলে আমায় !"৫৭

এসব শুনে আবার গৃহী হতে চাওয়ার বাসনা জানালে আমিরণ জানায়-

"সে কামনাও আছে না কি ?" ৫৮

উত্তরে তীব্র জেদ এনে ফকির বলে-

"যদিই থাকে।" ৫৯

আমিরাণ জানতে চায়-

"গৃহ আছে?" ৬০

ফকির বলে-

"সম্পূর্ণই আছে।" ৬১

আমিরন বলে-

"গৃহিণী ?" ৬২

ফকির বলে-

"সশরীরে সামনে বিদ্যমান"৬৩

এই ভাবেই ফকিরের পুনরায় গৃহে ফিরে আসার বাসনা, সন্তান কামনা ইত্যাদি বিষয়গুলি প্রশ্ন ও উত্তর দানের মাধ্যমে দেখতে পাওয়া যায়। তাইতো আমিরণ যখন জানতে চায়-

"দেহের আর গৃহের সংবাদে যোগীর প্রয়োজন কি ?"৬৪

উত্তরে ফকির বলে-

"অদম্য আকর্ষণ !" ৬৫

ফকিরের মনের উদ্দেশ্য আমিরনের কাছে প্রকাশ পেয়ে গেলে ফকির নারীর সাধনা প্রসঙ্গে নারীকে ছোটো করে, সাধনার বদলে সংসার তাদের শ্রেয় বললে তার সমস্ত কথার জবাবে আমিরনের একটা বাক্যই গুরুত্বপূর্ণ তা হল-

"তোমার প্রেমত্বলাভ আমার প্রার্থনীয় নয়। দেবত্বলাভই বাঞ্ছনীয়।" ৬৬

এই ভাবেই ফকিরের সমস্ত ইচ্ছাকে উপেক্ষা করার মধ্য দিয়ে কাহিনী পরিণতি পেয়েছে।

'অবাক' উপন্যাসেও প্রশ্নোত্তর চলনের গদ্য লক্ষ করা যায় রচনার বেশিরভাগ অংশ জুড়ে। রচনাটিতে বেগমের শিক্ষা, স্বাবলম্বী হওয়ার বাসনা, যুক্তিবাদী মনের ও বিভিন্ন বিষয়ে সচেতনতার ছবি দেখা যায়। একদিকে থাকে সমাজের নানান বিষয়, অন্যদিকে থাকে বেগম চরিত্রে সমস্ত কিছুকে বিবেচনা করে দেখার মত মানসিকতা। এখন এই প্রশ্নোত্তর প্যাটার্নের দৃষ্টান্ত দেখাতে বেগম ও তার দিদির কথোপকথনের একটি অংশ তুলে ধরার চেষ্টা করব। বেগমের দিদি সোফিয়া বিবাহিতা, তখন বাড়িতে বেগম বিবাহযোগ্য তাই প্রায়শই তার বিয়ে দেবার কথা বাড়িতে ওঠে। এই বিয়ে প্রসঙ্গে কথা উঠলেই বেগম তা পাত্তা দেয় না, সে পড়াশোনা করতে চায় তবে এ প্রসঙ্গে সুযোগ পেলে দিদির সঙ্গে ঠাট্টা করতেও ছাড়ে না। এই রকম ভাবেই অনেকবার বিয়ের কথা এড়িয়ে যাওয়া বেগম বিয়ে নিয়ে পছন্দের কথা সোফিয়া কে জানায়। বেগম তার পছন্দের মানুষের সঙ্গে বিয়ে দেবে নাকি সোফিয়াকে জানতে চাইলে সোফিয়াও অবশ্যই দেবে বলে অত্যন্ত আগ্রহের সঙ্গে জানতে চায়-

"বল্ না রে, কে সে লোকটা ?---"৬৭

বেগম বলে-

“দ্যাখো বাবু তোমারা ভবের হাটে দোকান-পাঠ সাজিয়ে বসে, পুরোদমে ব্যবসাদারী সুরু করে দিয়েছ, - আমার মত অব্যবসায়ী ক্লাশের লোক, তোমাদের স্বভাবতঃই একটু ভয় করে চল্‌তে বাধ্য হয়— ” ৬৮

অধৈর্য হয়ে সোফিয়া আবার বলে-

“দ্যাখ্‌, ফের যদি চিবিয়ে চিবিয়ে চিপ্‌ টেন্‌ ঝাড়্‌বি, তাহলে তোর ঘাড়ে এবার এক থাবড়া বসাবো! বল- না লোকটা কে ?” ৬৯

এবারে বেগম বলে-

“বলি, বিয়েটা দেবে তো সত্যি? —”৭০

উত্তরে সোফিয়া বলে-

“দ্যাখ্‌ ভাই, আমি তো একলা সুধু তোর মুরুব্বি নই। মাথার ওপর আরো বড় দরের মুরুব্বি সবাই আছেন। তবে আমি কসম্‌ খেয়ে বল্‌ছি, যাকে তোর আন্তরিক পছন্দ, তার সঙ্গে তোর বিয়ে দেবার জন্য মুরুব্বিদের কাছে আমি প্রাণপণে ঘট্‌কালি কর্‌র্‌ব !” ৭১

এবার একটু স্বস্তি পেয়ে বেগম বলে-

“দ্যাখো, ঠিক পাকা কথা দিচ্ছ তো ?”৭২

এ প্রশ্নে সোফিয়ার উত্তর-

“আলবৎ !”৭৩

এ উত্তর দিয়েই সোফিয়া প্রশ্ন করে-

“কিন্তু কুলেশীলে আমাদের সঙ্গে মিলবে তো ?”৭৪

বেগম সজোরে জানায়-

"বটে আর কি ! আমার পছন্দ-শক্তিটা এম্নিই কাণ্ডজ্ঞান বিবর্জিত যেন ! তাই বিয়ে করবার জন্য পছন্দ করে বস্‌ব যেন তোমার সেই হীরেমন তোতাটার রং' এর বাহার্‌কে ! আমি এম্নিই উজ্‌বুক্‌ আর কি !"৭৫

একথাই সোফিয়া আবার প্রশ্ন করে-

"আচ্ছা আচ্ছা, বল্‌ সে কে ?"৭৬

বেগম আবার হেঁয়ালি করে বলে-

"দ্যাখো-জি, 'যাচিয়ে সাঙা' কর্‌ছ, এর পর আমায় কসুরের দায়ে ফেল্‌লে চল্‌বে না, বুঝলে? রাজি?"৭৭

বারবার এক কথা শুনতে শুনতে সোফিয়া অত্যন্ত রেগে বলে-

"দ্যাখ, আমার ইচ্ছে করে, তোর ঠোঁট দুখানার ওপর খানিকটা নাইট্রিক এ্যাসিড্‌ ঢেলে দি, — যেন জন্মের মত ও-দুটো গোল্লায় যায় ! বাপ্‌ বাপ্‌ — কি বক্তার মেয়েই হয়েছিস্‌ ! যেন আস্ত উকিল একেবারে ! —"৭৮

এই প্রশ্নোত্তর দানের মাধ্যমে সোফিয়ার সঙ্গে নানা হেঁয়ালি ও ঠাট্টার পর বেগম অবশেষে যখন বলে-

"তবে, দাও ভাই, ঐ বই-ভরা আলমারীটার সঙ্গে আমার বিয়ে ! দোহাই ধর্ম্ম, সাচ্চা বলছি সোফি, — ওকেই আপাততঃ আমি আন্তরিক পছন্দ করি, ভয়ানক ভালবাসি ! ওর হাতেই আমি — সেই যে গো, কি বলো তোমরা, —সেই "মন প্রাণ সঁপা" নয় ? সেটা ওর হাতেই সঁপে দিয়েছি। এবার নিয়ে এসো ভাই বরমাল্য ! —"৭৯

এতবার সাধাসাধির পর বেগমের মুখে এই উত্তর শুনে সোফিয়া অত্যন্ত রেগে যায় এবং বেগমের কপালে বিয়ে নেই বলে জানায়। এভাবেই এই অংশে আমরা প্রশ্নোত্তর চলনের

গদ্য দেখতে পেলাম। কাহিনীর অনেকাংশেই বিভিন্ন প্রসঙ্গ নিয়ে এই দুই চরিত্র ও অন্যান্য চরিত্রের সঙ্গেও এই প্রশ্নোত্তর চলনের গদ্যের দৃষ্টান্ত দেখা যায়।

অনুরুপে 'লাফো' গল্পের দিকে তাকালেও দেখতে পাব প্রশ্ন উত্তর ধরণের গদ্য। সুদূর রেঙ্গুনে বসে বিজয়া দশমীর দিন এক প্রবাসী ঠিকাদার বাড়ির কথা ভাবতে ভাবতে বিরক্ত হয়ে কাজ ফেলে রেখে বাইরে বের হলে পথের মধ্যে কাঠের কারখানাওয়ালা লাফো মগের সঙ্গে তার দেখা হয়ে যাওয়ার দৃশ্য গল্পের শুরুতেই আছে। এই সূত্র ধরে দুজনের এবং দেশের বাড়িতে দশমীর দিনের প্রসঙ্গে কথা হতে হতে লাফোর সেই দশমীর রাতের ভয়ংকর স্মৃতি মনে ভেসে মন বড়ই বিচলিত হতে দেখা যায়। আর তার এই মনের অবস্থা ও ঘাটের পাশে দেবদারু গাছে ঝুলানো টাটকা বনফুলের মালা দেখে ঠিকাদার লাফোকে জিজ্ঞাসা করে-

> "ওটা ওখানে কে রেখেছে লাফো ?"৮০

উত্তরে লাফো জানায়-

> "আমি সখ করিয়া মালা-টালা মাঝে মাঝে গাঁথিলে ওইখানে পরাইয়া দিই।"৮১

এটা শুনে ঠিকাদার আবার জিজ্ঞাসা করে-

> "তা ওখানে কেন ? "৮২

এবার কথাটা এড়ানোর জন্য লাফো একটু হাসার চেষ্টা করে, ঢোক গিলে একটু সামলে নিয়ে উত্তর দেয়-

> "জ্যোৎস্না রাত্রি, চারিদিকে খুব ফুল ফুটিয়া ছিল — আর কি জানেন, দেবদারু গাছটা আমি বড় —"৮৩

এইভাবেই অসমাপ্ত ভাবে লাফো কথা শেষ করাতে ঠিকাদারের কৌতূহল বাড়ে আবারও জিজ্ঞাসা করে-

"ব্যাপারখানা কি ?"৮৪

এবার লাফো আর নিজেকে সম্বরন করতে না পেরে অত্যন্ত বেদনার সঙ্গে বলে-

"সত্যই যদি জানতে চাহেন বাবু সাহেব, আচ্ছা শুনুন তবে বলি। বাহিরে আপনারা আমার যে চেহারাটা দেখিতে পান, —বাস্তবিক আমি তাহা নহি, এটা আমার ছদ্মমূর্ত্তি !" ৮৫

এমন কথা শুনে অবাক হওয়া ঠিকাদারের উদ্দেশ্যে লাফোর প্রশ্ন-

"আচ্ছা বাবু সাহেব, আপনিও কি আমায় সত্যকার লাফো বলিয়া বিশ্বাস করেন ?" ৮৬

ঠিকাদার আবারও বিস্ময়ে প্রশ্ন করে-

"কি বল দেখি ?" ৮৭

লাফো এবার পরিষ্কার করে বলেই ফেলে-

"আপনি বাঙ্গালী হইয়া, এমন বুদ্ধিমান লোক হইয়াও আমায় ঠাওরাইতে পারেন নাই? আশ্চর্য্য বটে। —আপনি বিশ্বাস করেন কি, আমি বাংলা দেশের একজন খুনি আসামী ?"৮৮

এ প্রশ্নে হতবাক ঠিকাদার বলে ওঠে-

"অ্যাঁ, সত্য নাকি ?" ৮৯

এইভাবেই ঠিকাদারের প্রশ্নের জবাবের মধ্যে দিয়েই লাফো কেন খুনী আসামী, কেন দেবদারু গাছে ফুলের মালা দেওয়া অর্থাৎ সর্বোপরি লাফোর জীবন ইতিহাস দেখা যায় গল্পের মধ্যে। লাফোর জীবন বৃত্তান্ত বলার মাঝে মাঝে ঠিকাদারের মনের কৌতূহল প্রকাশ অর্থে ব্যবহৃত 'তারপর' শব্দের ব্যবহার প্রশ্নোত্তর চলনের গদ্যকে আরও গতিদান করে।

এইভাবে এই রচনার মধ্যে লাফো ও ঠিকাদারের প্রশ্নোত্তরের বাঁধনে কাহিনী সমাপ্তির দিকে এগিয়ে যায়।

৬। কথন-

কথন এর বুননেই আখ্যানের কাহিনী সূচনা থেকে সমাপ্তির দিকে এগিয়ে যায়। এই কথনেরও আবার পুরুষ, প্রেক্ষিত ইত্যাদির ওপর নির্ভর করে অনেক প্রকার আছে। কাহিনী তলে কথকের উপস্থিতির উপর নির্ভর করে গঠিত হয় কথনরীতি। কথক কাহিনী তলে উপস্থিত থাকলে উত্তম পুরুষের কথন রীতি বলে গ্রাহ্য হতে দেখা যায়। উত্তম পুরুষ এর উপর নির্ভর করে গড়ে ওঠা কথন ধরনটা মূলত আত্মকথনধর্মী বলে বিবেচিত হয়। এছাড়াও স্থান, কালের অবস্থান এর উপর ভিত্তি করে গড়ে ওঠে প্রেক্ষিত। প্রেক্ষিতের উপরেও কথন পরিস্থিতি নির্ভর করে। তাই অন্তঃস্থ নিরীক্ষণের ফলে সৃষ্টি হওয়া অন্তঃপ্রেক্ষিত আত্মকথন পরিস্থিতির জন্ম দেয় এবং বহিঃস্থ নিরীক্ষণে সৃষ্টি হওয়া বহিঃপ্রেক্ষিত জন্ম দেয় সর্বজ্ঞ কথন পরিস্থিতির। এই ভাবেই পুরুষ, প্রেক্ষিত এর উপর নির্ভর করে কথার দ্বারা সজ্জিত আখ্যান কথনের তিনটি ধরন আমরা দেখতে পাই তা হল-

(ক) আত্ম কথন।

(খ) সর্বজ্ঞ কথন।

(গ) ভূমিকানুগ কথন।

এখন আমরা কখন কোন পরিস্থিতি তৈরি হলে কোন কথন বলব সেই বিষয়টা একটু বলে নেওয়ার চেষ্টা করব। এ প্রসঙ্গে প্রথমেই কাহিনী বর্ণনায় কথকের অবস্থান ও

প্রেক্ষিতের উপর নির্ভর করে উপরে উল্লেখ করা কথন রীতি গুলির পার্থক্যটা একটু নিম্নে বর্ণনা করলাম।

কথন চরিত্রের অবস্থান	প্রেক্ষিত	কথন পরিস্থিতি
১। কাহিনী তলে কথকের অবস্থান।	অন্তঃপ্রেক্ষিত	আত্মকথন পরিস্থিতি।
২। কাহিনী তলে কথকের না থাকা। এখানে একটা প্রতিফলক চরিত্র থাকে তারই নিরীক্ষণ ব্যবহৃত হয়।	অন্তঃপ্রেক্ষিত	ভূমিকানুগ কথন।
৩। কাহিনীর বাইরের নিরীক্ষক যদি কথক হয়।	বহিঃপ্রেক্ষিত	সর্বজ্ঞ কথন

অর্থাৎ কোন অবস্থানে কথক থাকছে, কোনো ঘটনাকে কে দেখছে, কিভাবে দেখছে ইত্যাদির উপর নির্ভর করেই কথনের রীতি গুলির এক এক ধরনের বৈচিত্র তৈরি হতে দেখা যায়। এখন আমরা এই তিন ধরনের কথন রীতি কিভাবে লেখিকা শৈলবালা ঘোষজায়ার রচনার মধ্যে উপস্থিত সেটা একটু দেখে নেবার চেষ্টা করব।

এ প্রসঙ্গে প্রথমেই আত্মকথন পরিস্থিতির কথায় আসা যাক। এই ধরনের রীতি দেখে নেওয়ার জন্য লেখিকা শৈলবালা ঘোষজায়ার 'পাঠশালার স্মৃতি' নামক গল্পটি নির্বাচন করা হল। গল্পের শুরুতেই লেখিকা লিখেছেন-

"এ দেশের তথাকথিত পাঠশালার গুরুমহাশয়দের স্মৃতি, - অনেক ছাত্র-ছাত্রীর মনকে বুড়ো বয়সেও ক্লান্ত করিয়া তোলে। কিন্তু সৌভাগ্যবশে বর্ধমান রাজবংশের বদান্যতায় আমরা শৈশবে যে

পাঠশালায় পরিবার সুযোগ পাইয়াছিলাম, – সেখানকার সুমধুর স্মৃতি আজও আমার মনকে শ্রদ্ধাবহ আনন্দ মাধুর্যে পরিপূর্ণ করিয়া রাখিয়াছে।" ৯০

এইকথার বর্ণনায় লেখিকা তাঁর পূর্ব স্মৃতি বর্তমানে তুলে ধরেছেন। কথকই এখানে কাহিনীতে চরিত্র হিসাবে অবস্থান করছে। কাহিনী তলের মধ্যে থেকে আমির বচনে কাহিনীকে পরিণতি লাভ করতে দেখা যায়। যা আত্মকথন রীতির শর্তকেই মেনে চলে। তাই এই কথনরীতি আত্মকথন রীতি হিসাবেই মর্যাদা পায়।

পরবর্তী কথন রীতি ভূমিকানুগ কথন রীতির প্রসঙ্গে উদাহরণ স্বরূপ এসে পরে 'লাফো' গল্পের কথা। এখানে নিরীক্ষক কখনও কথক আবার কথনও চরিত্র বা ভূমিকা। শুরুতে বাবুসাহেব এর দেখা মেলে। ইনিই গল্পের নিরীক্ষক। এই নিরীক্ষকই কখনও কথক আবার চরিত্র। বাবুসাহেবের বয়ানেই গল্পের শুরু। সেখানে সে রাস্তায় দেখা হওয়া এক পরিচিতের প্রশ্নের উত্তরে ভাবতে ভাবতে জবাব দেয়-

"পাঁচ বৎসরব্যপী আমার এই ঠিকাদারী ব্যবসায়ের খাতিরে এই শ্রেণীর লোকদের সঙ্গে বিলক্ষণ আলাপ পরিচয় রাখিতে হইয়াছে। বিশেষ লাফোমগের অমায়িকতার জন্য তাহাকে আমি ব্যবসায় সম্পর্কের অতিরিক্তও একটু ঘনিষ্ঠতা দেখাইতাম, ক্রমে সম্পর্কটা হৃদ্যতায় পরিণত হইয়াছিল। লাফোর প্রশ্নের উত্তরে আমিও মগ ভাষায় বলিলাম, একটু বেড়াইতে বাহির হইয়াছিলাম।" ৯১

এখানে এই বাবু সাহেবের বলার মধ্য দিয়েই গল্প এগিয়ে চলে। লাফো চরিত্রও প্রতিফলিত হয় গল্পের কথায়। এখানে ভূমিকানুগ কথনের শর্ত অনুযায়ী নিরীক্ষক কখনও কথক, কখনও কাহিনীতলের চরিত্র বা ভূমিকা। তাই গল্পের শুরুতে বাবু সাহেবই কথক তবে গল্প বলার মাধ্যমে পুরো গল্প জুড়ে লাফোকে কথা বলার সুযোগ করে দিয়েছেন। এবং নিজে নিরীক্ষকের ভূমিকা পালন করেছেন। তাই ভূমিকানুগ কথন হিসাবে যথাযথ। এই

ভাবেই সব রকম কথন রীতির ব্যবহার আমরা লেখিকার বিভিন্ন রচনায় দেখতে পেলাম যা যথাযথ বাঁধনে বাঁধা।

সবশেষে সর্বজ্ঞ কথন পরিস্থিতি দেখে নেবার চেষ্টায় লেখিকার রচিত ‘নিরঞ্জন সর্দার’ নামের গল্পটি নির্বাচন করলাম। গল্পটিতে কথক কাহিনীর বাইরের কেউ। তাই এই বাইরে থেকে কিভাবে কাহিনীর গতিদান করেছেন কথক তারই একটি নমুনা গল্প থেকে তুলে ধরার চেষ্টা করব। গল্পের শুরুতেই লাঠিয়ালদের শিক্ষা ও জীবনযাত্রার কথা বোঝাতে যখন বর্ণনা দেন-

> “ইহারা লেখাপড়া শিখিবার কিছু মাত্র সুযোগ পাইত না। সাধারণ যাত্রাগান, কথকতার আসর ছাড়া কোথাও কিছু মাত্র সুশিক্ষা পাইবার সুবিধা ছিল না। তবু ইহাদের মধ্যে কতকগুলি সরল নৈতিক চেতনা সতত জাগরিত থাকিত। যেমন, প্রভুভক্তি, বিশ্বস্ততা এবং আজ্ঞানুবর্তিতা।” ৯২

এইভাবেই সর্বজ্ঞকথনের প্রথম শর্ত কথকের কাহিনীর বাইরে অবস্থান যা এখানে মানা হয়েছে। তাই সর্বজ্ঞকথন হিসাবে যথাযথ। এই রীতি মেনেই লেখিকা ‘বিজয়ার নমস্কার’, ‘মনীষা’, ‘ভন্ডের সার্থকতা’ ইত্যাদির মতো আরও গল্প রচনা করেছেন।

৭। কাহিনী কাল-কথনকাল, চরিত্র ও সংলাপ-

আখ্যান হল কাহিনী, চরিত্র, সংলাপ এর ব্যবহারে তৈরি হওয়া একটি মানবিক অভিজ্ঞতার বহিঃপ্রকাশ। যার প্রকরণে গল্প, উপন্যাস এসে ভিড় করে। আর এই উপন্যাস ও গল্পের কেন্দ্রে থাকে কাহিনী, সংলাপ, কথক। আখ্যানের উপাদানই হল– কাল বা সময়, ভূমিকা-চরিত্র, সংস্থান, কাহিনী। সমস্ত উপাদানের সহযোগেই আখ্যান তার নির্দিষ্ট প্রকরণের মাধ্যমে সমাজে নানান রকম বার্তা দিয়ে থাকে।

কাহিনীকাল ও কথনকাল প্রসঙ্গে বলতে গেলে প্রথমেই সময়টা গুরুত্বপূর্ণ। এর উপর ভিত্তি করেই কথকের অবস্থান বোঝা যায়। যেকোনো আখ্যানের কাহিনীর একটা সময় থাকে সেটাকেই কাহিনী কাল হিসাবে চিহ্নিত করা হয়। অপরদিকে কথনের সময়টা কখন তার ভিত্তিতে নির্ধারিত হয় কথনকাল। এই কথনকালের সময়ের প্রকাশের দ্বারা কথকের অবস্থান কাহিনীর ভিতরে না বাইরে তা বোঝা যায়। এখন আমরা শৈলবালা ঘোষজায়ার রচনা থেকে এই সময়ের প্রেক্ষিতে কাহিনী কাল ও কথন কাল বিষয়টি একটু বুঝে নেবার চেষ্টা করব। প্রসঙ্গত কতকগুলো অংশ তুলে ধরার চেষ্টা করব। যেমন 'নিরঞ্জন সর্দার' গল্পের শুরুতেই লেখিকা যখন লেখেন-

"প্রায় একশত বৎসর আগের কথা। তখন বর্ধমান জেলা উৎকৃষ্ট স্বাস্থ্যকর স্থান ছিল। বর্ধমানের বিখ্যাত দামোদর নদে তখনও 'বাঁধ' হয় নাই। দেশে ম্যালেরিয়া দেখা দেয় নাই। দেশের নর-নারীর স্বাস্থ্য ছিল সুদৃঢ় মজবুত। তাহার খাইতে পারিত, এবং সহজেই খাইতে পাইত,- যথেষ্ট নির্ভেজাল খাদ্য। হজম করিতে পারিত নির্বিঘ্নে। হাঁটিতে ও খাটিতে পারিত প্রচুর। " ৯৩

এখানে কাহিনী কাল কথন কালের থেকে প্রায় একশত বৎসর আগের। তাই স্বাভাবিকভাবেই কথক কাহিনী তলের বাইরের কেউ এবং সে রচনাটির মধ্যেকার কোন ভূমিকা বা চরিত্র নয়।

তবে আত্ম কাহিনীর ক্ষেত্রে কথকের এই প্রসঙ্গটা একটু অন্যরকম। সেখানে কাহিনীকালে থাকে তারই দেখা কিছু আগের স্মৃতি। কথক কাহিনী তলের মধ্যেই অবস্থিত। যেমন 'লাফো' গল্পে এক ঠিকাদার ও লাফোর প্রশ্নোত্তর চলনের মধ্যে দিয়ে কাহিনী গতি লাভ করছে। সেখানে ঠিকাদারের কাছে স্মৃতিচারণা করতে গিয়ে যখন লাফো বলে-

"আজ পঁয়ত্রিশ বছর এ সব কথা কাহাকেও বলি নাই, বলিবার দরকারও হয় নাই। কিন্তু আজ আপনি স্মরণ করাইয়া দিলেন- আজ বিজয়া দশমী। আজিকার রাত্রে এখানে কিছু লুকাইব না, সমস্ত সত্য বলিব। বাবু সাহেব, পৃথিবীর মধ্যে যাহাকে সর্ব্বাপেক্ষা বেশি ভালোবাসিতাম, তাহাকেই নিজের হাতে খুন করিয়া-ওই গাছের তলায় তাহার মাথা পুঁতিয়া রাখিয়াছি। এই বিজয়া দশমীর তিথিতে- সে ঠিক আজ পঁয়ত্রিশ বছর পূর্ণ হইল।" ৯৪

তখন এখানে এই কথা থেকে বোঝা যায় কাহিনী কাল অতীতের কিন্তু কথন কাল স্বাভাবিকভাবেই বর্তমান কালের এবং কথক ও কাহিনী তলের অন্তর্গত একজন।

অনুরূপভাবে আরও একটি রচনা 'পাঠশালার স্মৃতি' এখানে শুরুতেই লেখিকা লিখেছেন-

"এদেশের তথাকথিত পাঠশালার গুরুমহাশয়দের স্মৃতি, -অনেক ছাত্র-ছাত্রীর মনকে বুড়া বয়সেও ক্লান্ত করিয়া তোলে। কিন্তু সৌভাগ্যবশে বর্ধমান রাজবংশের বাদান্যতায় আমরা শৈশবে যে পাঠশালায় পড়িবার সুযোগ পাইয়াছিলাম, —সেখানকার সুমধুর স্মৃতি আজও আমার মনকে শ্রদ্ধাবহ আনন্দ মাধুর্যে পরিপূর্ণ করিয়া রাখিয়াছে ।" ৯৫

এখানেও শৈশবের বর্ণনা থেকে অতীতকালই উঠে আসে। তাই কাহিনী কাল অতীতের, কথন কাল বর্তমানের এবং কথকও কাহিনী তলের মধ্যে কার একটা চরিত্র।

আবার মাঝে মাঝে কাহিনী কাল ও কথন কালের অন্যরকম ধরনও দেখা যায়। 'আশ্চর্য্য সফল স্বপ্ন' গল্পে প্রথমে কথককে কাহিনীর বাইরের কেউ হিসাবে দেখা গেছে (ইনি লেখিকা স্বয়ং)। এই কাহিনীর মাঝেই আসে এক চরিত্র শ্রীযুক্ত রাখাল দাস মুখোপাধ্যায় এবং তার স্বপ্নের প্রসঙ্গ ও বর্ণনা। এভাবেই কাহিনী গতি লাভ করছে রাখাল দাস বাবুর স্বপ্নের বিবরণে। তাই তিনি যখন বলেন-

"প্রায় বত্রিশ বৎসর আগের কথা, তখন আমি এই বর্দ্ধমানেই আছি। একদিন রাত্রে খুব গাঢ় নিদ্রায় স্বপ্ন দেখিলাম, যেন আমি কোথায় এক সহরের মধ্যে একটি পাথর বাঁধানো প্রশস্ত রাস্তার উপর দিয়ে হাঁটিয়া যাইতেছি। রাস্তার দুইপাশে নানা রকম ঘরবাড়ী ও দোকানশ্রেণী রহিয়াছে। ঘুমন্ত অবস্থায় নির্ব্বিবাদে স্পষ্ট অনুভব হইল যেন সেগুলো আমার বহুদিনের পরিচিত।" ৯৬

এখানে এই বলার মধ্যে স্বপ্নে দেখা কিছু দৃশ্য দেখতে পাওয়া যায়। এই ঘটনার দুই তিন বছর পর কথক (রাখাল দাস বাবু) একদিন ভাগ্নার সঙ্গে গয়া বেড়াতে যান। সেখানে রাস্তাঘাট যা কিছু দেখতে পান সবই পরিচিত মনে হতে লাগে এবং ভাবতে থাকে কোথায় দেখেছে অবশেষে মনে পড়া এবং সবার সামনে কিছু স্থানে ঢোকার আগেই তিনি স্বপ্নে দেখা স্থানগুলো এক এক করে বলছিলেন এবং যা পুরোপুরিভাবে মিলে যাচ্ছিল। যা অত্যন্ত আশ্চর্য্যজনক এবং সকলে এসব শুনে হতবাক। এখানে প্রথমেই বত্রিশ বছর আগের কথা লেখিকার কাছে বলেছিলেন কথক রাখাল দাস বাবু। তারপর স্বপ্ন দেখার দু'বছর পর গয়া গিয়েছিলেন, যেটা তিনি স্বপ্নের মধ্যে দেখেছিলেন। এখানেও কাহিনী কাল অতীতের বর্তমানে তিনি লেখিকার কাছে বলেছেন। সবশেষে তবে লেখিকার কথকের ভূমিকায় অবতীর্ণ হওয়ার মধ্যে দিয়ে কাহিনী শেষ হয়। এভাবেই রচনার মধ্যে একটি কাহিনী কালের বর্ণনায় একাধিক কাহিনী কাল চলে আসতে দেখা যায়।

এছাড়া কাহিনীতে ঘটনার বিন্যাস কেমন তা দু একটি ক্রম থেকে বুঝে নেবার চেষ্টা করব। এ প্রসঙ্গে 'লাফো' গল্পটি যদি দেখি সেখানে দেখা যায়-

(ক)	(গ)	(খ)
দেবদারু গাছে		লাফোর জীবন বৃত্তান্ত

মালা দেবার প্রসঙ্গ।	লাফো যে খুন করেছিল সেই স্বীকারোক্তি।

এখানে যদি ক, খ, গ হিসাবে সাজানো হত তাহলে কথকের সঙ্গে পাঠকের কাছেও সমস্ত ঘটনার খোলস উন্মোচন হত একদম শেষে। এই প্যাটার্ন মেনে কাহিনি এগোলে তা গোয়েন্দা কাহিনী হয়ে যেত। তাই এই সমস্ত কিছু না হয়ে শুরুতেই কে খুন করেছে তা জানতে পেরে যাচ্ছে পাঠক ও কথক। তবে এখানে পশ্চাৎ-উদভাস বা flash back পদ্ধতি অনুসরণ করে বিজয়া দশমী উপলক্ষে পূর্বস্মৃতি জাগছে প্রধান চরিত্রের মনে। যেটাকে কেন্দ্র করে কাহিনী পরিণতির দিকে যাচ্ছে লাফোর অতীত বলার মধ্য দিয়ে।

আবার ‘গোলাপ সিংহ’ গল্পের কাহিনী ক্রমটি কিছুটা 'লাফো' গল্পের বিপরীত। এখানে ক্রমটি নিম্নরূপ-

ক	খ	গ	ঘ
গারো পাহাড়ের জঙ্গলে বাঘ শিকারের কথা।	কথকের কাছে তার মা-ও ছেলের জন্য দুটি বার্তা রেখে যাওয়া এবং গোলাপ সিংহের মৃত্যু দৃশ্য।	সন্তানের আগমন ও কথা দুটি শোনা।	সব শেষে গোলাপ সিংহের বিবাহ বৃত্তান্ত ও জীবন বৃত্তান্ত উন্মোচন।

এখানে রহস্যের উন্মোচন সবশেষে হওয়ায় কে গোলাপ সিংহ এবং তার সম্পর্কে আরো জানার আগ্রহ যেমন রচনার অন্যান্য চরিত্রের মধ্যে হয় তেমনই কৌতূহল পাঠকের মধ্যেও দেখা যায়।

অর্থাৎ লাফোর মধ্যে শুধু কেন করল লাফো এমন ভাবনা জাগার এবং বিষাদের মধ্য দিয়ে কাহিনীর সমাপ্তি। অপরদিকে 'গোলাপ সিংহ' গল্পে টানটান উত্তেজনার মধ্যে দিয়ে সমস্ত সত্যের সামনে শেষে দাঁড়ালো পাঠক। এখানেও পশ্চাৎ উদ্‌ভাস পদ্ধতিতে পুত্রের বিমাতার জীবনবৃত্তান্ত বলার মধ্যে দিয়ে পুরানো কথা স্মরণ করা দেখা যায়।

চরিত্র প্রসঙ্গে এবার আসা যাক। চরিত্র আসলে কথায় সাজানো এক অবয়ব। ঘটনার দ্বারা সমৃদ্ধ একটা ভূমিকা। ভূমিকা চরিত্রের ক্রিয়া সংলাপ, চেতনা প্রবাহ বা অন্তর্ভাবনা এবং সংস্থান ইত্যাদি দ্বারা ডিসকোর্স বা বাচনের স্তরে চরিত্র বা ভূমিকা হয়ে উটতে দেখা যায়। চরিত্রায়ন হল এমন এক প্রক্রিয়া স্টোরির অ্যাকট্যান্ট কিংবা রোল বচনের স্তরে ঘটনা - সময় আর সংস্থানের আন্তঃসম্পর্কে শব্দের দ্বারা গাঁথা হয়ে Text এর গঠনগত ভূমিকা পালন করে। ঘটনাশ্রয়ী এই ভূমিকা চরিত্র আখ্যানে নানা ধরনের রূপে সজ্জিত। নায়ক চরিত্র, নায়িকা চরিত্র, খলনায়ক চরিত্র, মুখ্য অথবা গৌণ ভূমিকা, ইত্যাদি নানান রূপ লাভ করে কাহিনী বিশেষে। ছোটো করে বললে প্রধান ও অপ্রধান চরিত্র হিসাবেও বলা যায়। চরিত্র ও ভূমিকা শব্দটি যেহেতু একই অর্থে ব্যবহৃত হচ্ছে এমনকি চরিত্র শব্দটি বেশি ব্যবহৃত তাই কোনটা বলা হবে এই দ্বিধা এড়াতে ভূমিকা চরিত্র বলা যায়। এবারে আমরা শৈলবালা ঘোষজায়ার রচনার মধ্যে কেমন ধরনের চরিত্রের উপস্থিতি লক্ষ করছি তা দেখে নেবার চেষ্টা করব। এ প্রসঙ্গে তাঁর কিছু রচনার থেকে চরিত্র কেমন ভূমিকায় অবতীর্ণ তা দেখে নেবার চেষ্টা করব।

এখানে তাঁর গল্প, উপন্যাসে অজস্র চরিত্রের ভিড়ে নায়ক, নায়িকা, খলনায়ক, সহায়ক চরিত্র এসব ভূমিকা দেখা যায়। তবে একই উপন্যাসে একসঙ্গে সমস্ত চরিত্রের উপস্থিতি বিশেষ লক্ষ করা যায়নি। তাই কখনও নায়ক, নায়িকা উপস্থিতি থাকলেও

খলনায়ক থাকে না। আবার কখনও থাকে শুধু নায়কের উপস্থিতি, কখনও বা নায়িকার উপস্থিতি। আবার কখনও নায়িকা ও সহযোগী চরিত্রের হাত ধরেই কাহিনী সমাপ্তির দিকে যাচ্ছে, কখনও নায়ক ও সহযোগী চরিত্রের হাত ধরে কাহিনী গতিলাভ করছে। তবে দু -একটি গল্পে ব্যতিক্রম নজরে পড়ে। কিছু উপন্যাসের ক্ষেত্রে তবে নায়ক, নায়িকা, খলনায়ক ও সহায়ক চরিত্রের উপস্থিতি লক্ষ করা যায়। আবার কিছু ক্ষেত্রে একেবারে ব্যতিক্রমী বিষয় নজরে আসে সেখানে নায়ককেই খলনায়ক হিসাবে দেখা যায়। তবে নায়িকার উপস্থিতি সমাপ্তিতে গিয়ে তার চরিত্রে পরিবর্তন ঘটতে দেখা যায়। এখন গল্প, উপন্যাস এই ফর্ম -এ যদি ভাগ ভাগ করে চরিত্রগুলিকে দেখি তাহলে উপরে বর্ণিত সমস্ত ধরন গুলিই দেখতে পাবো। এখন আমরা তাঁর গল্প ও উপন্যাস থেকে চরিত্রের একটি বর্ণনা তুলে ধরব যা নিম্নে উল্লেখ করা থাকবে। এপ্রসঙ্গে প্রথমেই কয়েকটি গল্প বেছে নেব চরিত্র তুলে ধরার জন্য। সেগুলি হল-

১. ‘লাফো’।

২. ‘ভন্ডের সার্থকতা’।

৩. ‘দীপ্তি’।

৪. ‘বিজয়া নমস্কার’।

৫. ‘নিরঞ্জন সর্দার’।

৬. ‘ভূমিকম্প’।

৭. ‘গোলাপ সিংহ’।

৮. ‘বুনো ওল ও বাঘা তেঁতুল’।

১. লাফো-

এখানে প্রধান চরিত্র লাফো। খল চরিত্র রায়দের ছোটোবাবু। সহায়ক চরিত্র বা পার্শ্বচরিত্র হল ভাই শংকর, ঠিকাদার, মগ জাতির বিভিন্ন লোক, ছোট বাবুদের বাড়ির অন্যান্য চরিত্র, লাফোর বোন শোভা।

২. ভন্ডের সার্থকতা-

প্রধান চরিত্র জানানা সোয়ারী। খল চরিত্র এটর্নী মহাদেব চট্টোপাধ্যায়। সহায়ক চরিত্র বা পার্শ্ব চরিত্র মারওয়ারি মক্কেল ও বাঙালি মক্কেল, মোহিত বাবু, বল্লভবাবু, পীর মহম্মদ, জানানা সোয়ারীর পুত্র অনীল।

৩. দীপ্তি-

প্রধান চরিত্র দীপ্তি। খল চরিত্র সরকার বাবু। সহায়ক চরিত্র বা পার্শ্ব চরিত্র দীপ্তির দাদু, বিমলা ও বিমলার বরদি, বিমলার স্বামী সরোজবাবু, সরকার বাবুর ভাতৃবধূ, বিমলাদের বাড়ির বালক ভৃত্য জাগুয়া, দাদা মণির ভৃত্য নিতাই।

৪. বিজয়ার নমস্কার- প্রধান চরিত্র ব্যথা হরিণী তথা ব্যথা। খল চরিত্র ব্যথার ভাসুর। সহায়ক চরিত্র বা পার্শ্ব চরিত্র পিসিমা, বাড়ির কর্তারা, চাকর (পাহাড়ি), ব্যথার পিসতুতো ভাই, ব্যথার স্বামী, ব্যথার পুত্র, আনন্দ পত্রিকার অফিসের ভদ্রমহিলা

৫. নিরঞ্জন সর্দার-

প্রধান চরিত্র নিরঞ্জন সর্দার। খল চরিত্র ডাকাত দল। সহায়ক ও পার্শ্ব চরিত্র নিরঞ্জনের স্ত্রী, পুত্র, মা ভাই ভোলানাথ, মনীব (জমিদার বাবু), ডাক হরকরা।

৬. ভূমিকম্প-

প্রধান চরিত্র দিনু কাকা (পেনশন প্রাপ্ত কেরানী)। খল চরিত্র চন্দ্র চাটুজ্যে। সহায়ক চরিত্র ও পার্শ্ব চরিত্র দিনু কাকার ভৃত্য লছমন, তারিণী মুকুজ্যে, ফেকুপাঁড়ে ও ইসমাইল প্রতিবেশী, দিনু কাকার পুত্র ও পুত্রবধূ।

৭. গোলাপ সিংহ-

প্রধান চরিত্র বা নায়ক গোলাপ সিংহ। নায়িকা চরিত্র গোলাপ সিংহের দ্বিতীয় স্ত্রী। সহায়ক বা পার্শ্ব চরিত্র গোলাপ সিংহের প্রথম স্ত্রী ও সন্তান শম্ভু সিংহ ও মাতা, মহারাজা বাহাদুর, সুপারিন্ডেন্ডেন্ট, ডাক্তার, গর্ডন সাহ, (পল্টনের বড় সাহেবের) দ্বিতীয় স্ত্রীর স্বামী ও শশুর।

৮. বুনো ওল ও বাঘা তেঁতুল-

প্রধান চরিত্র বা নায়ক চরিত্র ডেপুটি দেবীপ্রসাদ বাবু। নায়িকা চরিত্র দেবীপ্রসাদ বাবুর স্ত্রী। সহায়ক বা পার্শ্বর চরিত্র কোচম্যান, ডেপুটি রাধাশ্যাম বাবু, মোনসেব বাবু, বাগানের দারোয়ন, ডাক্তার বাবু।

এইভাবেই গল্পগুলির মধ্যে চরিত্রের অবস্থান কিরূপ তা লক্ষ করা যায়। সর্বোপরি গল্পগুলি থেকে যা চরিত্র নজরে পড়ে তা থেকে প্রধান চরিত্র ও অপ্রধান চরিত্র এই বিভাজনই বেশি লক্ষ করা যায়। দু- একটিতেই নায়ক, নায়িকা, খল, পার্শ্ব চরিত্র একত্রে অবস্থিতি লক্ষ করা গেল। তবে ‘বুনো ওল বাঘা তেঁতুল’ গল্পের ডেপুটি দেবীপ্রসাদ বাবু নায়ক হলেও তাকে মদ্যপ অবস্থায় ও অসৎ সংসর্গে মিশতে দেখা যায়। এখানে যুগ যুগ ধরে পাঠক ও দর্শক মহলে নায়ক চরিত্রর থেকে অনেক চাওয়া অর্থাৎ এক্সেপটেশন্ থাকে। যেমন নায়ক সৎ হবে অনেক অসম্ভব সম্ভব করবে এমন ধরনের চাহিদা থাকে। এক্ষেত্রে নায়ককেই লেখিকা মদ্যপ, অসৎ সঙ্গে মিশতে থাকা মানুষ হিসাবে দেখিয়েছেন তবে

শেষে স্ত্রীর তৎপরতায় তার চরিত্রের পরিবর্তন হতে দেখা যায়। এইভাবেই ভিন্ন ভিন্ন ধরনের চরিত্রের সমাবেশ ঘটিয়েছেন লেখিকা তাঁর গল্পগুলিতে।

কিছু উপন্যাসে তবে প্রায় সমস্ত চরিত্র একত্রে ও কিছু ক্ষেত্রে কোনো কোনো চরিত্রের অনুপস্থিতিও দেখা যায়। সেরকমই কিছু চরিত্র উপন্যাস থেকে বর্ণনা দেবার চেষ্টা করব। এক্ষেত্রে নির্বাচিত কিছু উপন্যাস থেকে চরিত্রগুলি দেখে নেব। উপন্যাসে চরিত্রের সংখ্যা বেশি থাকায় গুরুত্বের দিক থেকে বিচার করে সহায়ক চরিত্রের কিছু নাম উল্লেখ করার চেষ্টা করব। যেমন-

১. অবাক-

নায়িকা চরিত্র বেগম। নায়ক চরিত্র আবু সাহেবের ভাই মন্নু। সহায়ক ও পার্শ্ব চরিত্র বেগমের দিদি সোফিয়া, মা, সোফিয়ার স্বামী আবুসাহেব, বাড়ির কাজের মেয়ে শোভাণি, বেগম ও মন্নুর ছেলে আজব, বেগমের বান্ধবীরা।

২. সেখ আন্দু-

নায়ক চরিত্র আন্দু। নায়িকা চরিত্র জ্যোৎস্না (বিধবা)। সহায়ক ও পার্শ্ব চরিত্র জ্যোৎস্নার বান্ধবী লতিকা ও ভাই রতু, উকিল চৌধুরী সাহেব, লতিকার ভাই পরিমল, ভবতারণ চাটুয্যে তার স্ত্রী, বোন, লছমী ভকত, ঠাকুরজী, দাদাজী, ইন্সপেক্টর মোহিনী বাবু, সাব ইন্সপেক্টর মহিমারঞ্জন, পথিক রমানাথ রায়, শিখ ভাই হার কিষান সিং বাহাদুর, আখড়ার ওস্তাদ ও তাঁর অনুচর শীতল চাঁদ। খল চরিত্র রামলাল তিওয়ারী।

৩. রঙীন ফানুস-

নায়ক চরিত্র কুর্ম্মি সম্প্রদায়ের খন্তর। নায়িকা চরিত্র বিধবা পার্বতী। সহায়ক ও পার্শ্ব চরিত্র খন্তরের ভাই (শনিচর ও সুমার), শনিচরের স্ত্রী ও বাবা, ডাক্তার বাবু, খন্তরের দাদা, বৌদি, ভাইপো, বিশুয়ার মা, মনোরমা, গয়লা বুড়ি ও তার বোনঝি।

৪. মহীমা দেবী-

নায়ক চরিত্র শুদ্ধেন্দু সিংহ। নায়িকা চরিত্র মহীমা দেবী। সহায়ক ও পার্শ্ব চরিত্র সম্রাট জালালুদ্দিন, মহবুব খা, সেনানায়ক নুরুদ্দিন মিঞা, পূর্ণেন্দু সিংহ (শুদ্ধেন্দু সিংহর ভাই), মহীমা দেবীর ভাই রতন সিংহ ও সাগর সিংহ, এ্যায়েশা খাতুন। খল চরিত্র আলাউদ্দিন খিলজী, ইসমাইল খাঁ (মহবুব খাঁর ভাই), ভূপ সিংহ (শুদ্ধেন্দু সিংহর ভাই)।

৫. তেজস্বতী-

নায়ক চরিত্র শঙ্কর সরকার। নায়িকা চরিত্র তৃপ্তি। সহায়ক ও পার্শ্ব চরিত্র সুধা (তৃপ্তির বোন), জ্যাঠামশাই, জেঠিমা ও তাদের পুত্র ও পুত্রবধূ, শম্ভু বাবু (শঙ্করের ভাই), শঙ্করের পুত্র মুক্তি, জ্ঞানবাবু ও তার মেয়ে মায়া, দোকানদার, পুলিশ প্রহরী, রানী সাহেবা (শঙ্করপুরের রানী)। খল চরিত্র দেবেন্দ্র (তৃপ্তির দাদা) ও মহাদেববাবু (জমিদার)।

এই ভাবেই আমরা শৈলবালা ঘোষজায়ার রচনার চরিত্র রূপ দেখতে পেলাম। যা নানা বৈচিত্র্যে ভরপুর।

এই চরিত্রের কথা আলোচনার সঙ্গে সঙ্গে ওতোপ্রোতো ভাবে এসে যায় সংলাপের প্রসঙ্গ। চরিত্র সংলাপের বুননেই প্রাণ পায়। মুখের ভাষা ব্যক্তির পরিচয় বহন করে যার হাত ধরেই আসে বিভিন্ন চরিত্রের মুখের ভাষার তারতম্য যা আমরা পূর্বেই বিবরণ দিয়েছি। এই সংলাপের মধ্যে থাকে নানা উপাদান। যার উপর ভিত্তি করেই নানা পরিস্থিতি

তৈরি হয় রচনায়। সংলাপের মধ্যে দিয়ে ব্যঙ্গ বা শ্লেষ, বক্রোক্তি, হাস্যরস ইত্যাদি নানান বিষয় উঠে আসে। এছাড়াও সংলাপের মধ্যে ছবিকেও ধরা দিতে দেখা যায়। পাশাপাশি পাওয়া যায় বহু আটপৌঢ়ে শব্দের ব্যবহার। এই সমস্ত বিষয়গুলিকে এখন আমরা লেখিকার রচনা থেকে দেখে নেওয়ার চেষ্টা করব। এরই সূত্র ধরে কয়েকটি উদ্ধৃতির সাহায্য আমরা কাহিনী থেকে নেব।

প্রসঙ্গক্রমে প্রথমেই ‘ননী খানসামার ছুটি যাপন’ গল্পের একটি অংশের বিবরণ দেওয়া যায়। গল্পটিতে ননী চরিত্রকে কাজের সূত্রে মনীবের বাড়িতেই থাকতে দেখা যায়। বিশেষ প্রয়োজন ছাড়া বাড়ি আসে না। এরকমই একসময় হঠাৎ করে বাড়ি এসে তার স্ত্রীর সঙ্গে তার ভাই-এর শ্বশুর বাড়িতে বেশি থাকার বিষয়ে আলোচনা চলাকালীন ভাইয়ের এই কাজের জন্য উচ্ছন্নে যাবে বলে জানায়। তখনই স্ত্রী জানায় শ্বশুরবাড়িতে থাকলে কেউ উচ্ছন্নে যায় না। এমন কথা শুনে ননী এখনকার দিনের ছেলেপিলের এমন হওয়ার কারণ খুঁজতে থাকলে স্ত্রী ননীকে বলে-

> “তুমি কবেকার গো ? তুমি কি ছিলে?” ৯৭

এই কথায় মেয়েলি ভাষায় ব্যাঙ্গের সুর ধ্বনিত হতে দেখা যায়।

'থিয়েটার দেখা' গল্পে ঘরোয়া পরিবেশে জামাইবাবু, শ্যালিকা, দিদি-র উপস্থিতি লক্ষ করা যায়। এখানে জামাইবাবুদের ভিড়ে একমাত্র শ্যালিকা নন্তু তাকে নিয়ে মাঝেমধ্যেই নানান বিষয়ে ঠাট্টা করে জামাইবাবুরা। এমনই এক কথার মাঝে মেজ জামাইবাবু ঠাট্টা করে ভালোবাসি বলে ফেললে নন্তুর অভিযোগের শেষ থাকেনা। ঠাট্টার বহরে বছর এগারোর এই নন্তুর পাগল হবার উপক্রম এমনকি সে কেঁদেও ফেলে। তখনও কবিতা

থেকে টিপ্পনি কেটে আবারও ঠাট্টা করে জামাইবাবুরা। এমন সময় দিদির কাছে অভিযোগ করার পরও দিদি জামাইবাবুদের কিছু বলছে না দেখে নন্তু বলে-

"তা বলবে কেন? তোমার নিজের বরটি কিনা ?" ৯৮

নন্তুর মুখে পাওয়া এই কথাটাই একটা শ্লেষাত্মক বাক্য।

'সূক্ষ্ম-ধর্ম্মজ্ঞান' গল্পে শান্তিপুরের রায়গিন্নির বাড়িতে এসে গৌরগোপাল নামের এক ব্যক্তি ছাগ বিষ্ঠায় পা দেওয়াতে সে বাড়ির বউদের কাজ ফেলে রেখে দেওয়া নিয়ে নানান কথা বলতে থাকে। এরই মাঝে রায়গিন্নী ঝিকে ডেকে এসব কাজগুলো সারতে বলায় গৌরগোপাল বাড়ির বউদের নিন্দা করে। এমন অবস্থায় রায়গিন্নি ও গৌরগোপালের মত এর মিল দেখা যায় তাইতো রায়গিন্নি গৌরগোপালদের বাড়ির ছোট বউ এর খাটা খাটনির সুখ্যাতি করে নিজের ঘরের বউ সম্পর্কে বক্রোক্তি করে বলে-

"গতর সব কত ! তাতে আবার সব 'রাং এর রাধা', বারমাসই রোগ ! তোমাদের বাড়ীর বৌ আর আমাদের বাড়ীর বৌ, — বলে কিসে আর কিসে !" ৯৯

এইভাবে বাড়ির বউ সম্পর্কে তির্যক মন্তব্য শ্বশুরবাড়ির মুখে শোনা যায়, যার থেকে শ্বশুরবাড়িতে মেয়েদের পরিস্থিতিও স্পষ্ট হয়। এছাড়াও নারী জাতিকে অত্যন্ত নীচ ভাবতেও দেখা গেল গৌরগোপালের এক অবজ্ঞাসূচক সংলাপে। সরলার দোকান ঘর বিক্রি কে কেন্দ্র করে সরলা গৌরগোপালের কথা মত না চললে তাকে যখন বলে-

"যদি দিবিই না, তবে এ ঢলাঢলি করা কেন? মেয়ে মানুষের জাতের মাথায় সাত ঝ্যাঁটা !" ১০০

তখন গৌর গোপালের ধূর্ততা ও স্ত্রী জাতির প্রতি নীচ মানসিকতার ছবি ধরা পড়ে, যা অত্যন্ত কদর্য।

'বোকার টুপি' নামক গল্পে অতি সাধারণ ছাঁদে বাচ্চাদের খুনসুটির ছবি লেখিকা তুলে ধরেছেন। দুই ভাই কান্তি ও মুন্ত। দুজনে জানলার ধারে কুকুর দেখতে দেখতে খেলা করতে থাকে। কান্তি মুন্তকে কুকুর দেখতে সাহায্য করার জন্য জানালার উপর উঠতে সাহায্য করতে থাকে। এমন সময় দিদি রন্তু এসে হাজির এবং কান্তিকে বকাঝকা করে মুন্তকে জানালায় তোলার প্রসঙ্গ নিয়ে। এইভাবে রন্তু তাদের করা কাজে বাধা দান করলে এক দফা মারপিট হয়ে যায় রন্তু ও কান্তির মধ্যে। ছোটো মুন্ত এ দৃশ্য দেখে দিদিকে ভোলানোর জন্য তার সঙ্গে খেলবে বলে। এরপর ঘরের মধ্যে পিসিমার আগমনে মারপিটের কারণ জানতে চাইলে মুন্ত কান্তির গায়ে হাত দিয়ে মেরে দেখালে পিসিমা এসব শেখানোর জন্য কান্তি ও রন্তুকে বকা দেয়। এটা শুনে কান্তি নিজেকে বরদাদা বলে দাবি করে মারবে না বললে এ প্রসঙ্গে দিদি অত্যন্ত শ্লেষের সঙ্গে বলেন-

"আহা-হা, আর আমি যেন তোমার বড় বোন নয় গো !" ১০১

এইসব কথার মাঝেই পিসিমার শাসন চলাকালীন বাড়ির মধ্যে কিশোর ভৃত্য ভোলা এসে বলে-

"পিসীমা, কাকাবাবুকে বলবেন, মনিহারী দোকানে পুলিশ কেসের কাগজ নাই।" ১০২

কথাটা শুনেই পিসিমা অবাক হয়ে ভাবে কি বলছে এসব। রন্তু হাসতে থাকে, তাকে দেখে কিছু না বুঝে কান্তি ও মুন্তও হাসতে থাকে। রন্তু অবশেষে দম নিয়ে বলে-

"পুলিশ কেস নয় পিসীমা, ফুলস্ক্যাপ কাগজ !" ১০৩

তখনই আসল কথাটা কি সবারই বোধগম্য হল। এই ভাবেই গল্পের মধ্যে শ্লেষ ও হাস্যরসাত্মক সংলাপ যোজনা করেছেন লেখিকা।

অনুরুপে ‘সই’ উপন্যাসে বিদ্যুৎ লতা ও হিতেন্দ্রের মধ্যেও অনেক ব্যঙ্গ, রসিকতা দেখা যায়। এরকমই একটি ঘটনায় হাস্যরস দেখা যায় ঘড়ি ফেরৎ দিতে চাওয়া একটি চিঠিকে কেন্দ্র করে। এক চিঠির মাধ্যমে হিতেন্দ্রকে কেউ একজন হেদুয়ায় দেখা করতে বললে সেটা নিয়ে অনেক ভাবনা চিন্তার পর সে ঘড়ি আনতে যাওয়া ঠিক হবে না ভেবে নিয়েছিল। এই ঘটনা হিতেন্দ্র তার ভাগ্না শিবচন্দ্র কে জানালে সে খোঁজ নিয়ে পাঞ্জাবী ডাকাত দলের লোক বাহাদুর সিং এই কাজটা করতে পারে বলে সন্দেহ করে। যেহেতু দেখা করতে যায়নি তাই বাড়িতে আক্রমণ করতে পারে এমন ভাবনা থেকে শিবচন্দ্র হিতেন্দ্রকে সতর্ক করে। এই পরিস্থিতিতে অভয় দিয়ে বিদ্যুৎলতা যখন হিতেন্দ্রকে বলে-

“আজ রাত্রে আমার ভাইরা কেউ ঘুম ভাঙিয়ে তোমার সঙ্গে রসিকতা করতে আসছে না, নিশ্চিন্ত হয়ে ঘুমাও গে, আমি গ্যারান্টি দিচ্ছি।” ১০৪

এ কথা শুনে ব্যঙ্গ করে হিতেন্দ্রও বলে-

“ভাইয়ের সঙ্গে পরামর্শটা ঠিক হয়েই আছে না কি ?” ১০৫

এভাবেই বিদ্যুৎলতাকে ব্যঙ্গ করতে দেখা যায় উপন্যাসের মধ্যে। বাহাদুর সিং কে আগেই ভাই বলেছে বিদ্যুৎলতার কারণ এই বাড়িতে হামলার বিষয়টা বিদ্যুৎলতা গুরুত্ব দেয়নি তাই জন্য। সেই ভাই বলার সূত্র ধরেই বিদ্যুৎলতার হিতেন্দ্রকে অভয়দান পর্বটি দেখা যায়। লেখিকা এইভাবেই তাঁর বিভিন্ন সংলাপের মধ্যে পরিবেশ অনুযায়ী ঠাট্টা, ব্যঙ্গ, শ্লেষ, বক্রোক্তি, হাস্যরস পরিবেশনা করেছেন যা অত্যন্ত চমকপ্রদ।

উপরের বর্ণনা দেওয়া উপাদান ছাড়াও সংলাপের মাধ্যমে ছবিও ধরা দেয়। এই ছবির উপস্থিতি শৈলবালা ঘোষজায়ার রচনায় কেমন তা দেখে নিতে আমরা কিছু দৃষ্টান্ত তুলে ধরার চেষ্টা করব।

'আশ্চর্য্য সফল স্বপ্ন' গল্পে কথকের কাছে শ্রীযুক্ত রাখাল বাবু অতীতে তাঁর দেখা এক স্বপ্নের দৃশ্য কেমন সেটার বর্ণনা দিতে গিয়ে যখন বলেন-

"স্বচ্ছন্দে বাড়ীর ভিতর ঢুকিলাম। চকমিলানো বারান্দাযুক্ত সুন্দর অন্তঃপুর। বারান্দার পাশে কক্ষশ্রেণী। উঠানের এক পাশ দিয়া, দ্বিতলে উঠিবার সিঁড়ি, সিঁড়ির ডানপাশে কূয়া। তার কিছু দূরে পায়খানা। সিঁড়ি বহিয়া উপরে উঠিয়া, দ্বিতলের চকমিলানো বারান্দায় পৌঁছিলাম। বারান্দারও চারিপাশে কক্ষশ্রেণী।" ১০৬

এই স্বপ্নদৃষ্টের মধ্যে দিয়ে একটা অন্তঃপুরের ছবি দেখা যায়। সেখানে কক্ষশ্রেণী, সিঁড়ি, কূয়া, পায়খানা, বারান্দা অন্তঃপুরের ঠিক কোথায় কোথায় তারই একটা চিত্র কথার মধ্যে দিয়ে ধরা পড়তে দেখা যায়। এছাড়াও এই স্বপ্ন বর্ণনা অংশে আরো একটি বর্ণনায় দেখা যায়-

"সিঁড়িগুলি রাস্তার পাশ দিয়া নিচের দিকে নামিয়া গিয়াছে। আমি সেই সিঁড়ি দিয়া নামিতে লাগিলাম। কিছুদূর গিয়া দেখিলাম, সিঁড়ির একপাশে একটি বটগাছ রহিয়াছে। গাছটির গোড়া পাথর দিয়ে বাঁধান। গাছটি ছাড়াইয়া সেই সিঁড়ি দিয়া নামিয়া আরও কিছুদূর গিয়া দেখিলাম, সিঁড়িটি শেষ হইয়াছে। সম্মুখেই সুদূর-বিস্তৃত একটা বালি ঢাকা নদীর রহিয়াছে। নদীর জল কিছুমাত্রই দেখা যাইতেছে না, সমস্তই বালি-ঢাকা।" ১০৭

এখানেও সিঁড়ি বেয়ে নামা, পাথর বাঁধানো বটগাছ দেখা, সেটাকে ছাড়িয়ে সিঁড়ি দিয়ে শেষ পর্যন্ত যাওয়া, বালি ঢাকা নদী দেখা। এই ছবিটিই উঠে আসে।

'ভূমিকম্প' গল্পটিতেও এক পেনশন প্রাপ্ত কেরানী ও তার ভৃত্য লছমন গঙ্গাস্নানে বের হন। এমন সময়ই ঘটে যাওয়া ভূমিকম্পের বিবরণ দিতে লেখিকা লেখেন-

"হঠাৎ পৃথিবী যেন কেমন হয়ে উঠল। নির্জীব ধরিত্রী সহসা জীবন্ত আস্ফালনে অধীর মত্ততায় টলমল করে উঠলেন। মাটীর অভ্যন্তরে একসঙ্গে যেন পঞ্চাশটা কামান গর্জন করে উঠল। ছুটল যেন

শত শত রেলগাড়ির ইঞ্জিন পায়ের নিচে পূর্ণ বেগে ! গুড়, গুড়, গুড়্ গুড়ুম ! গুড়ুম ! গুড়্ গুড়্ গুড়্ গুড়্ গুম্ — গুড়্ গুড়্ গুড়।” ১০৮

এখানেও ভূমিকম্পের কম্পন কত গভীর তার প্রকাশ লক্ষ করা যায়। এছাড়াও আবারও যখন লেখিকা বর্ণনা দেন-

“কি ভয়াবহ শব্দ চারিদিকে। কানে তালা ধরে গেল ! সামনে গঙ্গার জলরাশি উত্তাল তরঙ্গমালা তুলে ঝাঁপিয়ে এসে কয়েকটা সিঁড়ি ডুবিয়ে দিলে ! জল আবার সরে গেল, আবার তেড়ে এল। গঙ্গা রীতিমতো লম্ফঝম্ফ করছেন যে, হতভম্ভ হয়ে গেলাম। হল কি ! একসঙ্গে গোটা পৃথিবীর জলমাটী সবাই ক্ষেপে গেল ? ঘাটের অনড় অচল সিঁড়িগুলা যে ঘুরন্ত লাট্টুর মত বন্‌বন্ করে ঘুরছে। গঙ্গা যে লাফাতে লাফাতে ক্রমশঃ উপরদিকেই ধাওয়া করে আসছেন !” ১০৯

এখানেও ভূমিকম্পের মধ্যে জলরাশি আছাড় খেয়ে পড়া ও তার বিশালতার ছবি দেখতে পাওয়া যায়। কথার মাধ্যমে একটা ভূমিকম্পের পরিস্থিতি ও ভয়াবহতা চোখের সামনে ভেসে উঠতে দেখা যায়।

‘নিরঞ্জন সর্দার’ গল্পে নিরঞ্জন দামোদর নদী যখন পার হচ্ছিল তখন সেই নদীর যে বর্ণনা লেখিকা দেন সেখানেও দামোদরের বিশালতা ও ভয়াবহতা দেখা যায় সঙ্গে সঙ্গে প্রভুর জন্য এক লাঠিয়ালের সেই দুর্গম পথ পার হওয়ার দৃশ্যও দেখা যায়। তাই লেখিকা যখন লেখেন-

“অবশ্য এ জল অধিকাংশ স্থানে এক হাঁটু, বা কোমর পর্যন্ত। তবে স্রোতের টান অতি তীব্র। সব-চেয়ে ভয়ঙ্কর নদীর মূল-খাদের প্রধান স্রোত। বর্ষায় সেখানে নৌকা ভিন্ন পারাপার হওয়ার উপায় নাই। বন্যার বেগ উগ্রতর হলেই নৌকা চলাচল অসম্ভব হয়। উৎকণ্ঠা কূলচিত্তে নিরঞ্জন লাঠি, লণ্ঠন, পাগড়ী, গামছা লইয়া বাহির হইয়া পড়িল। ঊর্ধ্বশ্বাসে পথ অতিক্রম করিয়া চলিল। দেখিতে-দেখিতে সন্ধ্যা-ক্রমে

রাত্রি ঘনাইয়া আসিল। একে বর্ষার মেঘভরা আকাশ, তায় কৃষ্ণা-চতুর্দশীর অন্ধকার রাত্রি। জনহীন পথ, মাঠ-ময়দান ঝোপ-ঝাড় ডিঙাইয়া, নিরঞ্জন সর্দার উল্কাবেগে নির্ভয়ে ছুটিতে লাগিল।" ১১০

এইভাবে ছবির মাধ্যমে নদীর বিশালতা, রাতের গভীরতা, পথের দূর্গমতা দেখা যায়। এই সমস্ত কিছু উপেক্ষা করে এক লাঠিয়াল তার প্রভুর বিপদে প্রভুকে বাঁচাতে পথে নেমেছে। এই ভাবেই এই সমস্ত দৃশ্য বর্ণনায় ধরা দেয়।

'কোন রোগ' গল্পের মধ্যেও শুরুতেই এক গৃহস্থালির চিত্র দেখা যায়। সেখানে বিয়ে উপলক্ষ্যে মেয়েদের কুটনো কাটার দৃশ্য দেখা যায়। সেটারই বর্ণনা দিতে লেখিকা লেখেন-

"গ্রীষ্মকাল, কৃষ্ণপক্ষের ত্রয়োদশীর অন্ধকার রাত্রি। আকাশে মিট্ মিট্ করিয়া তারাগুলি জ্বলিতেছিল। একটা গ্যাসের আলো জালাইয়া ছাদের মাঝখানে রাখিয়া তার চারিদিকে ঘেরিয়া পাঁচ সাতখানা বঁটি পাতিয়া বসিয়া, মেয়েরা কুটনা কুটিতে কুটিতে পারিবারিক প্রসঙ্গ আলোচনা করিতেছিলেন।" ১১১

এখানেও গ্রাম্য পরিবেশ ফুটে উঠতে দেখা যায়। সেই পরিবেশে যেন আমাদের পরিবারের মানুষের মতোই কুটনো কাটার দৃশ্য দেখা যায়। এইভাবে একটা গ্রাম্য বিয়ে বাড়িতে মহিলাদের তোড়জোড় করে কুটনো কাটা যেন খুবই পরিচিত ছবি হিসাবে ধরা দেয়।

'আদেশ পালন' গল্পেও এক জায়গায় কনক নামের একটি চরিত্রের ছুটতে থাকার দৃশ্যে অত্যন্ত প্রাণবন্ত এক প্রকৃতির রূপ ধরা দেয়। লেখিকার বর্ণনায় তা নিম্নরূপ-

"দুপাশে সারি বাঁধিয়া গাছগুলি সাজানো। স্বল্পান্ধকারে সমাছন্ন গ্রামের বাঁধা পথ ছাড়িয়া, কনক ছুটিতে ছুটিতে শেষে উন্মুক্ত আকাশের তলে, সুদূর বিস্তৃত মাঠে অনেকখানি আলোকের নীচে- অনেকখানি ফাঁকা জায়গায় আসিয়া পড়িল।" ১১২

'রঙীন ফানুস' উপন্যাসে খন্তর চরিত্রের একাকী দিনযাপন দেখা যায়। একদিন গৃহকর্মে সামাল দিতে না পেরে সকালে মুখে নিমকাঠির দাঁতন নিয়ে ঠিকা ঝি খোঁজে বের হওয়ার পথে সকালের প্রাকৃতিক পরিবেশের যে বর্ণনা লেখিকা দিয়েছেন তা নিম্নরূপ-

"ভোরের আকাশ সেইমাত্র পরিষ্কার হইতে আরম্ভ হইয়াছে। পৃথিবীর পথঘাটে সে আলো তখনও স্পষ্ট রূপে আসিয়া পৌঁছে নাই। গাছপালা গুলা কাল কাল ছায়ার মত দেখাইতেছে। সদ্যঃ ঘুম ভাঙা পাখীদের উৎসাহ প্রমত্ত কণ্ঠের বিচিত্র কলধ্বনিতে আকাশ বাতাস সুমিষ্ট সুর ঝংকার পূর্ণ।" ১১৩

এইভাবেই রচনার পরতে পরতে যে নানান ছবি দেখা যায়। তারই কয়েকটা নমুনা তুলে ধরা হল। যার মাধ্যমে অন্তঃপুর এর মনোরম দৃশ্য ও তার সৌন্দর্য, নদীর বিশালতা ও সেটা পার হয়ে যাবার দৃশ্য, সুন্দর প্রাকৃতিক পরিবেশ সঙ্গে গ্রাম্য পথ ঘাট ও ভূমিকম্পের সময়কার ধরিত্রির কম্পন ও জলরাশির ফুলে ফেঁপে ওঠার দৃশ্য দেখতে পাওয়া যায়। কথার বুননে ছবির মহিমা সত্যই প্রশংসিত।

ছবির পাশাপাশি শৈলবালা ঘোষজায়ার রচনায় সংলাপের মধ্যে অনেক আটপৌরে শব্দের ব্যবহার লক্ষ করা যায়। তারই মধ্যে বেশ কিছু নিম্নে উল্লেখ করলাম-

১। গতর	২২। আম্মর	৪৩। জ্যাঠামো
২। ঢিট	২৩। আমোলো	৪৪। বারেন্ডা
৩। বেটি	২৪। থাবড়া	৪৫। ভড়ং
৪। ঝক্কি	২৫। ছ্যাঁত করে	৪৬। সটান
৫। ধাষ্টেমো	২৬। কন্নু	৪৭। থাবড়াইয়া
৬। ঢলাঢলি	২৭। ব্যাগার খাটা	৪৮। ট্যাঁক
৭। ষন্ডামার্কা	২৮। ফকর দালালি	৪৯। হওে

৮। ভাদ্রবৌ	২৯। নটুচ্ছে	৫০। গরাস
৯। ভিজা বিড়াল সাজা	৩০। ট্যাকা	৫১। টাটায়
১০। ছেঁদো কথা	৩১। চিপটেন্	৫২। ভেক
১১। টারসে	৩২। দুত্তোর	৫৩। মিনসে
১২। শাণ্ডা	৩৩। ঠাকুরানী	৫৪। ভারিখ্যে
১৩। গড়	৩৪। ধরাস	৫৫। জাহান্নাম
১৪। ফ্যাসাদ	৩৫। বোলচাল	৫৬। উল্লুখ
১৫। চালচলন	৩৬। চোয়ারে ভঙ্গি	৫৭। লাই দেওয়া
১৬। টুঁটি	৩৭। গেঁইয়া	৫৮। ভদ্দরনোক
১৭। আড়ি	৩৮। অন্নি	৫৯। ভৌজি
১৮। গাঁজাখুড়ি	৩৯। পশু	৬০। তাঁহাতক
১৯। ছিড়ি	৪০। তাগাদা	৬১। আলুনো
২০। পাজির পাঝাড়া	৪১। গোটা কতক	৬২। উচ্ছন্নে
২১। হক কথা	৪২। ঠাউরে	

এইভাবে হাস্যরস, বক্রোক্তি, শ্লেষ, ইত্যাদিতে ভরা; শব্দের ছবি নির্মাণে; আটপৌরে শব্দের ব্যাবহারে; লেখিকার সংলাপ পরিপূর্ণ হয়ে ওঠে। এই সমস্ত কিছুর বাহারে সংলাপগুলি যেন আরও সৌন্দর্যময়তা ও বিচিত্রতা লাভ করে।

৮। লোকগত উপাদানের ব্যবহার-

বাংলার লোকায়ত সমাজে লোকগত অন্যান্য উপাদানের মত প্রবাদ ও ছড়াও মিশে আছে। লোকসাহিত্যের এই উপাদানগুলি প্রাচীন ঐতিহ্য ও ভাবনাকে প্রকাশ করে। লোকমুখে প্রচলিত প্রবাদ ও ছড়া থেকে সামাজিক আচার-আচরণ, রীতিনীতি নানান বিষয় উঠে আসে। এখানে আমরা লেখিকা শৈলবালা ঘোষজায়ার রচনায় এই লোকগত উপাদান দুটির ব্যবহার কেমন তা দেখে নেবার চেষ্টা করব।

এ প্রসঙ্গে প্রথমেই আসা যাক প্রবাদের কথায়। প্রবাদ হলো অসংখ্য কেজো কথাবার্তার মধ্যে অন্য ধরনের রূপ নিয়ে হাজির হওয়া একটি উক্তি যা বিশেষ বার্তা দিয়ে যায়। বিষয়গতভাবে প্রবাদের বিস্তার বৃহৎ। সেখানে দেব-দেবী, ইতিহাস, মানব দেহ, পুরানকে আশ্রয় করে যেমন প্রবাদ রচিত হতে দেখা যায় তেমনি আমাদের চারপাশ অর্থাৎ শিক্ষাক্ষেত্রের পরিচিত মানুষজন, বন্ধুবর্গ, বাবা-মা, প্রতিবেশী, পারিবারিক জীবন, মানুষের আচার-আচরণ, পেশা, অসুখ প্রভৃতি সূত্র থেকে মৌখিকভাবে এসে হাজির হয় এবং নজর আকর্ষণ করে। জ্ঞান ও কথার অস্ত্র হিসাবে কাজ করা এই প্রবাদ জনসাধারণকে সচেতন করার বা শিক্ষা দেওয়ার একটা মাধ্যম। তখনকার সমাজে প্রবাদ একবার প্রতিষ্ঠিত হয়ে গেলে ধর্মীয় পুরোহিত বা গোষ্ঠীপতি কারও পক্ষে তার পরিবর্তন করা সম্ভব ছিল না। আর প্রবাদ যেহেতু প্রাগৈতিহাসিক যুগের ফসল তাই সেখানে মানব জীবনের নানান ত্রুটি-বিচ্যুতি, অসংগতি, সংস্কার ইত্যাদি নানান বিষয়গুলিরও পরিচয় উঠে আসে। উপমাচ্ছলে সংক্ষিপ্তভাবে কোন ঘটনাকে বা কাহিনীকে আশ্রয় করে, সোজাসুজি না বলে তির্যকভাবে ব্যঙ্গাত্মক কৌতুক এর মাধ্যমে বিভিন্ন বিষয়কে প্রকাশ করা হয়। প্রবাদের শব্দাবলী সংকীর্ণ সীমায় আবদ্ধ থাকে না, তা ব্যঞ্জনায় ব্যাপ্তি লাভ করে। শৈলবালা ঘোষজায়ার কথাসাহিত্যে যে সমস্ত প্রবাদ ব্যবহৃত হয়েছে তার একটি তালিকা নিম্নরূপ-

১। উদোর পিন্ডি বুধোর ঘাড়ে।

২। একে রামে রক্ষা নেই সুগ্রীব দোসর ।

৩। জোর যার মুল্লুক তার।

৪। ধরা খানা সরা।

৫। ধর্ম্মের ঢাক আপনি বাজে।

৬। লক্ষীর মা ভিক্ষে মেগে খায়।

৭। নাই কাজ তো খই ভাজ।

৭। একা নদী ষোল ক্রোশ।

৮। হাতে চাঁদ পাই।

৯। এ মরে ও মরে আমার প্রাণ ধরফর করে।

১০। ভেকেরা যেথায় বক্তা, সেথায় নীরব থাকাই ঠিক।

১১। ধান ভানতে শিবের গীত।

১২। মারি তো গন্ডার লুঠি তো ভান্ডার।

১৩। কুকুরকে দিলে মুগের পথ্যি কুকুর বলে একি বিপত্তি।

১৪। চাষার গিদ্দে, কাস্তের ঠোক্কর।

১৫। সেকরার ঠুক্‌ঠাক্ কামারের এক ঘা।

১৬। শাঁপে বর।

১৭। বিধির মার দুনিয়ার বার।

১৮। পড়ল কথা সবার মাঝে/ যার কথা তার গায়ে বাজে।

১৯। গুরু পুরুতের দ্বন্দ্ব উভয়ে সমান সম্বন্ধ কাকে বলি ভালো-মন্দ ! -চুপই আচ্ছা।

২০। সুখে থাকতে ভুতে কিলোয়।

২১। ভূতের আবার জন্ম বার।

এখন এই সমস্ত প্রবাদ গুলি কোন প্রসঙ্গে উপস্থিত হয়েছে সেই প্রেক্ষিতেই প্রবাদগুলির সামাজিক ঐতিহাসিক পটভূমি তুলে ধরার চেষ্টা করব কয়েকটি প্রবাদের আলোচনার মাধ্যমে।

এ প্রসঙ্গে প্রথমেই 'উদোর পিন্ডি বুধোর ঘাড়ে' এই প্রবাদের কথায় আসা যাক। এখানে উদো বলতে নির্বোধ, হাবা গোবা, কান্ডজ্ঞানহীন, বোকা অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। সঙ্গে বুধো কথাটির মানেও উদোর মতোই বোকা বা মূর্খ ব্যক্তিকেই বোঝায়। বুধো শব্দটা হিন্দি বুদ্ধু শব্দের মত। তাহলে উদো, বুধো কে বোঝা গেলেও পিন্ডি কেন বুধোর ঘাড়ে চাপানো হয় সেটাও দেখতে হবে। এখানে পিন্ডি বলতে দোষ, কাজ বা কর্তব্য কে বোঝানো হয়েছে। এখন তাহলে প্রবাদটি আক্ষরিক অর্থে দাড়ালো এক ব্যক্তির দোষ কাজ কর্তব্য অন্যের ঘাড়ে চাপিয়ে দেওয়া বোঝাচ্ছে। এছাড়াও এই উদো আর বুধো চরিত্র দুটি সুকুমার রায়ের হ য ব র ল গল্পে বর্তমান। তবে এই প্রবাদটি শৈলবালা ঘোষজায়ার 'কোন রোগ' গল্পে একটা বিয়ে উপলক্ষে জমায়েত হওয়া পুরুষেরা এদেশী ও বিদেশী পুলিশ সম্পর্কে

তুলনামূলক আলোচনা করে বিদেশের পুলিশের কর্মকাণ্ডের সুখ্যাতি করে এদেশী পুলিশেরা কেমন কাজ করে সেটা বোঝাতে গিয়ে এই প্রবাদের ব্যবহার করেছেন।

"একে রামে রক্ষা নাই সুগ্রীব দোসর" এই প্রবাদের মূলে যে কাহিনী আছে তা হল রাম ও সুগ্রীব সহযোগে সীতা উদ্ধার বৃত্তান্ত। সীতাহরণের পর তাকে খুঁজতে খুঁজতে ঋষ্যমুখ পর্বতে এসে উপস্থিত হলে সুগ্রিবের সঙ্গে দেখা হওয়ার পর তার সঙ্গে বন্ধু সম্পর্ক স্থাপিত হয় রামের। একদিকে রাম বলশালী, তার সঙ্গে মিলেছে সুগ্রীব। যৌথ প্রচেষ্টায় সীতা উদ্ধার হয়। অর্থাৎ এই প্রবাদের অর্থ দাঁড়ায় একজন প্রভাবশালী ব্যক্তির সঙ্গে আরও একজন এসে যুক্ত হয়ে একত্রে কোন কাজ করলে তবে জয়লাভ নিশ্চিত। আবার একজনে রক্ষে নেই আর একজন এসে হাজির এমন অর্থেও ব্যবহৃত হয়। তবে লেখিকার 'অকালকুষ্মাণ্ডের কীর্ত্তি' গল্পে এ্যম্বক নামের চরিত্র কে ঘাবড়ে দেবার জন্য তার বিয়ে হয়ে গেছে বলে পিসিমা এবং বাড়ির সকলকে জানানো হয়। এমনকি এ্যম্বকের শ্বশুর ও স্ত্রীর সাজেও থাকে দুজন, বিয়ে হবার কথাটা প্রতিষ্ঠা দেবার জন্য। প্রথমে এ্যম্বকের শ্বশুরের ভূমিকায় যে সেজে ছিল সে এসে উপস্থিত ছিল। পরে স্ত্রীর ভূমিকায় যে ছিল তার কণ্ঠ শোনা মাত্রই এগুলো কারা করেছে এ্যম্বক জানতে পারে। বুঝতে পারে তারই বাড়ির লোক উপদ্রব ও তুতু দুজনে সেজে এসব করেছে তাকে চমকে দেবার জন্য। এই প্রসঙ্গে এ্যম্বকের মুখে এই প্রবাদের ব্যবহার করেছেন লেখিকা।

'ধরা খানা সরা' প্রবাদটিতে ধরার অর্থ হলো পৃথিবী বা বিশালাকার আর সরা মানে মাটির তৈরি পাত্র। এই সরা মাটির হওয়ার কারণে তুচ্ছ অর্থে বিবেচিত। অর্থাৎ এর আক্ষরিক অর্থ বোঝায় পৃথিবীকে ছোটো সরার মত মনে করা বা অহংকারে অন্ধ হয়ে সবকিছু তুচ্ছ জ্ঞান করা। লেখিকার 'সূক্ষ্ম-ধর্ম্মজ্ঞান' গল্পে গৌর গোপাল নামের এক

চরিত্রের চেহারার বিবরণ দিতে গিয়ে গৌরের মধ্যে গৌরত্ব নেই এবং গোপালের মধ্যে কংস ধ্বংসকালীন বাসুদেবের সংহার মূর্তির ছবি ধরা পড়ে বলে জানিয়ে এই প্রবাদের ব্যবহার করেছেন। অর্থাৎ চেহারায় বিশাল হলেও ব্যবহারে তুচ্ছ একটা মুরুব্বিয়ানা সুলভ অহংকার দেখা যায় তার মধ্যে।

'ধর্ম্মের ঢাক আপনি বাজে' প্রবাদের আক্ষরিক অর্থই হলো সত্য বিষয় চাপা থাকে না তাকে যতই দমিয়ে রাখা হোক তার বহিঃপ্রকাশ আপনা আপনিই হবে। সত্য কখনও গোপন থাকে না। 'তেজস্বাতী' উপন্যাসেও তৃপ্তি চরিত্রের দাদা দেবেন্দ্র তার হ্যান্ড নোট অসৎ ছোট বাবু নামের এক চরিত্রের কাছে দেয়। ছোট বাবু সে সমস্ত ব্যবহার করে মানুষকে চাপ সৃষ্টি করে নানান কাজ করতে বাধ্য করে। এরকম ভাবে একদিন ছোট বাবু চরিত্রের কুকীর্তির কথা বেরিয়ে আসে পুলিশের তৎপরতায়। এই সমস্ত অসৎ কাজ প্রকাশ পেয়ে যাওয়ার প্রসঙ্গে এই প্রবাদ ব্যবহৃত।

'হাতে চাঁদ পাই' এই প্রবাদে চাঁদ হচ্ছে ধরা ছোঁয়ার বাইরে অসম্ভব এমন একটা জিনিস। সেটাকে হাতে পাওয়া মানে অসম্ভবকে হাতে পাওয়া। অর্থাৎ অসম্ভব কঠিন কোন কিছু পাওয়া অর্থ বোঝায়। এখানে রঙিন ফানুস উপন্যাসে দুইজন শনিচর ও খন্তর তাদের স্ত্রীর প্রসঙ্গে কথা বলতে গিয়ে এই প্রবাদ ব্যবহার করেছে। শনিচর নিজের বউ এর থেকে বেশি ভালো বলেছে খন্তরের স্ত্রীকে। এখানে ভালোবাসার দিক থেকে খন্তরের স্ত্রীর শ্রেষ্ঠত্বের কথা জানিয়ে শনিচর খন্তরকে চাঁদ হাতে পেয়েছে বলে মন্তব্য করেছে।

'ধান ভানতে শিবের গীত'- এই প্রবাদে অপ্রাসঙ্গিক বিষয়ের অবতারণার কথা বলা হয়েছে অর্থাৎ কাজের কাজ ফেলে রেখে অন্য প্রসঙ্গে চলে যাওয়া বোঝাতে ব্যবহৃত হয়েছে এই প্রবাদটি। 'রঙীন ফানুস' উপন্যাসেও খন্তর বিয়ের প্রসঙ্গে শনিচরের সঙ্গে

কথা বলতে বলতে বিয়ে না হলেও চলবে, কিন্তু পবিত্র জীবন সবার চাই এই ভাবনা প্রত্যেক ছেলে মেয়ে যাতে ভাবে এই কথায় চলে যায়। এই এক কথা থেকে অন্য প্রসঙ্গে যাওয়ার কারণেই এই প্রবাদের ব্যবহার হয়েছে।

'চাষার গিদ্দে কাস্তের ঠোক্কর' এই প্রবাদটি 'রঙীন ফানুস' উপন্যাসে খন্তর তার স্ত্রীকে বাহু বেষ্টনীতে রেখে জলের ছিপি খুলে গায়ে ঢেলে দেবার ভয় দেখালে স্ত্রীও পানের পিক গায়ে ফেলে দেবে বলে সতর্ক করে। একসময় জামায় পাণের পিক ফেলে দেওয়ার পর লোকে ঠিকই বলে এটা জানিয়ে এই প্রবাদটি বলেছেন এবং শোধ নেবে বলে জানায়। অর্থাৎ দুজনেই বরাবর প্রতিশোধস্পৃহা প্রবন এই অর্থ বোঝায়।

'একা নদী ষোলো ক্রোশ- প্রবাদটিতে একাই বিশাল এই অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে দামোদার নদের বিশালতা বোঝাতে নিরঞ্জন সর্দার গল্পে এই প্রবাদের ব্যবহার করেছেন লেখিকা।

'ইমানদার' উপন্যাসের মধ্যে পাওয়া কয়েকটি প্রবাদ হল- 'জোর যার মুল্লুক তার', 'উড়ো খই গোবিন্দায় নমঃ' 'মারি তো গন্ডার লুটি তো ভান্ডার', 'লক্ষীর মা ভিক্ষে মেগে খায়'। 'জোর যার মুল্লুক তার' প্রবাদটি দেখলে এখানে মগের মুলুকের কথাটা মাথায় আসে। যেখানে গায়ের জোর যার যেকোনো জিনিস জয় (মুল্লুক) তার এই কথাটাই উঠে আসে। এবং মনে মনে অষ্টাদশ উনবিংশ শতাব্দীতে বাংলাদেশে এবং সুন্দরবন অঞ্চলে মগ দস্যুদের গায়ের জোরে মুল্লুক দখলের কথা ভাসে। তাহলে এই প্রবাদের আক্ষরিক অর্থই হল- ক্ষমতা যার দখল তার। শৈলবালা ঘোষজায়ার 'ইমানদার' উপন্যাসে সুমতি দেবী চরিত্র তার ভাই সুনীলকে বলেছে তার (সুমতি দেবীর) শশুর বাড়ি জয়দেবপুরের সম্পত্তির অকারণে বেহাত ও লুটপাট হয়ে যাওয়ার প্রসঙ্গে। এখানেও নিরীহ মেয়েমানুষ

পেয়ে শ্বশুরবাড়ির লোকেরা তাকে ফাঁকি দিয়ে সম্পত্তি নিজেদের দখলে করে নিতে চায় এমন দৃশ্য দেখা যায়। এখানেও এই প্রবাদের ব্যবহার সার্থক। পরবর্তীতে 'ইমানদার' উপন্যাসে পল্লী বাসীর সমালোচনার মনোভাব, লোভ ইত্যাদিতে বিশেষত্ব দেখে 'মারি তো গন্ডার'; লুঠি তো ভান্ডার এই প্রবাদ ব্যবহার করেছেন। অর্থাৎ পল্লীবাসী যা করবে সবই বড়সড়ো অর্থাৎ বৃহৎ কিছু করা অর্থে ব্যবহৃত। এরপর 'ওরা খাই গোবিন্দায় নমঃ'- এই প্রবাদটির আক্ষরিক অর্থ হলো হাতছাড়া জিনিসপত্র দান করে দেওয়া। যে জিনিস পেতে মালিক আর আশা রাখে না তা দান করা। এর উৎসে বাংলার লোকমুখে এক গল্প আছে। একজন জনৈক ব্যক্তির মাথায় করে খই নিয়ে যাওয়া, প্রচন্ড ঝড়ে উড়ে যাওয়া খই সামলাতে না পেরে তা গোবিন্দের উদ্দেশ্যে দান করার গল্প। এই উপন্যাসে প্রবাদটি ব্যবহৃত হয়েছে সুমতি চরিত্রের শ্বশুরবাড়ির সম্পত্তি বেহাত হয়ে যাওয়ার ঘটনায়। বেহাত হয়ে যাওয়া সম্পত্তি কিছু করতে পারবে না এই ভেবে সে হাত গুটিয়ে নিলে তার ভাই সুনীলকে দিদি সুমতির উদ্দেশ্যে এই প্রবাদটি ব্যবহার করতে দেখা যায়। পরবর্তী প্রবাদ হল 'লক্ষীর মা ভিক্ষে মেগে খায়'। এর আক্ষরিক অর্থ হল প্রচুর অর্থবান হয়েও ভিক্ষাবৃত্তি করা। এখানে মোক্ষদা মাছ ছাড়া তার মেয়ের খাবার রোচেনা এই কথা সুমতি দিদির কাছে জানায় এবং মেয়ের জন্য তার নাকি এই অন্যের বাড়িতে রান্নার কাজ করা। নাহলে নাকি তার অনেক জমি, অভাব নেই। নিজের কথা নিজের মুখেই বলে যায় প্রসঙ্গক্রমে মোহন্ত মশাইয়ের নাম নিয়ে জানায় যে মোহন্ত মশাই নাকি তাকে বলেছে যে সে লক্ষীর মা, তবুও ভিক্ষে মেগে খায়। নিজের বলা কথাকে আরও দৃঢ় করতে তাকে এমন প্রবাদের ব্যবহার করতে দেখা যায়।

'সেকরার ঠুক্‌ঠাক্ কামারের এক ঘা' প্রবাদে অযোগ্য ব্যক্তির বারবার চেষ্টা আর যোগ্যর এক ঘাই যথেষ্ট এই অর্থ প্রকাশ পায়। অবাক উপন্যাসের কাহিনীতে বেগম চরিত্রটি তার

জামাইবাবুর সম্মুখে আসতে চায় না এই সূত্র ধরে দিদি সোফিয়া অসুস্থ এই বলে এক দাসীর হাত দিয়ে খবর পাঠায় বেগমকে। বেগম এসে যখন সব ঠিক আছে দেখে এবং জামাইবাবুও সামনেই আছে দেখে তখনই সোফিয়ার অভিসন্ধি বুঝে তার সঙ্গে কথা বন্ধ করে দেয় সেদিন বাবা-মায়ের উপস্থিতিতে ব্যাপারটা মিটে যায়। তবে সোফিয়া কিছুটা সমঝে চলার চেষ্টা করলেও স্বভাব বশে তার এমন আচরণ হয়েই যায়। এই বারবার সোফিয়ার এমন কর্মকাণ্ড বোঝাতে সেকরার ঠুকঠাক এবং বেগমের একদম চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেওয়া কে কাস্তের একঘার সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে। এই ভাবেই এ প্রবাদ কাহিনীতে এসে পড়তে দেখা যায়।

এছাড়াও এই ‘অবাক’ উপন্যাসেই আবারো একটি অংশে বেগম ও মন্নুর বিয়ে না করার মনোভাব দেখে স্বয়ং জামাইবাবুকে পর্যন্ত ব্যঙ্গ করতে দেখা যায়। বারবার বিয়ের কথা বললেও তারা তাদের মত বদলায় না এরকম অবস্থায় সোফিয়াকে ‘এ মরে ও মরে আমার প্রাণ ধরফর করে’ এই প্রবাদটি ব্যবহার করতে দেখা যায়। অর্থাৎ অন্যের দুঃখে নিজের শরীর খারাপ হওয়ার কথা আছে। যা প্রাসঙ্গিক নয় অর্থাৎ যার দুঃখ তারই কষ্ট হওয়া দরকার কিন্তু হচ্ছে অন্যদের সেইটা এই এদের বিয়ে কে কেন্দ্র করে সোফিয়াকে বলতে দেখা যায়।

আবার এত কথার পরও যখন জামাইবাবু মতের মিল নিয়ে কথা তোলে। পূর্বে দুজনের কথোপকথনের মাঝে ব্যবহার করা আমরা শব্দটিকে ঘিরে বেগম ও মন্নুকে প্রচুর রাগানো হয়েছিল। এই আমরা শব্দে আমরা কারা ভুলে যাবার ভান করে বেগমকে জামাইবাবু পুনরায় জানতে চাইলে বেগম চুপ থাকে একদম। এই অবস্থায় জামাইবাবু বলেন যে প্রবাদটি তা হল 'ভেকেরা যেথায় বক্তা, সেথায় নীরব থাকাই ঠিক।' অর্থাৎ

ভেক মানে ব্যাঙ, যার ভাষা মানুষে বোঝে না তাই কথোপকথন বন্ধ থাকে। এই নিকৃষ্ট করে দেখা অর্থেই বেগমের উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত হয়েছে প্রবাদটি। জামাইবাবু বেগমের চুপ থাকা নিয়ে এমন প্রবাদ ব্যঙ্গ করে বলেছিলেন। এখানে এই বেগমের নীরব থাকা দেখে এমন বিপত্তি ঘটায় আফসোস করে বেগম ‘বিধির মার দুনিয়ার বার’ কথাটি ভাবতে থাকে। আসলে এই প্রবাদটিতে জানানো হচ্ছে বিধির মার থেকে পালাবার পথ নেই তা সব ভাবনার অতীত। তাইতো নীরব থাকতে চেয়েও বেগম অন্য বিপদের মধ্যে জামাইবাবুর বক্রোক্তির মুখে পড়েছে।

আবার বিয়ে না করার মানসিকতা যুক্ত বোন যখন সোফিয়ার দেওর মন্নুর প্রতি অনুরাগী হয় সে খবর সোফিয়া ঢাক পিটিয়ে দেয় বন্ধু মহলে। বান্ধবীরা একসময় বেগমকে তার জেদ মাঝপথে বিলুপ্ত হবে বলে অভিশাপ দিয়েছিল তাই খবর পেয়ে বান্ধবীরা এসে তাকে জিজ্ঞাসা করে ‘শাঁপে বর’ হলো কিনা। এখানে এই প্রবাদের মূল উৎস রামায়ণ। দশরথের মৃগয়া কালীন ভ্রমে অন্ধ মুনীর পুত্র হত্যা ও অভিশাপ পাওয়ার ঘটনা মনে করায়। এখানে অভিশাপ পাওয়ার পর পুত্রেষ্টি যজ্ঞ করে দশরথ পুত্র লাভ করে। অর্থাৎ শাপের বিপরীত ফল দেখা যাচ্ছে। এখানে অনিষ্টের মধ্যে ইস্টলাভ হয়ে যাওয়া বোঝাতে এই প্রবাদ 'শাঁপে বর' এখানে ব্যবহার করেছেন লেখিকা।

‘সই’ উপন্যাসের মধ্যে ব্যবহৃত কয়েকটি প্রবাদ হল 'পড়ল কথা সবার মাঝে, যার কথা তার গায়ে বাজে', 'নাই কাজ তো খই ভাজ', 'কুকুরকে দিলে মুগের পথ্যি; কুকুর বলে একি বিপত্তি'।

‘পড়ল কথা সবার মাঝে যার কথা তার গায়ে বাজে’ এই প্রবাদটির আক্ষরিক অর্থ হল সকলের সামনে কথা বলা হলেও কথাটি ঠিক যার প্রসঙ্গে বলা হল ঠিক তারই গায়ে

লাগে। এই উপন্যাসে 'আমার বিদ্যে' বলে একটি লেখা নিয়ে সমালোচনা করতে বসে বিদ্যুৎ লতাকে উদ্দেশ্য করে নানান কথা বলতে থাকে তার স্বামী হিতেন্দ্র। এই পরিস্থিতিতে বিদ্যুৎলতা একটা রেগে উত্তর দিলে সেই প্রেক্ষিতে এই প্রবাদের অবতাড়না।

পরবর্তী 'নাই কাজ তো খই ভাজ' প্রবাদটির আক্ষরিক অর্থ হল কাজকর্মহীন মানুষের সময় কাটানোর জন্য করে ফেলা আজে বাজে কাজ। যার কোন দরকার নেই। উপন্যাসে হিতেন্দ্র চরিত্রটি ছুটির দিন কি করবে সেটা বুঝতে না পেরে সারাক্ষণ অন্যান্য মানুষদের টিকা টিপ্পনি দিয়ে কথা বলে যায়। এই অবস্থায় তার কর্মশূন্যতার কথা প্রসঙ্গে এই প্রবাদের ব্যবহার দেখা যায়। এরই সঙ্গে কর্মহীন দিন কাটাতে হিতেন্দ্রর একদম ভালো লাগে না। তাই এমন জ্বালাতন করেই তার দিন কাটায়। এটা স্বীকার করে নিতে গিয়ে ছুটি তার সহ্য হচ্ছে না বোঝাতে 'কুকুরকে দিলে মুগের পথ্যি; কুকুর বলে একি বিপত্তি' এই প্রবাদ টার ব্যবহার করেছেন। অর্থাৎ কর্মযুক্ত মানুষের ক্ষেত্রে কর্মহীন হয়ে বসে থাকা বড্ড বিপত্তির এই অর্থেই এই প্রবাদের ব্যবহার হতে দেখা যায়।

থিয়েটার দেখা গল্পে ব্যবহৃত একটি প্রবাদ 'সুখে থাকতে ভুতে কিলোয়'। এই প্রবাদের আক্ষরিক অর্থ হল ঠিক ঠিক কিছু করতে গিয়ে হঠাৎ মতিভ্রম হওয়া। গল্পে গাড়ির মধ্যে সঠিক জায়গাতে নন্তু চরিত্রকে বসার সুযোগ দেয়া হলে সে তা নিতে না চাইলে সেই প্রসঙ্গেই এই প্রবাদের ব্যবহার লক্ষ করা যায়।

'ভূতের আবার জন্ম বার' প্রবাদটির আক্ষরিক অর্থ হলো ভুত সে দেহাতিরিক্ত অস্তিত্ব তার জন্মবার সেটা বড়ই বেমানান। এখানেও ননী খানসামার ছুটি যাপন গল্পে বাইরে থেকে হঠাৎ আসা স্বামীর সেবায় রতো স্ত্রী স্বামী কি খাবে, হাত মুখ ধোয়া এসব বলার সঙ্গে সঙ্গে তামাক সেজে দেবে কিনা জানতে চাইলে সে বিড়ি আছে বলে জানায়।

তখন স্ত্রী তাকে ভদ্দরনোক হয়েছে বলে ব্যঙ্গ করলে তার উত্তরে এই প্রবাদ ননীকে ব্যবহার করতে দেখা যায়। অর্থাৎ যা খুশি খেলেই হল একটা। সারাক্ষণ বাইরে থাকা তাই যেটা বইতে সুবিধা তাই সঙ্গে রাখে।

এভাবেই লেখিকার বিভিন্ন গল্প উপন্যাসের মধ্যে প্রবাদ গুলি ব্যবহৃত হতে দেখা যায় এবং যথাযথ অর্থ ধরেই সঠিক প্রসঙ্গে, সঠিক স্থানে লেখিকা প্রবাদ গুলি প্রয়োগ করেছেন যা সত্যিই প্রশংসিত।

লোকগত উপাদানের মধ্যে এখন ছড়ার কথায় আসা যাক। ছড়া লোকায়ত মানুষের একটা আদিমতম বাকশিল্প। এখানে পারিবারিক বা সামাজিক বিভিন্ন অনুভূতি সঞ্চিত থাকে। ছড়ার একটি স্বচ্ছন্দ গতি আছে, ছন্দ আছে, বক্তব্য অত্যন্ত প্রাঞ্জল। এর মধ্যে থাকা টুকরো টুকরো ছবিগুলিকে জুড়লে একটা পটভূমিকা পাওয়া যায়। ছড়ার বিষয় অনুযায়ী নানান শ্রেণী লক্ষ করা যায়। প্রতিদিনের জীবন যাত্রার নানান তুচ্ছ ঘটনা, আনন্দ, বেদনা মিশ্রিত এই ছড়াগুলো ছন্দের চাতুর্যে গতিময়তা লাভ করে। এখন আমরা শৈলবালা ঘোষজায়ার রচনায় ব্যবহৃত কয়েকটি ছড়ার কথা নিম্নে আলোচনা করব।

লেখিকার অকালকুষ্মাণ্ডের কীর্ত্তি নামক গল্পে ব্যবহৃত একটি ছড়া হল-

“কি বলব তার রূপের কথা, বলতে লজ্জা করে।

অন্ধকারে দেখ্‌লে মানুষ মুর্চ্ছা হয়ে পড়ে !” ১১৪

গল্পের মধ্যে একটি অংশে এ্যম্বকের বিয়ের কথা রটিয়ে দেওয়া হয়। তারপরেই একজন শ্বশুর বেশ ধরে এসে বিয়ের প্রসঙ্গ তোলে। বউ এর রূপ বর্ণনা দেয় শম্ভু। পিসিমার কাছে এই ছড়ার মাধ্যমে যা বলা থাকে তাতে এ্যম্বকের বিয়ে করা বউয়ের রূপের কথা।

তাই বাড়ির সদস্যদের মধ্যে শম্ভু মজা করে তার বউকে কালো বলে বুঝিয়ে অন্ধকারে মুর্চ্ছা যাবার কথা বলেছে। এই ভাবেই একটা সুন্দর রঙ্গ রসিকতা ছড়ায় ফুটে উঠতে দেখা যায়। ভাই-ভাই সম্পর্কে এই রঙ্গ রসিকতার পরিবেশ আমাদের অত্যন্ত চেনা।

এরপর শম্ভুর মুখে আরো একটি ছড়া শোনা যায় তা হল-

"তুম, ছাতু খাও, আর যো খাও,

মেরা দাদাকো খিলায়ো ভাত !

কারণ — ভাত না খানেসে, তিন রোজ মে দাদা

আমার হো যাগা চিৎপাত ! —" ১১৫

আগেই দেখা যাচ্ছে শ্বশুর ও বউ সাজার প্রসঙ্গ। আর এটা কারা সেজেছিল সেটা প্রকাশের পর যখন ওই ঘোমটা পড়া ছোট্ট বালিকার উদ্দেশ্যে শম্ভু এমন ছড়া বলে তখনই একটা হাস্যকর পরিবেশ তৈরি হয়। এইভাবে বড়দাদার সঙ্গে ছোট ভাইবোনদের রসিকতা দেখা যায়। এবং এই রসিকতা পূর্ণ ছড়ার মধ্যে খাদ্যাভ্যাসের প্রসঙ্গটিও ধরা দেয়।

রঙিন ফানুস উপন্যাসে ব্যবহৃত একটি ছড়া হল-

"যো রোগী,- সো যোগী। যো যোগী- সো ভোগী ।" ১১৬

এটি পশ্চিমাঞ্চলে ব্যবহৃত হওয়া একটি উপাদান। অর্থ হল যে ব্যক্তি রোগীর মত সুসংযত ভাবে জীবন ধারণ করেন তিনি পবিত্র জীবন লাভের যোগ্য বলে বিবেচিত এবং এরকম সংযমী মানুষই সকল ভোগের পূর্ণ আনন্দে যথার্থ তৃপ্তি লাভ এর অধিকারী হন। এরকমই ভোগের বিরুদ্ধে ছড়াটি স্ত্রী পার্বতীকে সময় দিতে না পারার অভিযোগের উত্তরে খন্তরের মুখে শোনা যায়।

এরপর অরু উপন্যাসে ব্যবহৃত একটি ছড়া হল-

"সোয়ামী যাকে করে হেলা, রাখাল তাকে মারে ঢেলা"- ১১৭

স্বামী পরিত্যাক্তা স্ত্রীকে যে কেউ তুচ্ছ মনে করে। এই কথাই এই ছড়ায় প্রকাশ পায়। উপন্যাসের মধ্যেও অরুর স্বামী প্রতাপ যখন তখন অরুর উপর নানান বিষয়ে জোর খাটায়, অত্যাচার করে। একদিন ক্ষেমঙ্করী ও সুভদ্রা ঠাকুরানি অরুর সঙ্গে দেখা করতে এসে প্রতাপের কুশল জানতে চাইলে কোন উত্তর দেবার প্রয়োজন মনে করে না প্রতাপ উল্টে ঘরে ঢুকে যায়। এরপরই ওই কুটুমদের সঙ্গে কথা চলাকালীন প্রতাপের রাগ কেন সেই প্রসঙ্গ আসে। এই সূত্রে সুভদ্রা ক্রোধই রিপু এসব বললে প্রতাপ শুনতে পেয়ে অরুর নামে দোষ দেয় এবং নানান তিরস্কার করে। ক্ষেমঙ্করী প্রতাপকে থামাতে চেয়েও অসফল হয়। অরুর স্বামীর এরকম ব্যবহারে অবহেলা প্রকাশ পায়। এই প্রসঙ্গ থেকেই ক্ষেমঙ্করী নামের চরিত্রের মুখে এ ছড়ার সংযোজন হয়। এভাবেই কিছু ছড়ার ব্যবহার লেখিকার রচনা থেকে দেখতে পাওয়া যায়।

৯। সমান্তরাল বাক্যের চলন-

প্রথমেই সমান্তরালতা বিষয়টি কি সেটা সম্পর্কে একটু জেনে নেওয়া যাক। সমান্তরালতার ইংরাজি অর্থ 'Parallelism'। এই 'Parral' কথাটি প্রথম আবিষ্কার করেন অ্যারিস্টটল। তিনি জর্জিয়ার ছাত্র। তিনি একটা ফ্লাওয়ারি ভাষা বলতেন [ফেনিয়া, ফুলিয়ে, গুছিয়ে বলা]। এইখান থেকে Parallelism এর ব্যাপারটা তিনি লক্ষ করেছিলেন। একে দুটো ভাগে ভাগ করা যায়-

1. Principle of equivalence (সমযোজ্যতা)

2. Reputation of the same structural pattern (একই গঠনের পুনরুক্তি)।

শিশির কুমার দাস প্রথম বাংলায় সমান্তরালতা নিয়ে কাজ করেছেন। তিনি স্তম্ভে ভাগ করে আলোচনা করেছিলেন। তিনি সমান্তরালতা বলতে সম গঠনের বা প্রায় সম গঠনের যেকোনো আম্বয়িক উপাদানের বারবার ব্যবহার এবং তার ফলে একটা সৌষম্যের সৃষ্টি হওয়াকে বুঝিয়েছেন। এটি একটি বাক্যের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকে না, বাক্যকে অতিক্রম করে একটি অনুচ্ছেদের মধ্যেও আন্বয়িক উপাদানের আবর্তনের মাধ্যমে থাকতে দেখা যায়। এর উপস্থিতি গদ্য ও পদ্য উভয় ক্ষেত্রেই হতে পারে। অর্থাৎ গঠনের পুনরুক্তি [Repetition of the same structural pattern] এটাই সমান্তরালতাবাদ। পুনরুক্তিকে যেমন সমান্তরাল বলা যায় না তেমনি একই গঠনের সঙ্গে বক্তব্য বিষয় একই হওয়া ধ্রুবপদ (Retrain) কেও এই সমান্তরাল বলে ধরা হয় না। কারণ হিসাবে চালক ও চল এই দুই উপাদানের উপস্থিতির কথাও লক্ষ করা যায়।

এই চালক আর চল এই উপাদানের কথা প্রসঙ্গে PCOB Theory -এর প্রসঙ্গ এসে যায় যেটা Principle and parameter 81 এর তত্ত্বের উপর প্রতিষ্ঠিত। Operator এবং Binding (পরিচালনা এবং আবদ্ধ করা) যার মূল কথা। আর এই সমান্তরাল উপাদান গুলোকে আবদ্ধ হওয়ার যোগ্যতা রাখতে দেখা যায়। এই সমান্তরালতায় সাধারণ ধর্মযুক্ত উপাদান টা হল চালক, আর যে উপাদান গুলো পরপর আসে তা হলো চল বা Variable।

এখন আমরা শৈলবালা ঘোষজায়ার রচনার মধ্যে ব্যবহৃত হওয়া কিছু সমান্তরাল গঠন দেখে নেওয়ার চেষ্টা করব। পাশাপাশি চালক ও চল দ্বারা আবদ্ধ করে তার গঠনগত রূপটাও দেখে নেবার চেষ্টা করব। এখন কিছু দৃষ্টান্ত নিম্নে তুলে ধরা হলো-

১. "খন্তর ফাগুয়া উৎসবে আনন্দমত্ত নরনারীদের তরল প্রমোদ-মত্ততার নাচ দেখিয়া, অশ্লীল ভাবদ্যোতক সংগীত চর্চার উৎসাহ দেখিয়া, অসংগত উদ্দাম জীবনযাত্রার গতি দেখিয়া, অসহিষ্ণু হইত।" ১১৮

এখন এই সমান্তরাল বাক্যটিকে চালক ও চল দ্বারা আবদ্ধ করলে যে প্যাটার্নটি দেখা যায়-

[a] চালক→ দেখিয়া [a] → চল→ [b] ফাগুয়া উৎসবে আনন্দমত্ত

নরনারীদের তরল প্রমোদ

মত্ততার নাচ। → অসহিষ্ণু হইত।

→ [c] অশ্লীল ভাবদ্যোতক সংগীত

চর্চার উৎসাহ।

→ [d] অসংগত উদ্দাম জীবন যাত্রার গতি

বাক্য

বাক্য বাক্য

খন্তর ফাগুয়া উৎসবে আনন্দমত্ত নরনারীদের

তরল প্রমোদ মত্ততার নাচ দেখিয়া। বাক্য বাক্য

অশ্লীল ভাবদ্যোতক সংগীত

চর্চার উৎসাহ দেখিয়া বাক্য বাক্য

অসংগত উদ্দাম জীবন অসহিষ্ণু হইত

যাত্রার গতি দেখিয়া

২. “ইহাদের অন্তঃসারশূন্য অপদার্থ বলিয়া গালি দিত। ইহাদের পীড়াদায়ক সংস্রবের পাশ কাটাইয়া নীরব গাম্ভীর্য্যে চলাফেরা করিত, ইহাদের সন্ত্রস্ত সঙ্কুচিত করিত।” ১১৯

[a] চালক→ ইহাদের [a]→ চল →[b] অন্তঃসার শূন্য অপদার্থ বলিয়া গালি দিত।

→ [c] পীড়াদায়ক সংস্রবের পাশ কাটাইয়া নিরব গাম্ভীর্য্যে চলাফেরা করিত।

→[d] সন্ত্রস্ত সঙ্কুচিত করিত।

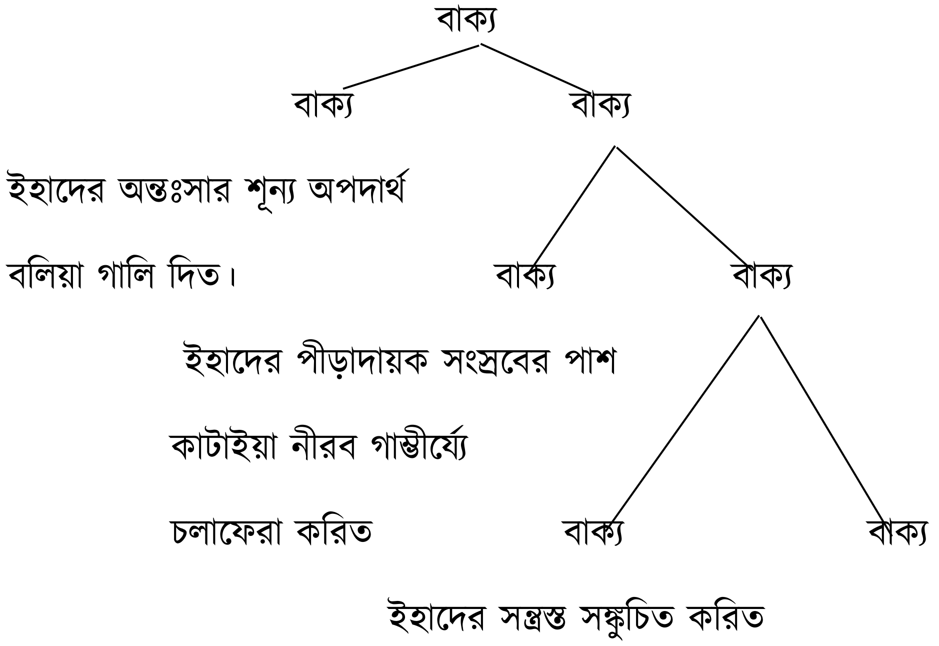

এই সমান্তরাল বাক্য টিকে স্তম্ভে ভাগ করে দেখালে উপাদানগুলির যে স্তর বিভাজন দেখা যায় তা নিম্নরুপ–

ক	খ	গ
ইহাদের	অন্তঃসসার শূন্য অপদার্থ বলিয়া	গালি দিত
ইহাদের	পীড়াদায়ক সংস্রবের পাশ কাটাইয়া	নীরব গাম্ভীর্য্যে চলাফেরা করিত
ইহাদের		সন্ত্রস্ত সঙ্কুচিত করিত

৩. "সন্ধ্যার পর যুবকের দল খঞ্জনি খরতাল লইয়া তাহার আঙিনায় আসিয়া চ্যাটাই পাতিয়া বসিল। মহোৎসাহে সংগীত চর্চা জুড়িল। ভাঙ চলিল, গাজা চলিল।" ১২০

এই বাক্যটিকেও চালক ও চল দ্বারা আবদ্ধ করলে যা দেখা যায় তা নিম্নরূপ –

[a] চালক→ যুবকের দল→[a]→চল →[b] সন্ধ্যার পর যুবকের দল খঞ্জনি খরতাল লইয়া তাহার আঙিনায় আসিয়া চ্যেটাই পাতিয়া বসিল

।

→ [c] মহোৎসাহে সংগীত চর্চা জুড়িল

→ [d] ভাঙ চলিল, গাজা চলিল।

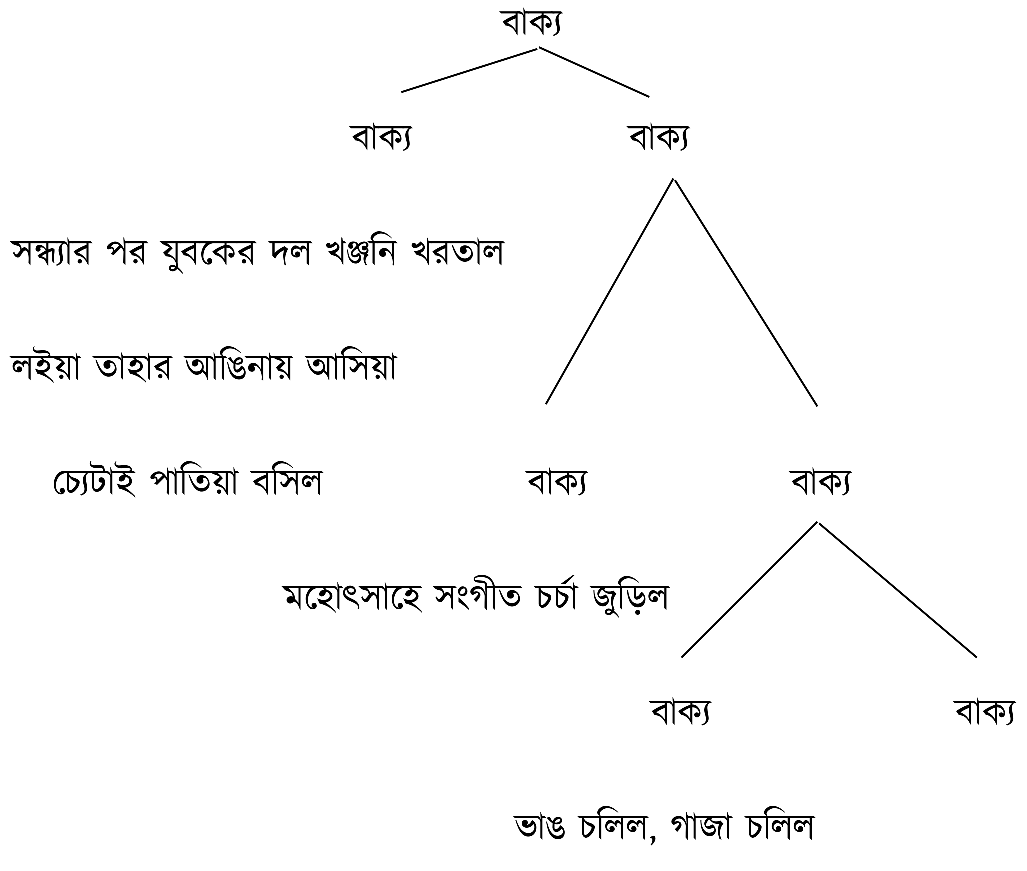

এই সমান্তরাল বাক্য টিকে স্তম্ভে ভাগ করে দেখালে উপাদানগুলির যে স্তর বিভাজন দেখা যায় তা নিম্নরূপ –

ক	খ
যুবকের দল	সন্ধ্যার পর যুবকের দল খঞ্জনি খরতাল লইয়া তাহার আঙিনায় আসিয়া চ্যেটাই পাতিয়া বসিল।
	মহোৎসাহে সংগীত চর্চা জুড়িল।
	ভাঙ চলিল, গাজা চলিল।

৪."ভাং -এর নেশায় খন্তরের বিচার শক্তি স্তিমিত নিস্তেজ করিয়া মস্তিষ্কের রন্ধ্রে রন্ধ্রে, নব-যৌবনের বিস্মিত প্রায় মধুময় স্মৃতিগুলা হানা দিতে লাগিল। গভীর নিরাশাময় কি এক অজ্ঞাত বিষাদের ব্যথায়, নিষ্ফল যাতনায় মন ভার হইয়া উঠিল। কথা কহিতে কহিতে খন্তর ক্ষণে ক্ষণে অন্যমনস্ক হইয়া পড়িতে লাগিল। মুখমণ্ডলে অকারণে বেদনা গাম্ভীর্য্যের চিহ্ন পরিস্ফুট হইল।" ১২১

একইভাবে এই সমান্তরাল বাক্যটি চালক ও জল দ্বারা আবদ্ধ হলে যে প্যাটার্ন পাওয়া যাবে তা নিম্নরূপ –

[a] চালক → খন্তরের [a]→ চল →[b] ভাং -এর নেশায় খন্তরের বিচার শক্তি স্তিমিত নিস্তেজ করিয়া মস্তিষ্কের রন্ধ্রে রন্ধ্রে, নব-যৌবনের বিস্মিত প্রায় মধুময় স্মৃতিগুলা হানা দিতে লাগিল।

→ [c] গভীর নিরাশাময় কি এক অজ্ঞাত বিষাদ ব্যথায়, নিষ্ফল যাতনায় মন ভার হইয়া উঠিল।

→ [d] কথা কহিতে কহিতে খন্তর ক্ষণে ক্ষণে

অন্যমনস্ক হইয়া পড়িতে লাগিল।

→ [e] মুখমণ্ডলে অকারণে বেদনা গাম্ভীর্য্যর চিহ্ন

পরিস্ফুট হইল।

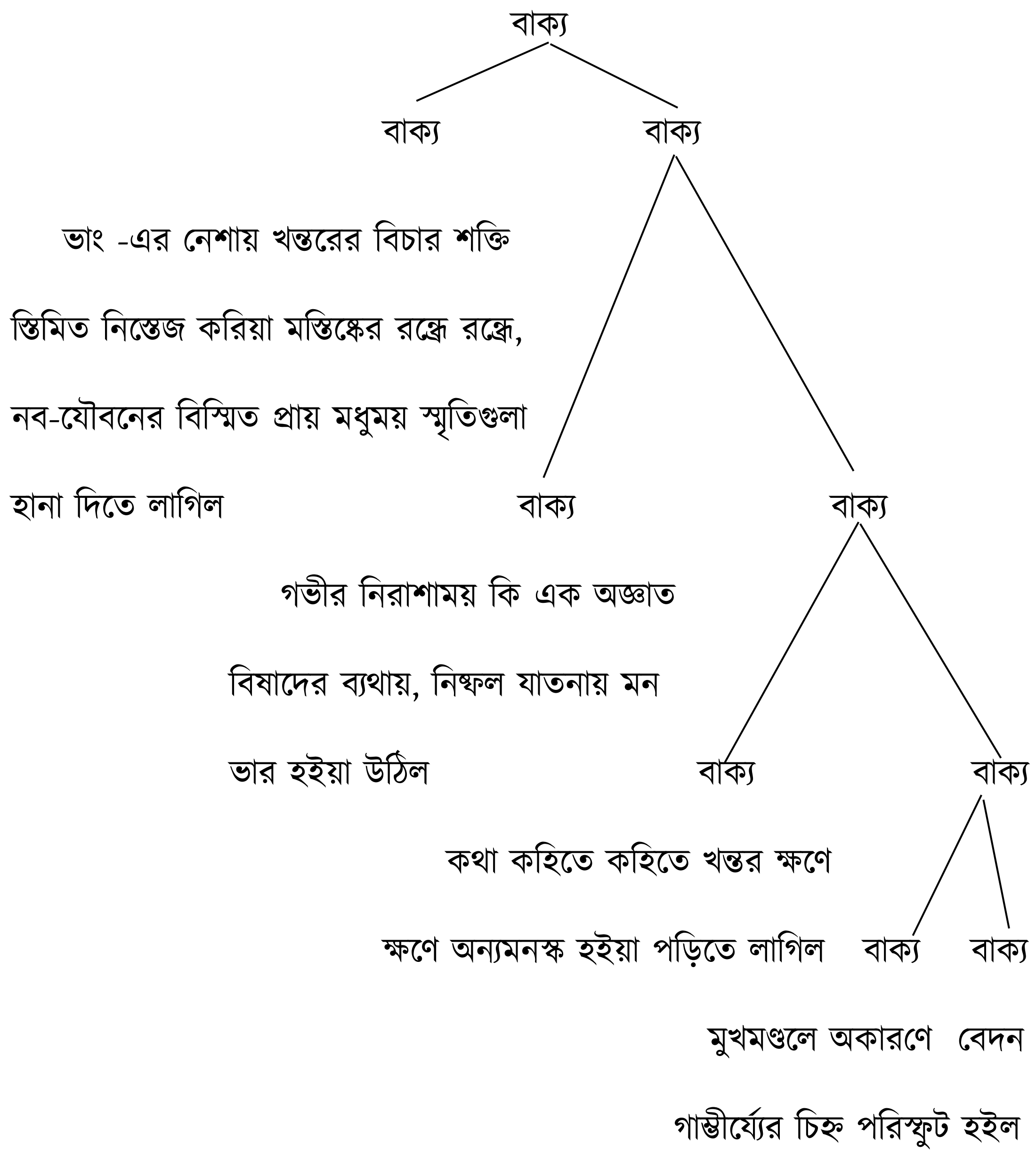

৫. “খন্তরও তাঁহার সহিত বাহিরে আসিল। মনোরোমার পীড়াপীড়িতে কোন মতে জলযোগ করিয়া বিমর্ষ চিন্তাকূল মুখে বাসায় চলিল। বিভিন্ন চিন্তার দ্বন্ধে তাহার হৃদ্‌পিণ্ডটা যেন ছিন্ন ভিন্ন হইয়া যাইতে লাগিল।” ১২২

চালক ও চল দ্বারা আবদ্ধ হয়ে গঠন নিম্নরূপ-

[a] চলক → খন্তর [a] → চল → [b] খন্তরও তাঁহার সহিত বাহিরে আসিল।

→ [c] মনোরোমার পীড়াপীড়িতে কোন মতে জলযোগ করিয়া বিমর্ষ চিন্তাকূল মুখে বাসায় চলিল।

→ [d] বিভিন্ন চিন্তার দ্বন্ধে তাহার হৃদ্‌পিণ্ডটা যেন ছিন্ন ভিন্ন হইয়া যাইতে লাগিল।

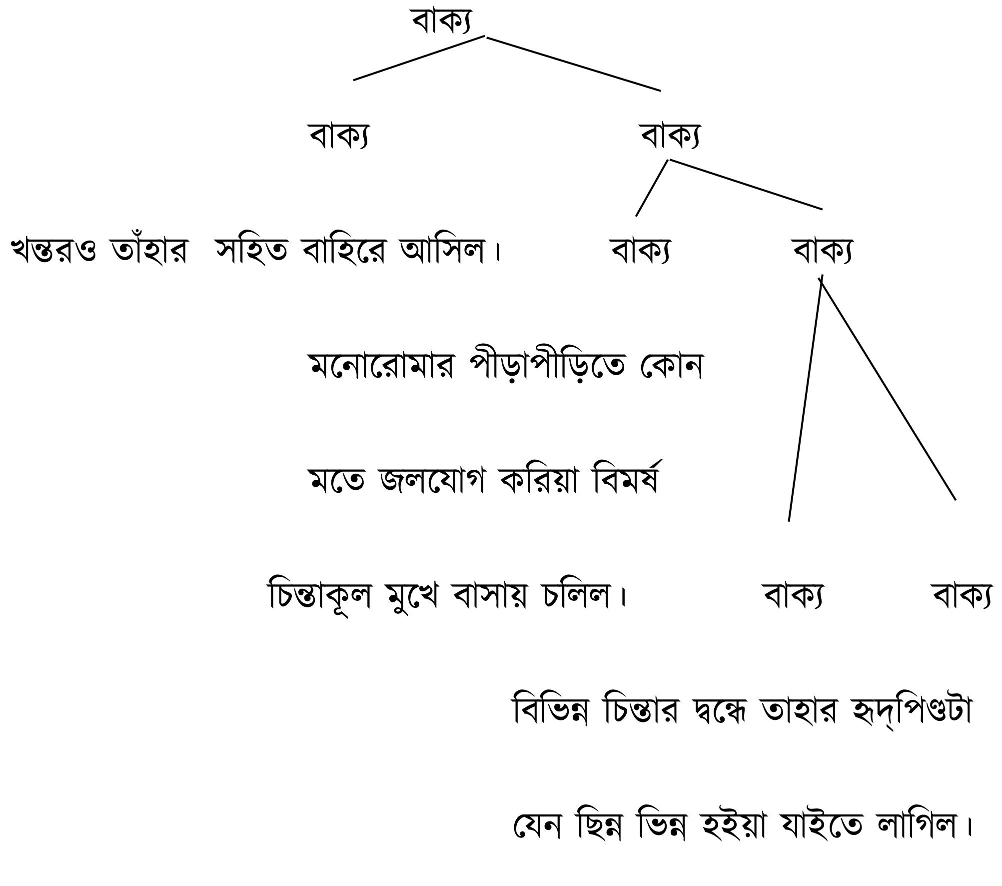

৬. “ইহাকে আনন্দ দিতে হইবে, আশা দিতে হইবে,- ইহাকে নতুন করিয়া গার্হস্থ্য-জীবনের কর্ত্তব্য পালন করিতে হইবে !” ১২৩

চালক ও চল দ্বারা আবদ্ধ হওয়ার পরবর্তী রূপ-

[a] চালক→ ইহাকে [a]→ চল → [b] আনন্দ দিতে হইবে

→ [c] আশা দিতে হইবে

→ [d] নতুন করিয়া গার্হস্থ্য জীবনের কর্ত্তব্য পালন করিতে হইবে।

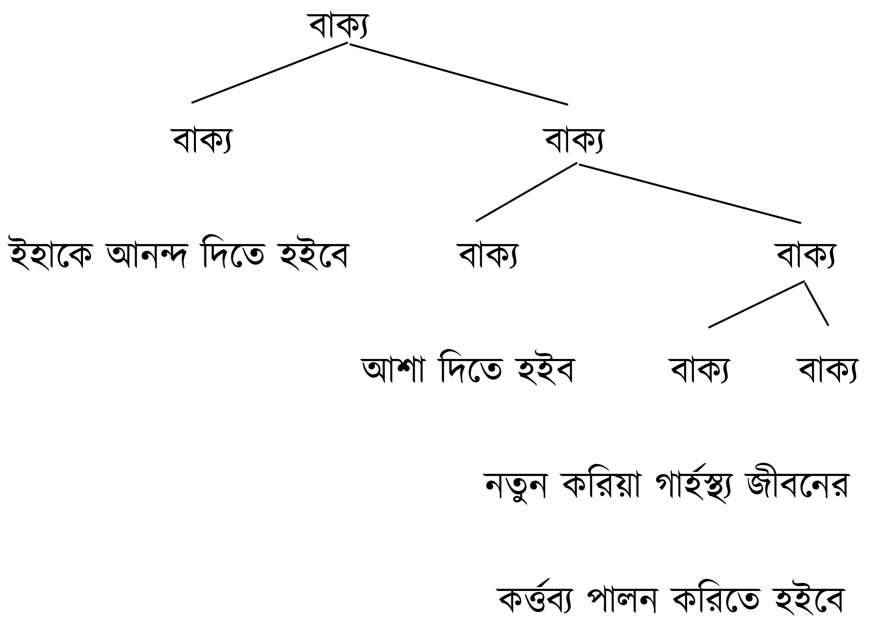

৮. হৃদপিণ্ড বিদ্রোহভরে দ্রুত স্পন্দিত হইয়া উঠিল ! মন বিস্বাদ-তিক্ত হইয়া উঠিতেছিল ! —খন্তর সভয়ে তাড়াতাড়ি আত্মদমন করিল। ” ১২৪

[a] চালক→ খন্তরের [a]→ চল → [b] হৃদপিণ্ড বিদ্রোহভরে দ্রুত স্পন্দিত হইয়া উঠিল।

→ [c] মন বিস্বাদ-তিক্ত হইয়া উঠিতেছিল।

→ [d] সভয়ে তাড়াতাড়ি আত্মদমন করিল।

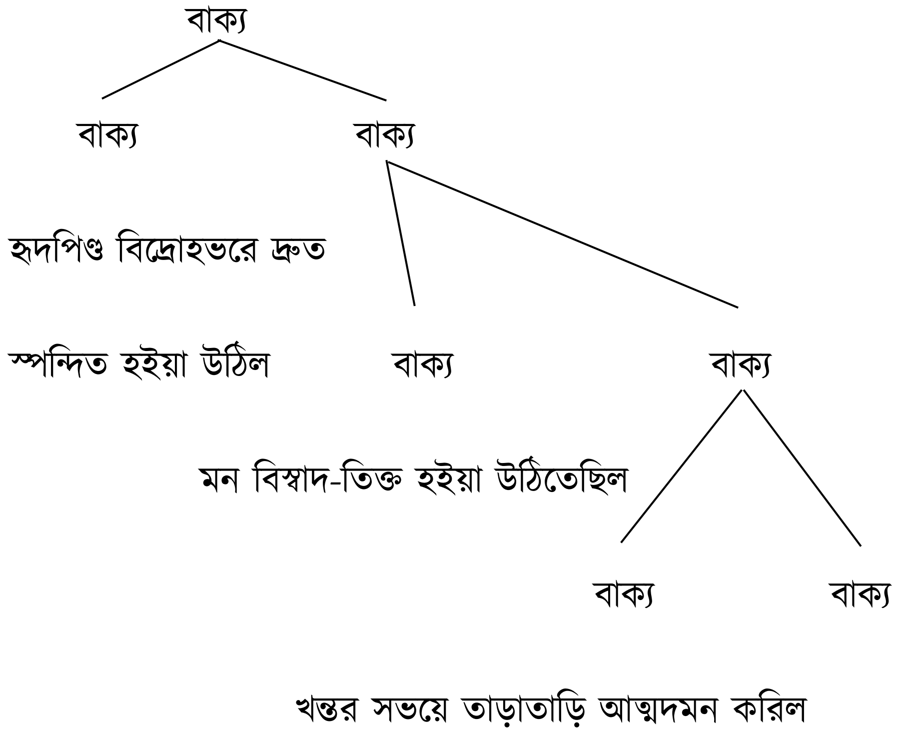

৮. “নিজের মানসিক উচ্ছৃঙ্খলতায় নিরতিশয় বিরক্তি বোধ হইল। অন্ধকার থাকিতেই শয্যা ত্যাগ করিল। বাহিরে আসিয়া ভোরের ঠাণ্ডা বাতাসে খানিক পায়চারি করিয়া ভগবানের নাম করিল। নিজের চাকরির কথা ভাবিল, দৈনিক রন্ধন ভোজন হাটবাজারের কথা ভাবিল।” ১২৫

[a] চালক→নিজের[a]→ চল→[b]মানসিক উচ্ছৃঙ্খলতায় নিরতিশয় বিরক্তি বোধ হইল।

→ [c] অন্ধকার থাকিতেই শয্যা ত্যাগ করিল।

→ [d] বাহিরে আসিয়া ভোরের ঠাণ্ডা বাতাসে খানিক

। পায়চারি করিয়া ভগবানের নাম করিল।

→ [e] নিজের চাকরির কথা ভাবিল।

→ [f] দৈনিক রন্ধন ভোজন হাটবাজারের কথা ভাবিল।

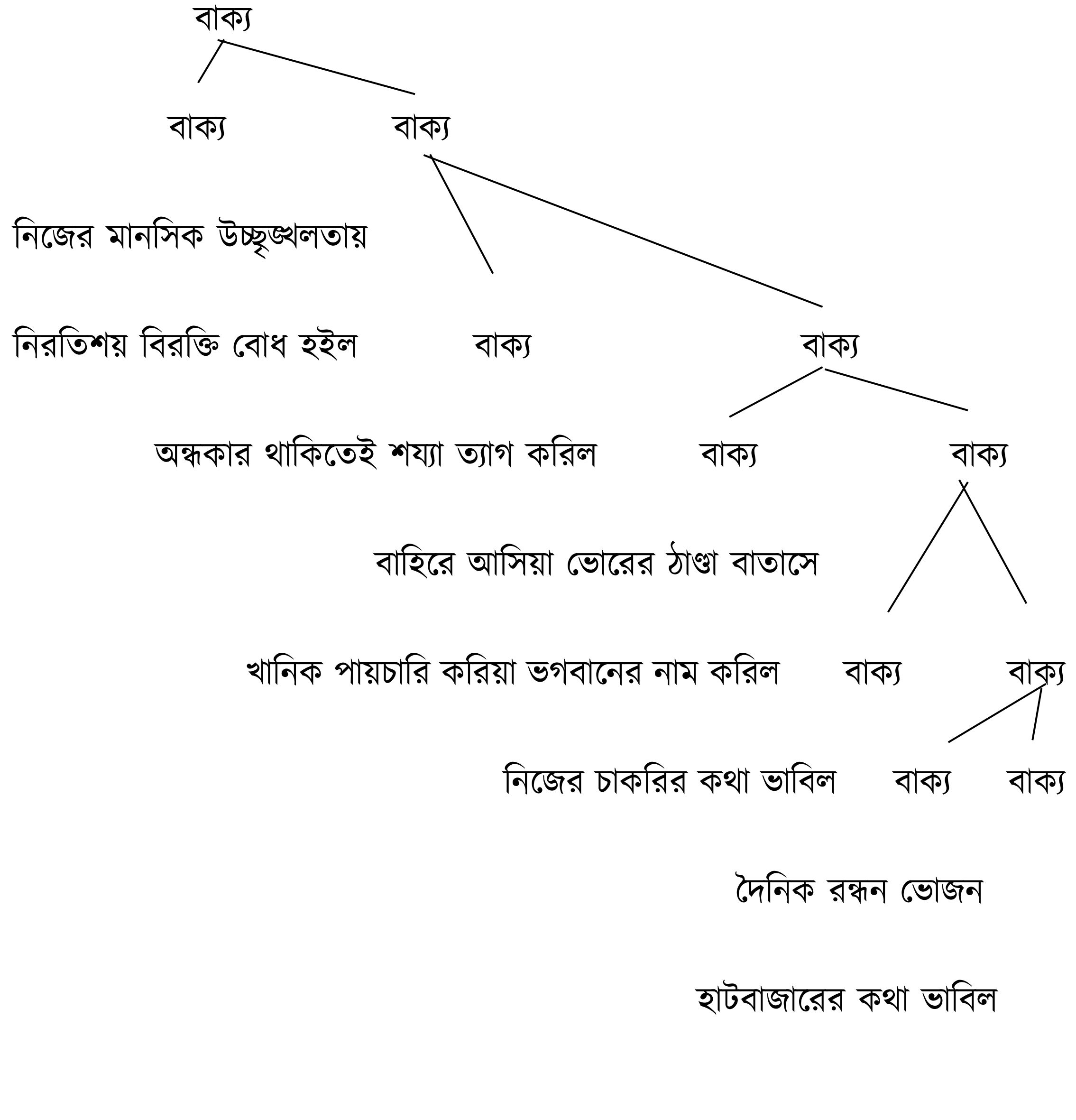

৯. “এই তুচ্ছ ব্যাপারটাকে একান্ত তুচ্ছ ভাবিয়া তাড়াতাড়ি মন হইতে বিদায় দিতে চাহিল। কিন্তু ক্ষণে ক্ষণে সব গোলমাল হইয়া যাইতে লাগিল। মন উদ্‌দাম গতিতে দিগ্বিদিকে ছুটিয়া চলিল।” ১২৬

[a] চালক→ মন [a]→]চল→ [b]এই তুচ্ছ ব্যাপারটাকে একান্ত তুচ্ছ ভাবিয়া তাড়াতাড়ি মন হইতে বিদায় দিতে চাহিল।

→ [c] কিন্তু ক্ষণে ক্ষণে সব গোলমাল হইয়া যাইতে লাগিল।

→ [d] মন উদ্‌দাম গতিতে দিগ্বিদিকে ছুটিয়া চলিল।

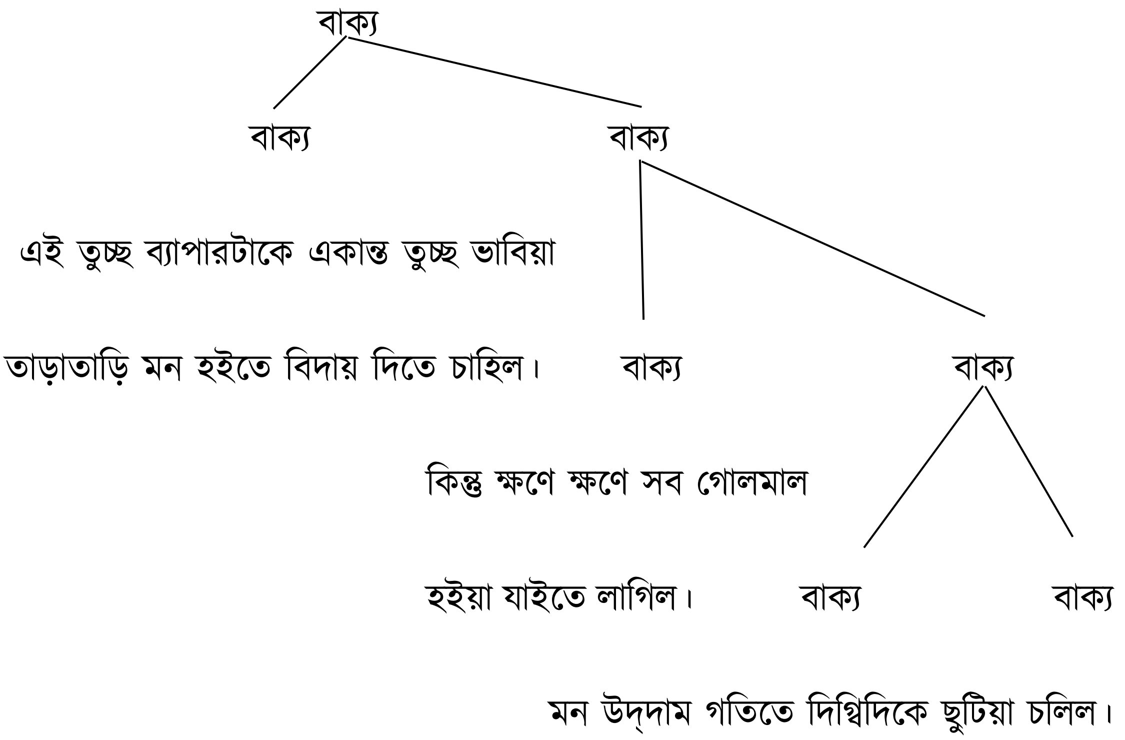

১০. “গভীর দীর্ঘশ্বাস ছাড়িয়া খন্তর ঘরে ঢুকিল। চাকরির স্থানে যাইবার জামা কাপড় ঠিক করিয়া রাখিল। তারপর একটা নিমকাঠি দাঁতে চাপিয়া ঘরের চাবি বন্ধ করিয়া বাহির হইল।” ১২৭

এই সমান্তরাল গঠনটিতে —

[a] চালক → খন্তর [a] → চল→ [b] গভীর দীর্ঘশ্বাস ছাড়িয়া খন্তর ঘরে ঢুকিল।

→ [c] চাকরির স্থানে যাইবার জামা কাপড় ঠিক করিয়া রাখিল।

→ [d] তারপর একটা নিমকাঠি দাঁতে চাপিয়া ঘরের চাবি বন্ধ করিয়া বাহির হইল।

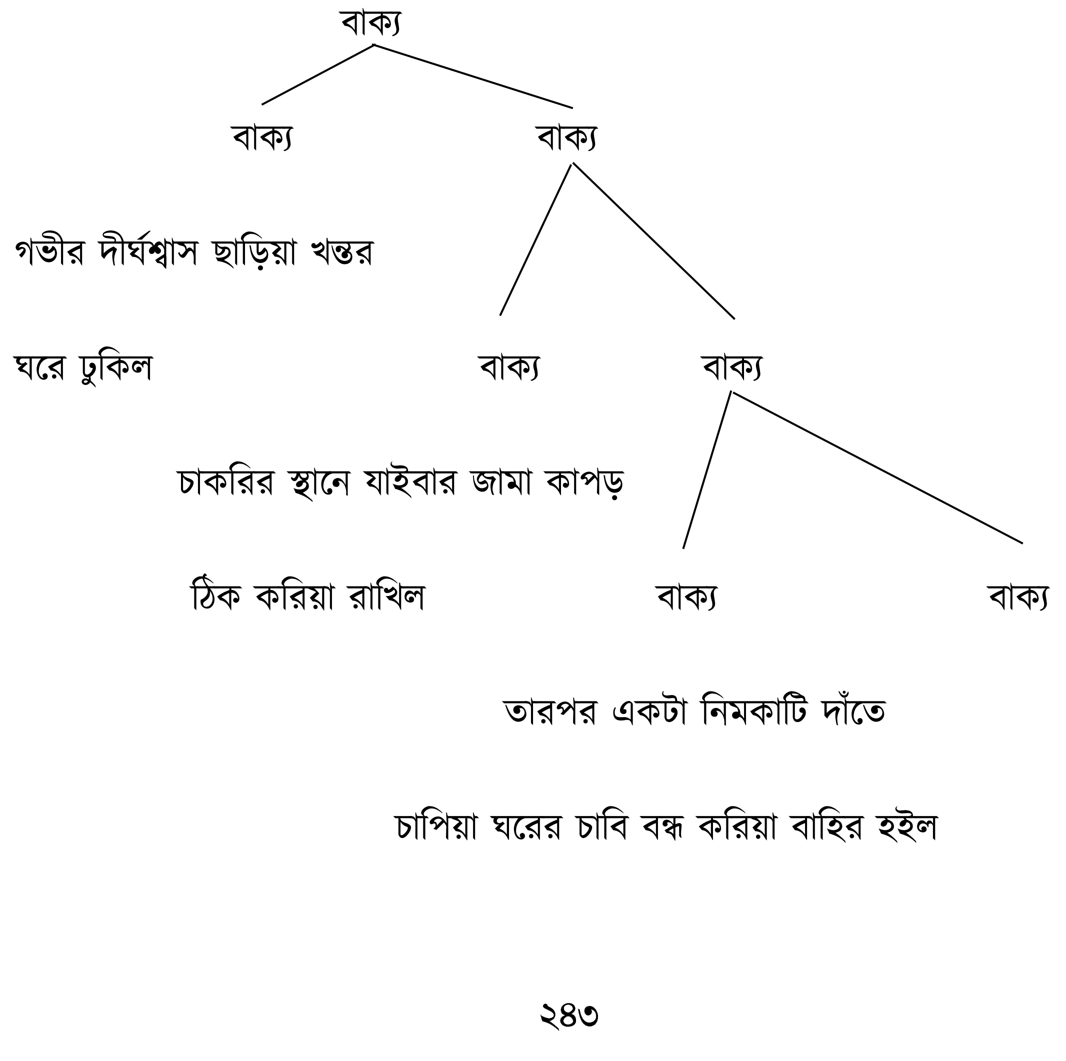

১১. “ধরণীর বুকে প্রচণ্ড শব্দে গাছপালা ভাঙিয়া মচকাইয়া, ধূলাবালি উড়াইয়া প্রমত্ত হুংকারে ঘূর্ণিঝড় বহিতে ছিল ।” ১২৮

উপরের সমান্তরাল বাকাংশে চালক ও জল দ্বারা আবদ্ধ করা হলো নিম্নোক্ত ভাবে –

[a] চালক→ ধরনীর বুকে [a]→ চল→ [b] প্রচণ্ড শব্দে গাছপালা ভাঙিয়া

→ [c] মচকাইয়া

→ [d] ধূলাবালি উড়াইয়া → ঘূর্ণিঝড় বহিতেছিল

→ [e] প্রমত্ত হুঙ্কারে

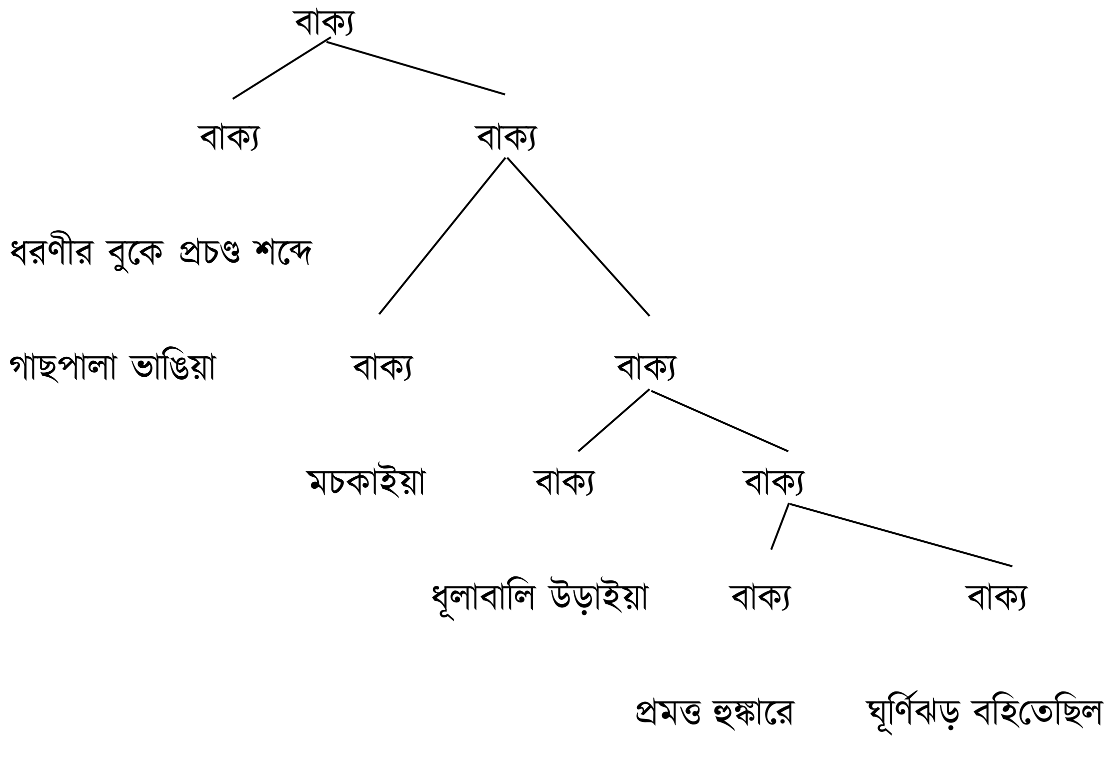

১২. “শুক্লানবমীর সন্ধ্যায় জ্যোৎস্নার নবযৌবনে তরুণ লাবণ্য যেন উছলিয়া উছলিয়া ধরাবক্ষ ভাসাইয়া হাসাইয়া প্রমত্ত করিয়া তুলিতেছে।” ১২৯

এখানে গঠনটি হল-

[a] চালক→ জ্যোৎস্নার নবযৌবন [a]→ চল → [b]শুক্লানবমীর সন্ধ্যায় উছলিয়া উছলিয়া

→ [c] ধরাবক্ষ ভাসাইয়া হাসাইয়া →প্রমত্ত করিয়া

তুলিতেছে

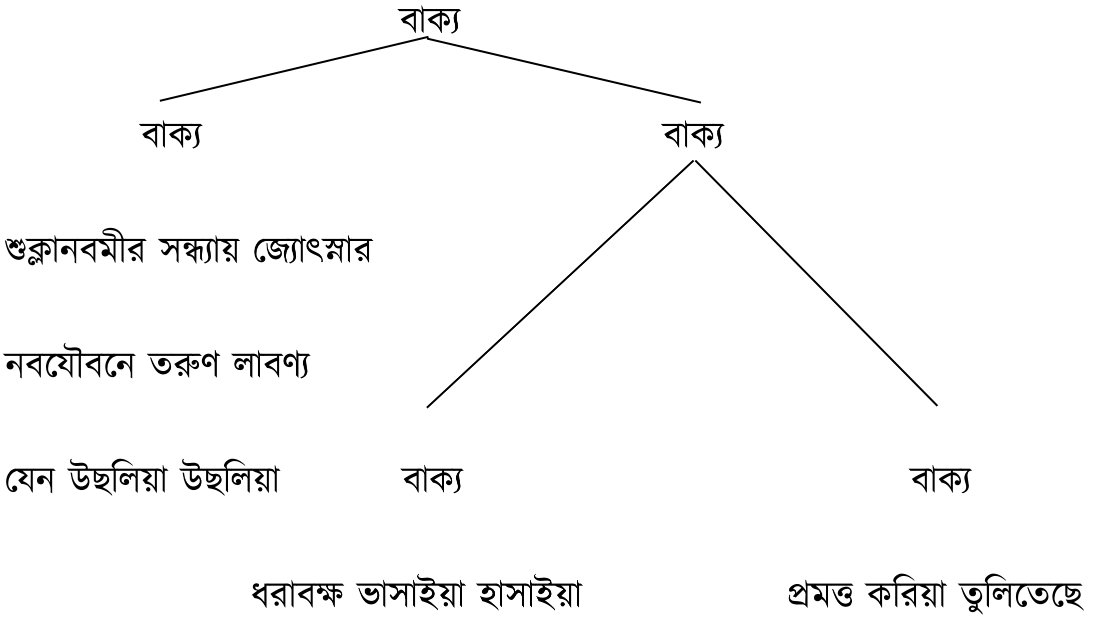

এখানে প্যাটার্নটা যদি একটু স্তম্ভে ভেঙে দেখি সেখানে উপাদানের ধরনটা নিম্নরূপ –

ক	খ	গ	ঘ
শুক্লানবমীর সন্ধ্যায়	জ্যোৎস্নার নবযৌবনে তরুণ লাবণ্য	উছলিয়া উছলিয়া ধরাবক্ষ ভাসাইয়া হাসাইয়া	প্রমত্ত করিয়া তুলিতেছে

১৩. "আমার জপ নাই, আহ্নিক নাই, মালা নাই, স্তব নাই, স্তোত্র নাই, -রাতদিন শ্যামলের ঝগড়ায় আমার কান ঝালাপালা !" ১৩০

এই সমান্তরাল বাক্যকে চালক ও চল দ্বারা আবদ্ধ করলে প্যাটার্নটা দাঁড়ায় নিম্নরূপ —

[a] চালক → আমার [a] → চল → [b] জপ নাই

→ [c] আহ্নিক নাই

→ [d] স্তব নাই →রাতদিন শ্যামলের

→ [e] স্তোত্র নাই ঝগড়ায় আমার কান ঝালাপালা

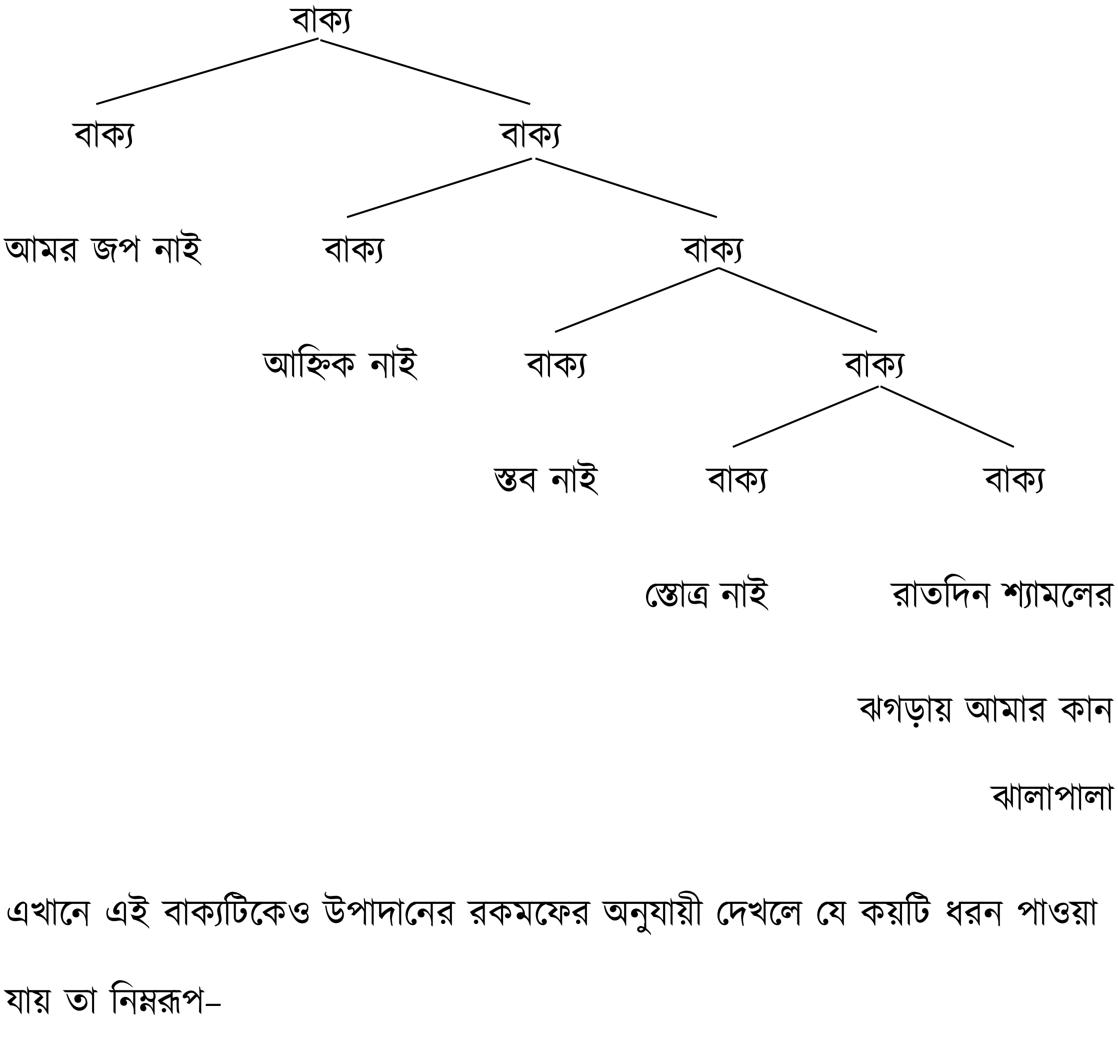

এখানে এই বাক্যটিকেও উপাদানের রকমফের অনুযায়ী দেখলে যে কয়টি ধরন পাওয়া যায় তা নিম্নরূপ–

ক	খ	গ
আমার	জপ নাই	রাতদিন শ্যামলের ঝগড়ায়
	আহ্নিক নাই	আমার কান ঝালাপালা
	স্তব নাই	
	স্তোত্র নাই	

১৪. "সোফিয়া পিঠের উপর চুল এলাইয়া দিয়া ছেলে কোলে করিয়া হাঁপাইতে হাঁপাইতে সিঁড়ি ভাঙ্গিয়া উপরে দর্শন দিল।" ১৩১

সমান্তরাল এই বাক্যটিকে চালক ও চল দ্বারা আবদ্ধ করে যে প্যাটার্ন দেখা যায় তা হল—

[a] চালক→ সোফিয়া [a] → চল → [b] পিঠের উপর চুল এলাইয়া দিয়া

→ [c] ছেলে কোলে করিয়া

→ [d] হাঁপাইতে হাঁপাইতে →উপরে দর্শন

→ [e] সিঁড়ি ভাঙ্গিয়া দিল

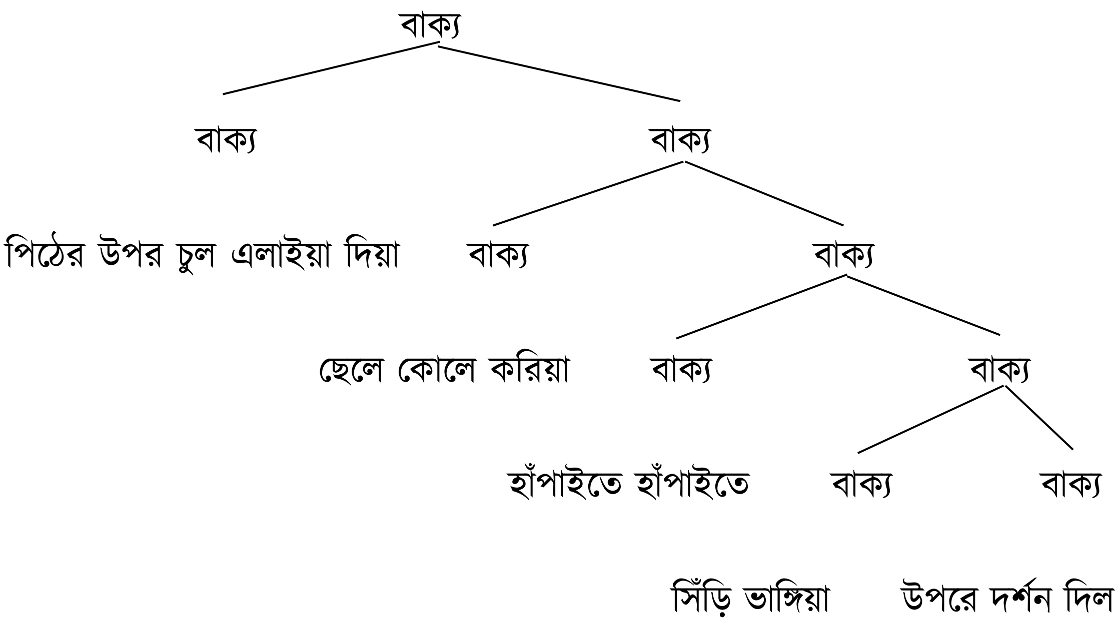

গঠনটিকে স্তম্ভে সাজালে যে ধরনের বিন্যাস হবে তা হল–

ক	খ	গ
সোফিয়া	পিঠের উপর চুল এলাইয়া	উপরে দর্শন দিল
	ছেলে কোলে করিয়া	
	হাঁপাইতে হাঁপাইতে	
	সিঁড়ি ভাঙ্গিয়া	

স্তম্ভে সাজিয়ে বাক্যের উপাদানের তিনটি প্রকার পাওয়া গেল।

১৫. "দিন নেই, রাত নেই, সকাল নাই সন্ধ্যা নাই খালি – বিয়ে, বিয়ে, বিয়ে !" ১৩২

চালক ও চল দ্বারা আবদ্ধ হয়ে যে রূপটি পায় তা হল –

[a] চালক→ নেই [a]→ চল → [b] দিন

→ [c] রাত →খালি- বিয়ে, বিয়ে,বিয়ে !

→ [d] সকাল

→ [e] সন্ধ্যা

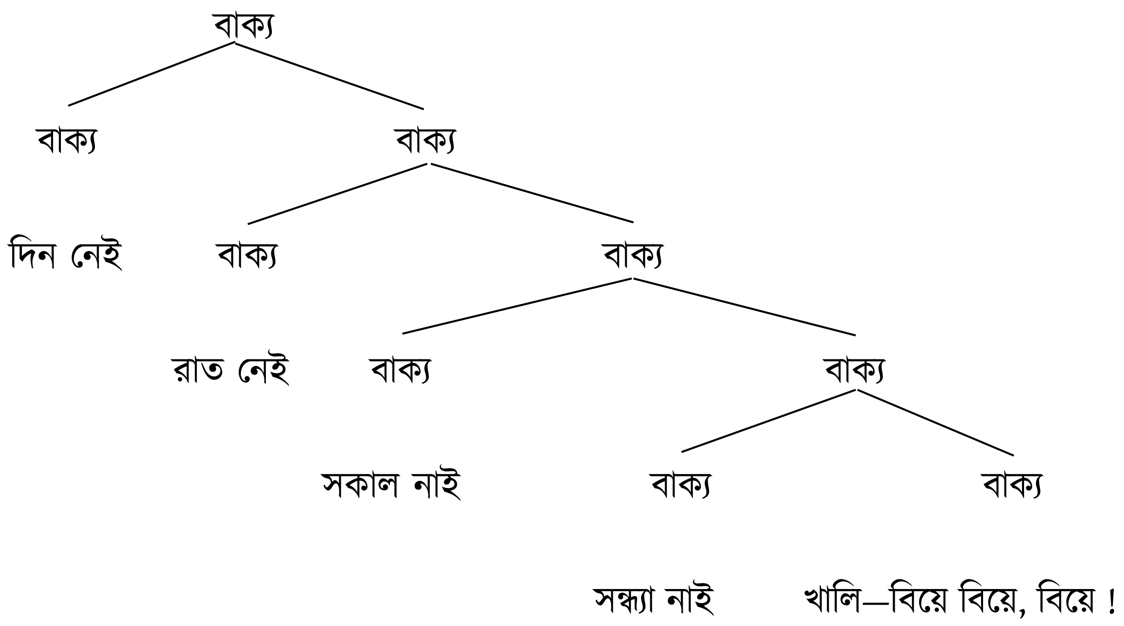

এই সমান্তরাল গঠনটিকে স্তম্ভে সাজালে উপাদান কয় ধরনের তা বোঝ যায়। যেমন–

ক	খ
দিন নেই	খালি — বিয়ে , বিয়ে, বিয়ে !
রাত নেই	
সকাল নাই	
সন্ধ্যা নাই	

তথ্যসূত্র

১। শৈলবালা ঘোষজায়া সেরা পাঁচটি উপন্যাস, বৈশাখ ১৪২৬, কলকাতা, মিত্র ও ঘোষ, পৃষ্ঠা- ২০৬

২। শৈলবালা ঘোষজায়ার গল্প সংকলন, ২০০০, কলকাতা, দেজ, পৃষ্ঠা- ৮৩

৩। শৈলবালা ঘোষজায়া, ইমানদার, ভাদ্র ১৩২৬, ভারতবর্ষ, পৃষ্ঠা- ৩০৩

৪। শৈলবালা ঘোষজায়া সেরা পাঁচটি উপন্যাস, বৈশাখ ১৪২৬, কলকাতা, মিত্র ও ঘোষ, পৃষ্ঠা- ২৭

৫। ঐ, পৃষ্ঠা- ২৭

৬। ঐ

৭। ঐ

৮। শৈলবালা ঘোষজায়ার গল্প সংকলন, ২০০০, কলকাতা, দেজ, পৃষ্ঠা- ১৬৯

৯। শ্রী শৈলবালা ঘোষজায়া, করুণা দেবীর আশ্রম, কলিকাতা, গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এন্ড সন্স্, পৃষ্ঠা- ১১৬

১০। শৈলবালা ঘোষজায়া সেরা পাঁচটি উপন্যাস, বৈশাখ ১৪২৬, কলকাতা, মিত্র ও ঘোষ, পৃষ্ঠা- ৩৮৭

১১। ঐ

১২। শৈলবালা ঘোষজায়া, ইমানদার, কার্ত্তিক ১৩২৬, ভারতবর্ষ, পৃষ্ঠা- ৬৩২

১৩। শ্রী শৈলবালা ঘোষজায়া, রঙীন ফানুস, কলিকাতা, গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এন্ড সন্স্, পৃষ্ঠা-৫৬

১৪। ঐ, পৃষ্ঠা- ৫৭

১৫। শৈলবালা ঘোষজায়ার গল্প সংকলন, ২০০০, কলকাতা, দেজ, পৃষ্ঠা- ১৩

১৬। ঐ, পৃষ্ঠা-১৭

১৭। ঐ, পৃষ্ঠা- ২১৬

১৮। ঐ, পৃষ্ঠা- ১৭

১৯। ঐ

২০। শ্রী শৈলবালা ঘোষজায়া, রঙীন ফানুস, কলিকাতা, গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এন্ড সন্স্, পৃষ্ঠা- ৪৪

২১। শৈলবালা ঘোষজায়ার গল্প সংকলন, ২০০০, কলকাতা, দেজ, পৃষ্ঠা- ২২৫

২২। ঐ

২৩। ঐ, পৃষ্ঠা- ২২৬

২৪। ঐ

২৫। ঐ, পৃষ্ঠা- ২২৭

২৬। ঐ, পৃষ্ঠা- ২৩০

২৭। ঐ, পৃষ্ঠা- ১১

২৮। শৈলবালা ঘোষজায়া সেরা পাঁচটি উপন্যাস, বৈশাখ ১৪২৬, কলকাতা, মিত্র ও ঘোষ, পৃষ্ঠা- ৩৩২

২৯। শ্রী শৈলবালা ঘোষজায়া, করুণা দেবীর আশ্রম, কলিকাতা, গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এন্ড সন্স্,

পৃষ্ঠা-৩০

৩০। ঐ, পৃষ্ঠা- ৩২

৩১। ঐ, পৃষ্ঠা- ৩৫

৩২। শৈলবালা ঘোষজায়ার গল্প সংকলন, ২০০০, কলকাতা, দেজ, পৃষ্ঠা- ১৩

৩৩। ঐ, পৃষ্ঠা- ১৪

৩৪। ঐ, পৃষ্ঠা- ১৫

৩৫। ঐ, পৃষ্ঠা- ৯৭

৩৬। ঐ, পৃষ্ঠা- ১০৭

৩৭। ঐ

৩৮। ঐ

৩৯। ঐ

৪০। শ্রী শৈলবালা ঘোষজায়া, অবাক, ফাল্গুন ১৩৩১ বঙ্গাব্দ, কলিকাতা, গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এন্ড সন্স্, পৃষ্ঠা- ৩

৪১। ঐ

৪২। ঐ, পৃষ্ঠা- ৫

৪৩। শ্রী শৈলবালা ঘোষজায়া, রঙীন ফানুস, কলিকাতা, গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এন্ড সন্স্, পৃষ্ঠা- ২

৪৪। ঐ

৪৫। ঐ, পৃষ্ঠা- ৬

৪৬। ঐ, পৃষ্ঠা- ১১

৪৭। ঐ

৪৮। শৈলবালা ঘোষজায়ার গল্প সংকলন, ২০০০, কলকাতা, দেজ, পৃষ্ঠা- ২১৯

৪৯। ঐ

৫০। শ্রী শৈলবালা ঘোষজায়া, করুণা দেবীর আশ্রম, কলিকাতা, গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এন্ড সন্স্, পৃষ্ঠা- ৯৫

৫১। ঐ

৫২। ঐ

৫৩। ঐ

৫৪। ঐ, পৃষ্ঠা- ৯৬

৫৫। ঐ

৫৬। ঐ

৫৭। ঐ

৫৮। ঐ

৫৯। ঐ

৬০। ঐ

৬১। ঐ

৬২। ঐ

৬৩। ঐ

৬৪। ঐ, পৃষ্ঠা- ৯৭

৬৫। ঐ

৬৬। ঐ, পৃষ্ঠা- ১০২

৬৭। শ্রী শৈলবালা ঘোষজায়া, অবাক, ফাল্গুন ১৩৩১ বঙ্গাব্দ, কলিকাতা, গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এন্ড সন্স্, পৃষ্ঠা- ৮

৬৮। ঐ

৬৯। ঐ

৭০। ঐ

৭১। ঐ, পৃষ্ঠা- ৯

৭২। ঐ

৭৩। ঐ

৭৪। ঐ

৭৫। ঐ

৭৬। ঐ

৭৭। ঐ

৭৮। ঐ

৭৯। ঐ, পৃষ্ঠা- ১০

৮০। শৈলবালা ঘোষজায়ার গল্প সংকলন, ২০০০, কলকাতা, দেজ, পৃষ্ঠা- ১৩২

৮১। ঐ

৮২। ঐ

৮৩। ঐ

৮৪। ঐ

৮৫। ঐ, পৃষ্ঠা- ১৩২-১৩৩

৮৬। ঐ, পৃষ্ঠা- ১৩৩

৮৭। ঐ

৮৮। ঐ

৮৯। ঐ

৯০। শৈলবালা ঘোষজায়ার গল্প সংকলন, ২০০০, কলকাতা, দেজ, পৃষ্ঠা- ১৯৮

৯১। ঐ, পৃষ্ঠা- ১৩১

৯২। ঐ, পৃষ্ঠা- ২১৩

৯৩। ঐ

৯৪। ঐ, পৃষ্ঠা- ১৩৩

৯৫। ঐ, পৃষ্ঠা- ১৯৮

৯৬। ঐ, পৃষ্ঠা- ২৮

৯৭। ঐ, পৃষ্ঠা- ১৪

৯৮। ঐ, পৃষ্ঠা- ১২৩

৯৯। ঐ, পৃষ্ঠা- ৪৬

১০০। ঐ, পৃষ্ঠা- ৪৯

১০১। ঐ, পৃষ্ঠা- ২২৩

১০২। ঐ, পৃষ্ঠা- ২২৪

১০৩। ঐ

১০৪। শৈলবালা ঘোষজায়া সেরা পাঁচটি উপন্যাস, বৈশাখ ১৪২৬, কলকাতা, মিত্র ও ঘোষ, পৃষ্ঠা-২৬২

১০৫। ঐ

১০৬। শৈলবালা ঘোষজায়ার গল্প সংকলন, ২০০০, কলকাতা, দেজ, পৃষ্ঠা- ২৮

১০৭। ঐ

১০৮। ঐ, পৃষ্ঠা- ২০৬

১০৯। ঐ

১১০। ঐ, পৃষ্ঠা- ২১৫

১১১। ঐ, পৃষ্ঠা- ১৮০

১১২। ঐ, পৃষ্ঠা- ৯৩

১১৩। শ্রী শৈলবালা ঘোষজায়া, রঙীন ফানুস, কলিকাতা, গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এন্ড সন্স্, পৃষ্ঠা- ১০৪

১১৪। শ্রী শৈলবালা ঘোষজায়া, অকাল কুষ্মাণ্ডের কীর্ত্তি, চৈত্র ১৩২৯, কলিকাতা, গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এন্ড সন্স্, পৃষ্ঠা- ২৯

১১৫। ঐ, পৃষ্ঠা- ৩১

১১৬। শ্রী শৈলবালা ঘোষজায়া, রঙীন ফানুস, কলিকাতা, গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এন্ড সন্স্, পৃষ্ঠা- ২৩৪

১১৭। শৈলবালা ঘোষজায়া সেরা পাঁচটি উপন্যাস, বৈশাখ ১৪২৬, কলকাতা, মিত্র ও ঘোষ, পৃষ্ঠা- ৪০৫

১১৮। শ্রী শৈলবালা ঘোষজায়া, রঙীন ফানুস, কলিকাতা, গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এন্ড সন্স্, পৃষ্ঠা- ১২৬

১১৯। ঐ

১২০। ঐ, পৃষ্ঠা- ১২৯

১২১। ঐ, পৃষ্ঠা- ১৩১

১২২। ঐ, পৃষ্ঠা- ১২৪

১২৩। ঐ, পৃষ্ঠা- ১৬১-১৬২

১২৪। ঐ, পৃষ্ঠা- ১৬১

১২৫। ঐ, পৃষ্ঠা- ১০৩

১২৬। ঐ

১২৭। ঐ, পৃষ্ঠা- ১০৪

১২৮। ঐ, পৃষ্ঠা- ১৪২

১২৯। শৈলবালা ঘোষজায়া সেরা পাঁচটি উপন্যাস, বৈশাখ ১৪২৬, কলকাতা, মিত্র ও ঘোষ, পৃষ্ঠা- ৮৮

১৩০। শৈলবালা ঘোষজায়া, ইমানদার, কার্ত্তিক ১৩২৬, ভারতবর্ষ, পৃষ্ঠা- ৩০৩

১৩১। শ্রী শৈলবালা ঘোষজায়া, অবাক, ফাল্গুন ১৩৩১ বঙ্গাব্দ, কলিকাতা, গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এন্ড সন্স্, পৃষ্ঠা- ১৭

১৩২। ঐ, পৃষ্ঠা- ২২

চতুর্থ অধ্যায়

সমকালীন মেয়েদের লেখালেখির জগৎ ও শৈলবালা ঘোষজায়া

অন্তঃপুরের কড়া পর্দার আড়ালে কাটানো জীবনকে পিছনে ফেলে উনিশ শতকীয় নবজাগরণের আলোয় নারী যখন আলোকিত তখনই জগৎ ও জীবনকে বুঝে নেওয়ার তাগিদেই নারীর মনে জাগল শিক্ষার প্রতি আগ্রহ। তাইতো উনিশ শতকের গোড়ার দিকে খ্রিস্টান মিশনারীদের উদ্যোগে কলকাতা ও তার পার্শ্ববর্তী এলাকায় মেয়েদের শিক্ষা বিস্তারের কথা মাথায় রেখে বেশ কয়েকটি বালিকা বিদ্যালয় স্থাপিত হয়েছিল। সে সময় প্রতি ঘরে যে এই শিক্ষার আলো পৌঁছেছিল তা একেবারেই নয়। অক্ষরজ্ঞানের সঙ্গে স্বচ্ছলতার বিষয়টাও ছিল অঙ্গাঙ্গীভাবে ভাবে জড়িত। এছাড়াও মেয়েদের লেখাপড়া নিয়ে রক্ষণশীল সমাজের মনোভাব ছিল কঠোর তাইতো সেদিন ঈশ্বর গুপ্ত যখন লেখেন --

"যত ছুঁড়িগুলো তুড়ি মেরে কেতাব হাতে নিচ্ছে যবে

তখন এ বি শিখে বিবি সেজে বিলাতি বোল কবেই কবে।" ১

তখনই এই সমস্ত লাইন জুড়ে শোনা যায় ব্যাঙ্গের স্বর তবে যাই হোক সেদিন যে সমস্ত মেয়েরা এ সমস্ত বিদ্রূপ উপেক্ষা করে পুরুষের চোখে দেখা নারীর জীবনকে বাদ দিয়ে নিজেদের কলমে নিজেদের জীবনকে বর্ণের দ্বারা বর্ণময় করতে এগিয়ে এসেছিলেন তারা চিরস্মরণীয় হয়ে আছেন ও চিরকাল থাকবেন। তাদের কলমের প্রতিটা বিন্দু অমরত্ব লাভ করেছে সাহিত্যের পাতায়। এইভাবে এই প্রতিকূল সময়েও যারা লেখার মাধ্যমে আত্মপ্রকাশ করেছেন সেই রকম কয়েকজন বিদুষী নারীর কিছু কথা এখন আমরা আলোচনার মাধ্যমে স্মরণ করার চেষ্টা করব। উনিশ শতকের হাত ধরে মেয়েদের লেখালিখির যে সূচনা বিশশতকে তার ব্যাপ্তি ঘটলেও এই সময়টা সম্পর্কে আমরা সংক্ষেপে জেনে নেওয়ার চেষ্টা করব।

এক্ষেত্রে আমরা প্রথমেই সমাজের দিকে তাকালে দেখতে পাব ইংরেজ রাজত্ব স্থাপনের ফলে শুধু প্রশাসনিক ক্ষেত্রে নয়, ব্যাপক পরিবর্তন এসেছিল অর্থনৈতিক ও সামাজিক ক্ষেত্রেও। ফলে সামাজিক ক্ষেত্রে শহরে সুযোগ সুবিধা থাকার কারণে শহরের দিকে চলে যাবার আগ্রহ দেখা দিয়েছিল মানুষের মধ্যে, সৃষ্টি হয়েছিল শিক্ষিত বাঙালি মধ্যবিত্ত শ্রেণী। আর পিছিয়ে পড়তে থাকে বিপুল সংখ্যক মুসলিম ও নিম্নবর্ণের হিন্দুরা। এরা তাদের পুরানো কুলগত বৃত্তি নিয়েই পড়ে থাকল। মুসলমান ও নিম্নবর্ণের হিন্দুদের মধ্যে মহিলারা যে লেখাপড়ার দিকে এগিয়ে এলেন, তারও প্রধান কারণ এটাই। তবে ঊনবিংশ শতাব্দীর শুরুতে নারীদের সামাজিক মর্যাদা যে উন্নত ছিল না, এ বিষয়ে একটা ধারণা সবারই আছে। এছাড়া মেয়েদের এই অবস্থার পরিচয় আমরা রামমোহনের লেখা-র একটা উক্তি থেকে পাই সেটি হল—

> "বিবাহের সময়ে স্ত্রীকে অর্ধাঙ্গ করিয়া স্বীকার করেন, কিন্তু
> ব্যবহারের সময় পশু হইতে নীচ জানিয়ে ব্যবহার করে।" [২]

তবে যাই হোক এই সময় পরিস্থিতির শিকার হয়েও যে কয়েকজন নারী নিজস্ব কাজের মধ্য দিয়ে সরবে বা নীরবে সমাজকে প্রতিবাদ জানিয়ে গেছেন বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে আমরা তাঁদেরই কথা এখন আলোচনা করব।

এ প্রসঙ্গে প্রথমেই আসে রাসসুন্দরী দেবীর কথা। তাঁর জন্ম – ১৮১০ খ্রিষ্টাব্দে। রামমোহন যখন মেয়েদের দুরাবস্থার কথা লিখেছেন তিনি ঠিক সেই সময়েরই একজন। সমাজে ও পরিবারে সেকালের বাঙালি মহিলাদের অবস্থা কেমন ছিল, তার পরিচয় তাঁর রচনায় পাওয়া যায়। (আমরা তাঁর রচনাগুলি আলোচনার মধ্য দিয়ে সেগুলি জানতে পারব)। রাসসুন্দরী দেবী যে পরিবেশে বড় হয়ে ওঠেন সেই পরিবেশ ছিল প্রতিকূল।

তিনি পাবনার পোতাজিয়া নামক এক অজ গ্রামে জন্ম নেন। পিতার নাম পদ্মলোচন রায়। পিতা মারা যাওয়ার পর খুড়োর অভিভাবকত্বে বেড়ে ওঠেন তিনি। সমাজ ও লোকাচার তাঁর বিকাশের পথে বাধা হয়ে দাঁড়ায়। তখন মেয়েদের লেখাপড়া শেখার কোনো চল ছিল না। তাঁর নিজের জীবনের অভিজ্ঞতা থেকেই এর প্রমাণ পাওয়া যায়। তিনি দেখেছিলেন এক মিশনারী মহিলার পাঠশালায় ছেলেরা পড়তে যেত কিন্তু কেবল মেয়ে বলে তাঁর সে অধিকার ছিল না। স্ত্রী শিক্ষার বিরুদ্ধে তখন ছিল নানা যুক্তি। লেখাপড়া শিখলে মেয়েরা বিধবা হয়, সংসারে অকল্যাণ হয়, আর তারা যেহেতু আয় করবে না তাই তাদের লেখাপড়া করা অর্থহীন। উনিশ শতকের দ্বিতীয় ভাগেও স্ত্রী শিক্ষার প্রসার তেমন ঘটেনি। যদিও বিরুদ্ধতা কিছুটা কমেছিল সেজন্য রাসসুন্দরী বার বার নব্যকালের মেয়েদের সঙ্গে তুলনা করে নিজের ভাগ্যকে ধিক্কার দিয়েছেন, ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন, তবে সামাজিক বাধা ছাড়াও তাঁর মনের ভয় তাঁর শেখার আগ্রহকে দমিয়ে রাখে। তবে শাশুড়ি, ননদ, স্বামী পরিবৃত সংসারেও রাসসুন্দরী দেবী পড়াশোনার সুযোগ করে নিয়েছিলেন, লুকিয়ে চুরিয়ে অন্তঃপুরে থাকার দৌলতে।

বাপের বাড়িতে পাঠশালায় যা শিখেছিলেন সেই অস্ত্রে ধার দিয়েই তাঁর হাত থেকে বেরিয়ে এসেছিল বাংলা সাহিত্যের প্রথম আত্মজীবনী মূলক রচনা—'আমার জীবন'। এ এক অসাধ্য সাধনার ফল, যা আমরা তাঁর বিবরণ থেকে জানতে পারি। শৈশবে অভিভাবকরা বাড়ির পাঠশালায় মেম সাহেবের সামনে তাঁকে গিয়ে রেখে আসেন, যাতে তিনি সেখানে নিরুপদ্রবে সময় কাটাতে পারেন। এটাই ছিলো শৈশবে তার প্রতিদিনের রুটিন। তবে পাঠশালায় বসে থাকতেন তিনি কিন্তু অন্যরা কী বলছে, কী শিখছে তা তিনি লক্ষ করতেন। এইভাবেই প্রতিদিন নানা শব্দ ক্রমাগত কানে শুনতে শুনতেই তাঁর পড়তে শেখা। তবে ১০ বছর যখন বয়স হল তাঁর পর্দা প্রথা অনুযায়ী আর বাইরে যাওয়ার

অনুমতি মিলল না। এই সময় তাঁর বিয়ে হয়ে যায় সীতানাথ সরকারের সঙ্গে। বিয়ের সঙ্গে সঙ্গেই তাঁর সঙ্গিনীদের সাথে খেলাধূলার জীবন শেষ হয় এবং শুরু হয় শাশুড়ি ও ননদের কড়া নজর ঘেরা এক সংসার জীবন। এখান থেকে তখনকার সমাজে যে বাল্য বিবাহ প্রচলিত ছিল সেটা দেখতে পেলাম আমরা। আর রাসসুন্দরী দেবীর বিয়ে হয়ে যায় ১০ বছর বয়সেই। এত কম বয়সে বিয়ে হওয়ার জন্যই অপরিচিত সংসারে নিজের কাউকে না পেয়ে প্রথম দিকে তাঁর বাপের বাড়িটাকেই নিজের বাড়ি বলে মনে হত আর শ্বশুর বাড়িকে পরের বাড়ি।

এছাড়াও তিনি যে আধ্যাত্মিকতাকে মেনে চলতেন তার প্রমাণ পাই আরাধ্য দেবতা দয়ামাধবকে বিগ্রহ হিসাবে বিবেচনা করা দেখে। তিনি 'চৈতন্য ভাগবত' পড়েছিলেন নিজের চেষ্টায় কারও সাহায্য ছাড়াই। তবে এখানেও ছিল বহু প্রতিকূলতা। প্রথমত, পুঁথি হাতে নেওয়া নিন্দার বিষয়, তাই চৈতন্য ভাগবতের পুঁথি হাতে পেয়েও পড়ার আগ্রহ দমন করতে হয়েছিল এবং অনেক লুকোচুরি করে পড়তে হয়েছিল, পরে তাঁর সপ্তম পুত্র কিশোরী লালের জেদে তিনি লিখতেও শিখেছিলেন। দ্বিতীয়ত, পড়াশোনা করাটা পাপ এই ভাবনা ছিল। তাই লুকিয়ে পড়াশোনা করতে হত ভয়ে। একদিন তাঁর পড়াশোনার খবর তাঁর ননদ জানতে পারলেও ততটা বিপদ তাঁর হয়নি কারণ দেখা যাচ্ছে ননদই তাঁর ভাগবৎ পাঠের শ্রোতা হয়ে উঠেছিলেন। আর এই ভাগবৎ পাঠের শ্রোতা হয়ে ওঠা ননদই তাঁর মনে এগিয়ে চলার শক্তি বাড়িয়ে দিয়েছিলেন, যা তাঁর প্রতিভার বিকাশে সহায়ক হয়ে উঠেছিল। তবে যাই হোক পুত্রের উৎসাহে লেখাপড়া শিখে এবং নিজের মনের তাগিদ থেকে আমরা তাঁর হাত থেকে 'আমার জীবন' নামক আত্মজীবনী পাই। এটা লেখা শুরু করেন ১৮৭০ সাল থেকে। এমনকি বাংলা ভাষায় প্রথম পূর্ণাঙ্গ আত্মজীবনী রচয়িতার সম্মান অধিকার করে আছেন গ্রামের প্রায় অশিক্ষিতা একজন মহিলা এই

রাসসুন্দরী দেবীই। এ হল তাঁর এক অসাধ্য সাধনার ফল যা সকল মানুষকেই অভিভূত করে।

তবে 'আমার জীবন' নামক গ্রন্থ্ থেকে যা জানা যায় তা এখন আলোচনায় আমরা দেখতে পাব। ঊনবিংশ শতাব্দীর সমাজ চিত্র এই লেখায় নিজের অজ্ঞাতেই লিখে ফেলেছেন। তিনি ছিলেন অন্তঃপুরচারিকা। সংসারে কর্তব্যপরায়ন হলেও তার মধ্যে এক ধরনের নিরাসক্তি কাজ করত আর সম্ভবত এই কারণেই পরিবারের অন্য সদস্যদের কথা বেশি না বলে যেন তিনি কিছুটা আত্মকেন্দ্রিকতার পরিচয় দিয়েছেন। এছাড়াও এই রচনা থেকে মেয়েদের অবস্থা, সংসারে তাদের অবস্থা এবং স্বামী সম্পর্কে মনোভাব জানতে পারা যায়। তখনকার দিনে মেয়েদের বাপের বাড়িতে যাবার জন্য স্বামীর অনুমতি নিতে হত। এটা স্পষ্ট হয় যখন রাসসুন্দরী দেবীর মা মারা যান অথচ তাঁকে দেখতে যাবার জন্য অনুমতি মেলে না সেখান থেকে। অর্থাৎ স্ত্রী সংজ্ঞায় রাসসুন্দরী দেবীর বক্তব্য—

> "স্ত্রী ঘরের কাজ করবেন, সন্তান জন্ম দেবেন, তাদের লালন করবেন এবং রাতের বেলায় স্বামীর সঙ্গ দেবেন এই ছিল তার অলিখিত ভূমিকা।"[২]

রাতের বেলা বলার কারণ আছে। আসলে এটাও জানতে পারি স্বামীরও দিনের বেলা অন্তঃপুরে প্রবেশের নিষেধ ছিল। তাইতো ভাগবতের পুঁতি স্ত্রীকে রাখার কথা সরাসরি না বলে বলতে হয় সন্তানের মাধ্যমে। এছাড়াও অন্তঃপুরে যে পুরুষের দিনে যাবার অনুমতি ছিল না তার আরও একটা প্রমাণ পাই যখন রাসসুন্দরী দেবী একবার অসুস্থ হন তখন দূর থেকে স্ত্রীর খবর নেওয়া থেকে। এছাড়া স্ত্রীরা যে স্বামীকে ভয়মিশ্রিত দৃষ্টিতে দেখতেন তার ছবিও দেখা যায়। একবার বড় ছেলে স্বামীর ঘোড়ার পিঠে চড়ে এলে রাসসুন্দরী ঘোড়া দেখে পালিয়ে যান সেখান থেকে। পর্দা যে কতটা প্রকট ছিল তা এটা থেকে বোঝা

যাচ্ছে। এটা আসলে ঘোড়াকে দেখে ভয় পেয়ে নয়, যেহেতু স্বামীর ঘোড়া তাই লজ্জা ও সংকোচে যেতে পারছেন না। এছাড়া তিনি আত্ম্যাত্মিক ছিলেন তারও পরিচয় পাই, যখন স্বামী মারা যান প্রথমে মাথা থেকে স্বর্ণমুকুট খসে পড়ার কথা বললেও তিনি পরক্ষণেই বলেছেন পরমেশ্বর তাঁকে যখন যে অবস্থায় রাখেন তাই উত্তম-তখনকার এই কথা থেকে।

এরপর মেয়েদের বিয়ের পরবর্তী অবস্থার কথা বলতে গিয়ে জানান-

"এখন কখন মনে পড়ে সেই দিন
পিঞ্জরেতে পাখী বন্দী জালে বন্দী মীন।"[৩]

এটা তাঁর বার্ধক্যে এসে বিয়ের দিনের ভয় মেশা মনের কথা বলতে গিয়ে লেখা। এছাড়া তিনি বিয়েকে পরাধীনতার সঙ্গে তুলনা করেছেন যেহেতু অপরিচিত মানুষদের মধ্য গিয়ে বাস করতে হত এবং তাদের অধীনতা স্বীকার করতে হত তাই। এজন্য তাঁকে 'পিঞ্জরাবদ্ধ বিহঙ্গ' কথাটি বারবার ব্যবহার করতে দেখা যায়। তবে অন্তঃপুরে থেকে সংসার পালন ও সন্তান লালন এতে তার ক্ষোভ দেখা যায় না।

পর্দা প্রথাকে অস্বীকার করে বাইরে যাওয়ার মানসিকতা তাঁর ছিল না। তিনি নতুন বৌদের পর্দার কড়াকড়ি এবং লজ্জা পাওয়ার যে বাড়াবাড়ি দেখেছিলেন তাও উল্লেখ করেছেন। অবশ্য সমাজ পরিবর্তনের চেহারাও তাঁর দৃষ্টি এড়িয়ে যায়নি। তাইতো তিনি বলেন তাঁর আমলে বুক পর্যন্ত ঘোমটা, মোটা কাপড়, ভারী ভারী গহনা, হাত ভরা শাঁখা, এবং যে সব অলঙ্কার ছিল, তাঁর বার্ধক্যে এসে সে সকল পরন পরিচ্ছদের চল কমেছিল। দ্বিতীয়ার্ধের এই পরিবর্তনে তাঁর আনন্দ দেখে বোঝা যায় তাঁর সময়ের অবস্থার চেহারা। রাসসুন্দরীর জীবনের মূল সুরই হল বিস্ময়। জীবনে যা বিস্ময় তাকেই তুলে ধরেছেন তাঁর রচনায় আর এইভাবেই হয়ে উঠেছেন নিজগুনে স্বতন্ত্র।

এরপর আমরা কৈলাস বাসিনী দেবীর রচনাগুলি দেখলে দেখতে পাব তার লেখাতেও ফুটে উঠেছে তৎকালীন সমাজচিত্র। এখানেও দেখা যায় শিক্ষার অভাবে পিছিয়ে থাকার মত বিষয়। এছাড়াও মানুষের মধ্যে দেখা যায় লেখাপড়া শিখলে বৈধব্য দেখা দেবে অথবা সংসারের অমঙ্গল হবে এসব ভাবনা চিন্তা। কৈলাসবাসিনী দেবী জন্মগ্রহণ করেন একরকম প্রাচীন ভাবধারায় বিশ্বাসী পরিবারে, ১৮৩৭ সালে। বারো বছর বয়সে তাঁর বিয়ে হয়েছিল ইংরাজি শিক্ষায় শিক্ষিত এক যুবক, দুর্গাচরণ গুপ্তের সঙ্গে। এই ছিল তাঁর সৌভাগ্য ও শিক্ষা প্রাপ্তির উৎস। হিন্দু কলেজ থেকে লেখাপড়া করার ফলে এবং ব্রাহ্ম সমাজের সাথে যুক্ত থাকার ফলে সেকালের যে তরুণদের ধারণা ছিল স্ত্রী শিক্ষিত না হলে স্বামী স্ত্রী সম্পর্ক অপরিপূর্ণ থাকে, কৈলাস বাসিনীর স্বামী দুর্গাচরণ গুপ্ত ছিলেন তাঁদেরই একজন। তাঁর এই ভাবনার কারণেই অশিক্ষিতা বালিকা বধূ– কৈলাস বাসিনীর শিক্ষালাভ সম্ভব হয়। তবে যাই হোক স্বামীর কাছ থেকে পাওয়া সুযোগ, তাঁর গ্রহণশীল মনোভাব ও অদম্য আগ্রহ দ্বারা তিনি অসাধারণ কৃতিত্বের অধিকারী হয়ে উঠেছিলেন। স্বামীর সাহচর্য ও প্রেরণাতেই তাঁর প্রতিভার বিকাশের সূচনা। স্বামীর কাছ থেকে তিনি স্বধর্মে অনুগত থাকার শিক্ষাও পান। কৈলাস বাসিনীর লেখার মধ্যে শব্দের বৈচিত্র্য ও গদ্যের স্বচ্ছন্দ গতি লক্ষ্য করা যায়। তাঁর লেখালেখি কেবল চিঠিতেই সীমাবদ্ধ ছিল না, তাঁর ভাবনা জগৎ ছিল গভীর আর সেই ভাবনার জগৎ থেকেই আমাদের হাতে আসে তাঁর প্রথম গ্রন্থ—'হিন্দু মহিলাগণের হীনাবস্থা'। এই বইতে লেখিকা হিন্দু সমাজে যে সমস্ত কুসংস্কার ছিল এবং তার দ্বারা মেয়েরা যে কতদূর ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিল তা নিয়ে আলোচনা করেছেন। এখানে ব্রাহ্মণ ও কায়স্থদের কৌলীন্য প্রথা এবং এর সঙ্গে যুক্ত বাল্য বিবাহের রীতি, বিধবাদের সমস্যা, স্ত্রীশিক্ষার অভাব, পারিবারিক ক্ষেত্রে স্বামী-স্ত্রী সম্পর্ক, স্বামীর আত্মীয়দের সঙ্গে স্ত্রী সম্পর্ক, স্ত্রী শিক্ষা ও স্ত্রী স্বাধীনতার অভাব প্রভৃতি বিষয়গুলি ছোটো

অধ্যায়ে আলোচনা করেছেন। তবে এই সমস্যা থেকে প্রতিকারের কথা বলতে গিয়ে তিনি যা বলেছেন তা এক অর্থে রামমোহন ও বিদ্যাসাগরেরই প্রতিধ্বনি মাত্র। কিন্তু তাঁর অভিনবত্ব এখানেই যে তিনিই ছিলেন প্রথম মহিলা যিনি প্রথম হিন্দু সমাজের কুসংস্কারের লিখিত সমালোচনা করেছিলেন।

'হিন্দু মহিলার হীনাবস্থা' নামক গ্রন্থের প্রথমেই আছে বঙ্গদেশে মেয়েদের জন্ম অবাঞ্ছিত মনে করার বিষয়টি। কন্যা সন্তানের জন্মের কারণে বাবা মায়ের আক্ষেপও দেখা যায়। এছাড়াও পুত্র ও কন্যার প্রতি যে বিষম আচরণ হয় তারও পরিচয় আছে তাঁর লেখায়।

কেবল স্ত্রী শিক্ষাই নয়, নারীদের অন্যান্য সামাজিক সমস্যার কথা বলতে গিয়ে কৌলীন্য প্রথার কথা আলোচনা করেন তিনি। তবে নিজে কুলীন না হয়েও খুব কাছ থেকে এই সমস্যা দেখার দরুন কৌলীন্য প্রথার কুফল-'আদ্যরস' প্রথা নিয়েও তিনি আলোচনা করেন। আর এ সমস্তকে কেন্দ্র করেই নারীদের যে সমস্ত অত্যাচার সহ্য করতে হত তাও দেখান। বহুবিবাহ, বাল্য বিবাহ এবং কুলীন কন্যাদের অবিবাহিত থাকার যে গুরুতর সমস্যা তাই নিয়েও আলোচনা করেন। অর্থাৎ মেয়েদের বাল্যবিবাহ এবং তার শ্বশুর বাড়িতে যাওয়া থেকে আরম্ভ করে তাদের নিপীড়নের বর্ণনা আছে তাঁর রচনায়। শ্বশুর বাড়িতে মেয়েরা যেন সর্বদাই পিঞ্জরাবদ্ধ। শ্বশুর বাড়ি সর্বদাই পরের বাড়ি। এখানে রাসসুন্দরীর সাথে তাঁর বক্তব্য প্রায় একরকম। এছাড়া কৌলীন্য প্রথা সমাজের ছোটো একটি অংশের সমস্যা হলেও বাল্যবিবাহের ফলে গোটা সমাজই যে অল্প বিস্তর ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিল এটা তিনি সঠিক ভাবেই ধরতে পেরেছিলেন। এছাড়াও তিনি কুলীন কন্যাদের বিবাহ না হওয়ার এবং অসম বিবাহের সমস্যা, ভঙ্গ কুলীনদের বহুবিবাহ, বংশজদের

জাতে ওঠার আকাঙ্খা এবং কন্যা বিক্রয়, বৈদিক ব্রাহ্মণদের বাল্যবিবাহসহ বিভিন্ন ধরনের সমস্যা নিয়ে তিনি আলোচনা করেছেন। এমনকি বহুবিবাহকারী কুলীনদের স্ত্রী ও সন্তানদের দুর্ভোগ এবং ক্ষেত্র বিশেষে নৈতিকতা বিরোধী কাজ কর্মের কথাও তিনি উল্লেখ করেন।

বিধবা বিবাহ নিয়ে যে আন্দোলন চলেছিল তার থেকে বিদ্যাসাগর যখন অবসর নিলেন তখন কৈলাসবাসিনী হতাশার সুরে মন্তব্য করেন-

> "বিদ্যাসাগর যতটা পরিশ্রম ও অর্থব্যয় করেছেন, তার শতাংশও সাফল্য পায়নি। এক্ষেত্রে বিধবা বিবাহের প্রতি তাঁর সহানুভূতি চোখে পড়ে। এছাড়াও তাকে মন্তব্য করতে দেখা যায়— "স্বদেশবাসীগণ তোমরা বিধবাদের উদ্ধার কর।"[৪]

এক্ষেত্রে বিয়ে করে উদ্ধারের কথা বলেননি বলেছেন বিধবাদের প্রতি আরও সহানুভূতিশীল মানবিক আচরণ করতে।

তবে বাল্য বিবাহ যে সমাজে একটা ভয়ঙ্কর সমস্যা সেটা তিনি যে উপলব্ধি করেছেন তা আমরা আগেই জেনেছি। বাল্য বিবাহ এবং তার কুফলগুলিও তাঁর আলোচনায় ফুটে ওঠে। এই কুফলের কথা বলতে গিয়েই তিনি বলেন অল্প বয়সে বিয়ে হওয়ায় স্বামীর সঙ্গে স্ত্রীর যথাযথ বোঝাপড়া হয় না, আর এই বোঝাপড়ার অভাবে স্বামীর অন্য নারীর প্রতি আসক্তি লক্ষ্য করা যায়। এইখানে সে যুগের বাবু সম্প্রদায়ের বাগান বাড়িতে যাওয়ার চিত্র ভেসে উঠতে দেখা যায়। এজন্যই তিনি "নিজের পছন্দ মত বিবাহ"—এই বিষয়টাকে সমর্থন জানান যাতে এরকম সমস্যা না আসে। এছাড়া বাল্যবিবাহ হলে সংসারে বধূ-শ্বশুর বাড়ি—এই সম্পর্কটা তেমন ভাল হয় না বোঝাপড়ার অভাবে। শিশুদের মৃত্যুর হারও বাড়ত বিভিন্ন বিষয় সম্পর্কে সচেতনা না থাকার জন্য।

অর্থাৎ এসব সমস্যা বাল্যবিবাহ নিষিদ্ধ না হলে কমানো সম্ভব হবে না। এছাড়া শাশুড়ী ননদ যুক্ত সংসারে বালিকা বধূটির প্রতি মায়া মমতাহীন আচরণের বিষয়টিও উপেক্ষা করার মতো নয়। তারপর তিনি এটাও বলেন মেয়েকে বিয়ের আগে যখন দেখতে আসা হত তখন মেয়ে কি জানে অর্থাৎ পড়া জানে কিনা এটা দেখা হত না খালি কাজ দেখা হত। এই জন্যই তখনকার বিয়ের সময় ছেলেরা বিয়ে করতে যাওয়ার মুহূর্তে মাকে বলে যেত মা আমি তোমার জন্য দাসি আনতে যাচ্ছি। এছাড়াও বাল্য বিবাহের ফলে সংসারে সবার সাথে যথাযথ মানিয়ে নিতে পারে না বধূ। শিক্ষার কথাই তিনি বলেছেন এই সমস্ত সমস্যা থেকে মুক্তির কথা বলতে গিয়ে তিনি বিশেষ করে শিক্ষার ওপরেই জোর দিয়েছেন।

এছাড়া তিনি জাতিভেদ ও তার কুফল এবং পর্দা প্রথা নিয়েও বেশ বিস্তৃত আলোচনা করেছেন যেটা আমাদের তখনকার সমাজকে জানতে সাহায্য করেছে। দেখা যায় মেয়েরা নাকি লেখাপড়া শিখলে অবরোধ মোচন করে গুরুজনদের মানবে না এই ধারনায় বদ্ধমূল ছিল সমাজ। এছাড়াও অবরোধ মোচনের বাস্তব সমস্যা সম্পর্কেও তিনি সচেতন ছিলেন। তিনি দেখেছেন যে সমাজে তাদের বাড়ির বাইরে নিয়ে যাওয়া সহজ ছিল না। তাছাড়া, তখনকার বাঙালি মহিলারা যে নগন্য পোষাক পরতেন, তা পরে বাইরে যাওয়া সম্ভবও হত না– সেজন্যই তাঁর মনে হয়েছিল বাঙালি মহিলাদের অবরোধ মোচন করা শক্ত হবে। ইউরোপীয় পোষাক পরে ও সমস্যার সমাধান করা যাবে না। কারণ তাঁর মতে, এ পোষাক সাধারণ মানুষের আয়ত্তের বাইরে। তবে অবরোধ নিয়ে এত কথা বললেও তাঁর গ্রন্থের শেষে তিনি যখন বলেন—স্বামী-স্ত্রী দুজনেই বাইরে থাকলে রন্ধনাদি কে করবে তখন তাকে আমরা ঐতিহ্যবাহী মূল্যবোধকেই মেনে নিতে দেখি। এছাড়াও তিনি এটা বলেন যে কেবল পুরুষ নয় মেয়েরাও তাদের শিক্ষার ব্যাপারটিকে মেনে নিতে

পারত না এবং অল্প সংখ্যক মহিলা যারা ধর্মগ্রন্থ পাঠ করত তাদের অন্যরা ঘৃনা করত। তবে যাই হোক তিনি শিক্ষা ও অবরোধ মোচনের কথা বললেও গ্রন্থের শেষের বিবরণ থেকে বোঝা যায় তিনি নিজেও প্রাচীন মূল্যবোধকে অতিক্রম করতে পারেন নি। আর এই শিক্ষার কথা বলতে গিয়ে দেখা যায় তাঁর মধ্যে শিক্ষার পক্ষ নেওয়া ও পরম্পরাগতভাবে চলে আসা মূল্যবোধকে মানা দুইই ছিল একই সঙ্গে বর্তমান।

এবার আমরা যদি তাঁর দ্বিতীয় গ্রন্থ 'বিশ্বশোভা'-র (প্রকাশকাল ১৮৬৯) দিকে চোখ রাখি তাহলে দেখতে পাবো বয়স বাড়ার সঙ্গে ধর্মচিন্তার প্রবলতা। এখানে তিনি নিজের চেনা সমাজ থেকে দৃষ্টি সরিয়ে দৃষ্টি রেখেছেন বিশ্বের দিকে। এ বিশ্বের আশ্চর্য সৌন্দর্য, যার উপমার আর স্থল নাই। কৈলাসবাসিনী এই গ্রন্থটি তাঁর স্বামীকে উৎসর্গ করেন। এই গ্রন্থটির অধ্যায়গুলো হল—প্রভাতবর্ণন, নিদাঘমাহাত্ম্য, গ্রীষ্মবর্ণন, প্রাবৃটমাহাত্ম্য, প্রাবুটবর্ণন, শর্মাহাত্ম্য, শরদ্বর্ণন, হেমন্তমাহাত্ম্য, অপত্য স্নেহ, হেমন্ত বর্ণন, শিশির মাহাত্ম্য, বসন্তমাহাত্ম্য, মনের প্রতি উপদেশ, জীবের প্রতি উপদেশ প্রভৃতি। এই গ্রন্থখানি আগাগোড়া গদ্য ও পদ্যে মিশিয়ে লেখা। বিশ্বশোভা প্রকাশের দু বছর আগে দুর্গাচরণ গুপ্তের সহায়তায় তাঁরই ছাপাখানা থেকে মহিলাদের উন্নতির জন্যে নিবেদিত একটি মাসিক পত্রিকা প্রকাশিত হয় এর নাম 'অবোধ বন্ধু'। এই পত্রিকায় কৈলাস বাসিনীর একটি প্রবন্ধ প্রকাশিত হয় নাম— 'সভ্যতা এবং সমাজ সংস্কার'।

সবশেষে একথা বলা যায় যে প্রথমে সমাজ চিন্তা ও শেষে ধর্ম চিন্তা এটা সেকেলে লেখিকাদের একটা সাধারণ লক্ষণ। এক্ষেত্রে কৃষ্ণভাবিনী ও রোকেয়ার মতো প্রথম দিকের নারীবাদীরাও এর ব্যতিক্রম ছিলেন না।

এরপর আমরা যদি জ্ঞানদানন্দিনী দেবীর জীবনের দিকে দৃষ্টিপাত করি তাহলে দেখব সেখানে অবরোধ ভেঙে বাইরে যাওয়ার সুর অন্যরকম। পূর্ববর্তী মহিলারা লেখাপড়া শিখলেও সমাজের বিভিন্ন সংস্কার, বিধি নিষেধ ইত্যাদির কথা বললেও শেষ পর্যন্ত পুরানো মূল্যবোধ ও সংস্কার মেনে চলেছেন। পোষাকে পরিচ্ছদ, অবরোধ ভেঙে বাইরে যাওয়া, সামাজিক কোনো ভূমিকা পালন করা এসব খুব কম লোকের কাছেই গ্রহণযোগ্য ছিল। লেখাপড়া শিখলেই মানুষ পুরানো মূল্যবোধ বর্জন করতে অথবা নতুন মূল্যবোধকে স্বাগত জানাতে পারেন না। কারণ দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তন নির্ভর করে সামগ্রিকভাবে পারিবারিক ও সামাজিক পটভূমি এবং পরিবেশের ওপর। উনিশ শতকের বঙ্গদেশে লেখাপড়া শিখে যে স্বল্প সংখ্যক মহিলা যুগের সঙ্গে তাল মিলিয়ে রীতিমতো আধুনিক হয়ে উঠেছিলেন, জ্ঞানদানন্দিনী দেবী তাঁদের একজন বললে ভুল বলা হবে, প্রকৃতপক্ষে তিনি ছিলেন তাঁদের পথিকৃৎ। জ্ঞানদা নন্দিনী দেবীর জন্ম ১২৫৭ সালে (১৮৫০ ইংরাজি)। জ্ঞানদানন্দিনীর গৌরী দান রীতি অনুযায়ী বিবাহ হয়। তিনিও ছোটোবেলা থেকে পড়াশোনা করেননি, সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর-এর সঙ্গে বিবাহের পরেই লেখাপড়া শেখেন। বিবাহই তাঁর জীবনে আনে আমূল পরিবর্তন, সামাজিক মর্যাদা, প্রাত্যহিক জীবনে বিলাসিতা, অভিজাত ঘরের নতুন ধরনের জীবনযাত্রা ইত্যাদি তাঁর জীবনে দেখা দিয়েছে কিন্তু তাঁর জীবনে সে অর্থে কোনো আধুনিকতার অনুপ্রবেশ ঘটেনি কারণ সে বাড়ির কর্তা পাশ্চাত্য প্রভাবিত আধুনিক জীবনযাত্রাকে সব সময়ে ভালো চোখে দেখেননি। তবে স্বামীর কাছ থেকে নতুন শিক্ষায় যে মূল্যবোধ তিনি লাভ করেছিলেন তারই প্রভাব পড়ে তাঁর পোষাক পরিচ্ছদ এবং জীবন যাত্রায়। জ্ঞানদা নন্দিনী দেবীর পড়াশোনাও অন্তঃপুরের মধ্যেই। তাই যখন বাইরে বেরিয়ে স্বামীর সঙ্গে বোম্বাই যাওয়ার ডাক আসে তার জন্য প্রয়োজন হয় শালীন পোষাকের আর এর জন্য স্বামী সত্যেন্দ্রনাথ প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের সমন্বয়ে একটি পোষাকের

নকশা করেন। এটাও ছিল সমাজের চোখে বিদ্রোহ এমনকি জুতো পরা এবং গাড়িতে যাত্রা করাও ছিল লোকাচার বিরোধী, একটা কথাতেই বিষয়টি স্পষ্ট হয়। যখন সত্যেন্দ্রনাথের মা বলেন—

"তুই মেয়েদের নিয়ে কি মেমদের মত গড়ের মাঠে বেড়াতে যাবি নাকি?"[৬]

এ কথাই স্পষ্ট করে অন্তঃপুরের কয়েদখানায় আটকা পড়া মেয়েদের জীবনকে। এমনকি স্বামীর সঙ্গে এক টেবিলে খাওয়া, গাড়ি চড়া, ভিন্ন ঢঙে শাড়ি পরা এগুলো অন্দরমহলেরে চোখকে বিচলিত করতো ফলে তারা দুজন যেন 'এক ঘরে' হয়ে থাকতেন। তবে যাই হোক জ্ঞানদা নন্দিনীর প্রথম উদ্ভাবনী শক্তির পরিচয় মেলে পোষাকের মাধ্যমে। এছাড়া বিভিন্ন জায়গায় যওয়ার মাধ্যমে তিনি ফরাসী, ইংরাজি, বাংলা ও সংস্কৃত ভাষা শিখেছিলেন। শিশুদের মনের বিকাশের জন্য 'বালক' নামে তিনি একটি পত্রিকাও প্রকাশ করেন এবং দুটি বই 'টাকডুম ডুম' ও 'সাত ভাই চম্পা' রচনা করেন। তাঁর লেখা প্রবন্ধের সংখ্যাও কম নয়। তবে যাই হোক উনিশ শতকের প্রেক্ষিতে সমাজ সংস্কার বিষয়ে তিনি প্রগতিশীল ছিলেন তবে পুরুষরা যে সমাজে মেয়েদের নিজেদের কাজে লাগান এবং শোষণ করেন এ ভাবনা তাঁর মধ্যে দানা বাঁধেনি। কেবল পোষাকের মাধ্যমে তিনি সমাজকে প্রতিবাদ জানান। অন্যান্য কোনো দিকে তাঁর তেমন কোনো প্রথা বিরোধিতার পরিচয় পাওয়া যায় না। বিশেষ করে ইন্দিরা দেবীর বিয়ের ব্যাপারে মতামত যেভাবে চাপিয়ে দেওয়া হয় সেটা দেখে মনে হয় আধুনিক হওয়া সত্ত্বেও জ্ঞানদা নন্দিনী দেবীর মধ্যে স্ববিরোধিতা ছিল।

এরপর এই নারী প্রগতির ইতিহাসে উঠে আসে এক মুসলিম নারীর কথা নাম বিবি তাহেরন নেছা। ইনি বামাবোধিনী পত্রিকায় একটা গদ্য নিবন্ধ প্রকাশ করেন। ইনি

যে নিবন্ধ লেখেন তার কোনো নাম দেওয়া হয়নি তবে তিনি প্রকাশিত নিবন্ধের শুরুতে বামাবোধিনী পত্রিকার 'বামাকূল হিতৈষী' সম্পাদককে সম্বোধন করে তাঁর বক্তব্য প্রকাশ করেন। পত্রিকায় প্রকাশের জন্য রচনাটি পত্রিকা দপ্তরে জমা দেন ১৯৬৪ সালের অক্টোবর নভেম্বর মাসে। আর শেষ পর্যন্ত রচনাটি ১৯৬৫ সালের ফেব্রুয়ারী-মার্চ সংখ্যায় বামাবোধিনী পত্রিকায় প্রকাশ পায়। তিনি পড়াশুনা করেছিলেন বোদা বালিকা বিদ্যালয় নামে দিনাজপুরের এক বিদ্যালয়ে। সদ্য প্রকাশিত বামাবোধিনী পত্রিকা সেখানে পৌঁছে গেছিল এটা খুব সাধারণ ঘটনা ছিল না। কারণ ১৮৬৩ সালে গোটা বঙ্গদেশে স্কুল পরিদর্শন করে স্কুল ইন্সপেক্টরের প্রতিবেদনে দেওয়া হিসাব অনুযায়ী মাত্র ২,৪৮৬ জন ছাত্রী তালিকাভুক্ত ছিল। এই পরিপ্রেক্ষিতে তাহেরন নেছার অস্তিত্বকে প্রায় অবিশ্বাস্য বলে মনে হয় তাই রচনাটি প্রকাশিত হওয়ার আগে সেটি যে তাঁরই রচনা—এটার বিশ্বাসযোগ্য প্রমাণ পাঠাতে বলা হয়েছিল। এবং সব প্রমাণ সাপেক্ষে ধরে নেওয়া হয় এটি তাঁর রচনা। একটি পাঠশালায় পড়তে পড়তে মুসলিম পরিবারের একটি বালিকার পক্ষে এই প্রবন্ধ লিখতে পারার কৃতিত্বকে অসামান্য বলে বিবেচনা করতে হয়। সে সময় মুসলিম সমাজে পর্দা প্রথা অত্যন্ত প্রবল তখন সেই বিধিকে ভেঙে শিক্ষাগ্রহণ ছিল সত্যই দুঃসাহসিক ঘটনা, যেটা সেই সময় তিনি সম্ভব করেছিলেন। তবে যাই হোক এই নিবন্ধে তিনি যে বিষয়গুলি আলোচনা করেছেন সেগুলি হল— স্ত্রী শিক্ষার উপকারিতা ও উপযোগিতা, স্ত্রী ও পুরুষ শ্রেণীভেদ করে মেয়েদের অবহেলা এবং তার প্রেক্ষিতে দুজনেরই সমান গুরুত্ব প্রতিষ্ঠা এবং শিক্ষার অভাবের কারণে স্ত্রীলোকদের পক্ষে যে কোনো অনর্থ ঘটানোর সম্ভাবনা। এ প্রসঙ্গে তাঁর বক্তব্য—

> "অজাত ও মৃত পুত্র কেবল একবার দুঃখদায়ক, কিন্তু মূর্খ
>
> সন্তান অসীম দুঃখের উৎস।" [৭]

শিক্ষা পেলে মেয়েদের মন আলোকিত হলে তাদের ঠিকঠাক প্রতিনিধিত্বের দ্বারা পরিবারে শান্তি বজায় থাকবে অর্থাৎ শিক্ষার আলো পেলে মেয়েরা গুরুজন, সন্তানসন্ততি এবং অন্যান্যদের সঙ্গে যথাযোগ্য ব্যবহার করতে পারবেন। পিতার ও স্বামীর উভয় কূলকেই মানিয়ে নিতে পারবেন।

তবে সবশেষে বলি তাঁর লেখায় যে অল্প কথায় বর্ণনা ও জোরালো যুক্তি দিয়ে নিজের বক্তব্য পেশ করতে পারার ক্ষমতা লক্ষ করা যায় তা নিঃসন্দেহে প্রশংসনীয়।

এরপর আমাদের আলোচ্য কৃষ্ণভাবিনী দাস। জ্ঞানদানন্দিনীকে আমরা প্রথম আধুনিকা বললেও পোষাকে-আশাকে, চলনে-বলনে, শিক্ষায় এবং রুচিতে আধুনিক হয়ে ওঠা আর নারী প্রগতি সম্পর্কে যথার্থই সচেতন হয়ে ওঠা এক জিনিস নয়। দেশের অত্যাচার থেকে অংশত মুক্ত যে পরিবেশে কৈলাসবাসিনী দেবী, জ্ঞানদানন্দিনী দেবী বেড়ে উঠেছিলেন সেই পরিবেশ কৃষ্ণভাবিনী পাননি। তাঁর জন্ম ১৮৬৪ সালে যে সময় সমাজে স্ত্রী শিক্ষার বিষয়টি রীতিমতো লোকাচার বিরোধী বলে ভাবা হত। কিন্তু তা সত্ত্বেও কৃষ্ণভাবিনীর হাতে খড়ি হয়েছিল সম্ভবত আদুরে কন্যা ছিলেন বলেই। তিনি ছিলেন বাল্য বিবাহের শিকার। তবে বিবাহ সূত্রেই তিনি লেখাপড়া করার সুযোগ পেয়েছিলেন। কৃষ্ণভাবিনীর স্বামী দেবেন্দ্রনাথ দাস। স্বামীর প্রেরণা ও সাহচর্যতেই কৃষ্ণভাবিনীর জীবনধারা ও মনোভাব ব্যাপক পাল্টে যায়। জ্ঞানদা নন্দিনী যে সমাজ থেকে বিলাত যাত্রা করেন সেখানে যেমন সমস্যা ছিল, কৃষ্ণভাবিনীর ক্ষেত্রেও তেমনি শ্বশুর বাড়ি রক্ষণশীল হওয়ার কারণে সমস্যা হয়েছিল। তৎকালীন সমাজে যেখানে কালাপানি পার হওয়া পুরুষদের জন্যই নিষিদ্ধ ও ধর্ম বিরুদ্ধ কাজ বলে গণ্য করা হত সেখানে একটি মেয়ের বিলাত যাত্রা যে নিতান্ত সহজ ছিল না তা বলাই যায়। জ্ঞানদা নন্দিনী লোকাচার ভেঙে

বিলাত যাওয়ার যে পথ তৈরী করেন সেই পথেই পা রাখলেন কৃষ্ণভাবিনী দেবী। 'ইংলন্ডে বঙ্গমহিলা' গ্রন্থটি যখন প্রকাশ পায় তখন তাঁর বয়স ছিল ২৫ বছরেরও কম। এছাড়াও 'স্ত্রীলোক ও পুরুষ' ও 'বিলাতভেল্কি' নামেও তাঁর প্রবন্ধ আছে, এছাড়াও আছে আরও অনেক লেখা। বিলাত যাওয়ার ইচ্ছা এবং বাইরের জগৎকে দেখা ইচ্ছাটা তাঁর কতটা আন্তরিক ছিল তা বোঝা যায় তাঁর লেখা থেকে যেখানে তিনি বলছেন,

> "বহুদিন হতে হৃদয়ে আমার,
>
> গোপনে রয়েছে এক আশালতা,
>
> দেখিবার তরে প্রিয় স্বাধীনতা,
>
> যাইব যে দেশে বসতি উহার। ...
>
> যাইব তথায় স্বাধীনতাদেবী,
>
> বিরাজে যেথায় প্রতি ঘরে ঘরে ..." ৮

তবে বিলেতে গিয়ে তিনি কেবল স্বাধীনতা দেখেননি, দেখেছিলেন সমাজে নারীদের উন্নত অবস্থা ও মর্যাদা। বিলেত যাওয়ার বাসনার পাশাপাশি তাঁর লেখায় প্রকাশ পেয়েছে ওই দেশের নানা দিকের সঙ্গে নিজের দেশের প্রতিতুলনা। এছাড়া সমাজ ও জ্ঞান বিজ্ঞান সম্পর্কে অভিজ্ঞতা অর্জন করার বাসনাও ছিল তাঁর প্রবল। তিনি "ইংলন্ডে বঙ্গমহিলা" নামে তাঁর যে ভ্রমণকাহিনী আছে সেখানে কেবল শহরটা সম্পর্কে বিস্ময়ই নেই, আছে পার্লামেন্টের নির্বাচন ব্যবস্থা, ইংল্যান্ডের গ্রামের জীবন, ইংরেজদের দৈনন্দিন জীবনযাত্রা প্রভৃতির কথাও। নারী ও পুরুষদের দোষ গুণ আলোচনা প্রসঙ্গেও এসেছে ভারতবর্ষের সঙ্গে তুলনা। তাঁর এই দেখার মধ্যে যেমন সমাজ সচেতনতার পরিচয় আছে তেমনি আছে ইংল্যান্ডের সমাজে শ্রেণী ভেদের কথা। তবে সে দেশের মেয়েদের প্রশংসার

পাশাপাশি তারা যে রোগা পাতলা ও প্রেমের মাধ্যমে বিয়ে করে এটা তিনি মানতে পারেনি হয়তো দেশীয় ঐতিহ্যের প্রতি আনুগত্যের কারণেই। ইংল্যান্ডে মেয়েদের মধ্যে যে নারীমুক্তি আন্দোলন চলছিল তার উল্লেখ করেছেন কৃষ্ণভাবিনী তাঁর লেখায়। এখানেও জ্ঞানদা- নন্দিনীর থেকে উন্নততর বিস্তার লক্ষ করা যায়। জ্ঞানদা নন্দিনী যেখানে কেবল উন্নততর পোষাক পরে বিলেত যাওয়ার মাধ্যমে সমাজকে প্রতিবাদ জানিয়েছেন। আর কৃষ্ণভাবিনী কেবল বিলেত যাননি সঙ্গে নিজের দেশের সঙ্গে ইংল্যান্ডকে মিলিয়ে দেখেছেন। তবে ইংল্যান্ডের মেয়েদের নানা বিষয় ভালো লাগলেও কিছু বিষয়ে তাদেরকে পিছিয়ে থাকতে দেখেছেন। সেই বিষয়গুলি হল-তাদের ভোটাধিকার ছিল না, লন্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ে পরীক্ষা দেওয়ার সুযোগ পেলেও অক্সফোর্ড – কেমব্রিজে পরীক্ষার অধিকার তাঁরা পায়নি, সেই অধিকার পাওয়া গিয়েছিল আরও চল্লিশ বছর পর, মেয়েদের বিবাহ-বিচ্ছেদ করার অধিকার ছিল না, চাকরিতে পুরুষদের তুলনায় একই কাজের জন্য তারা বেতন পেতেন অনেক কম। অর্থাৎ ইংল্যান্ডের শিক্ষা ব্যবস্থা, বিবাহ, গার্হস্থ্য, ধর্ম, উৎসব, মহারানি ভিক্টোরিয়া এবং তাঁর গণতান্ত্রিক পদ্ধতি বিভিন্ন বিষয়ে তাঁর আগ্রহ লক্ষ করার মতো। এইভাবে ইংরেজ মহিলাদের শিক্ষা, স্বাধীনতার কথা বলার মধ্য দিয়েই তিনি নিজের দেশে বাঙালি মহিলাদের অন্তঃপুর থেকে মুক্তি দেবার পক্ষে ওকালতি করেন এবং বলেন— তাঁরা যেন ‘পায়ের শিকল ছিঁড়ে', 'পিঞ্জর কেটে’ অন্তঃপুর থেকে বেরিয়ে আসেন, এবং যেন প্রমাণ করেন তাঁরা ‘অকেজ’ নন এবং তাঁরা ‘পশুর মতন’ জীবনযাপন করতে তৈরী নন। এই সমস্ত বিষয়ে আগ্রহী লেখিকা এ আহ্বান জানান কবিতার ভাষায়—

“আয় বোন! সবে পিঞ্জর কাটিয়ে,

প্রিয় ভ্রাতাগণে অথবা বুঝায়ে

দেখে যাও হেথা স্বাধীন জীবনে

জর্মন, ফরাসী, ব্রিটন ললনে,

প্রফুল্লতাময়, সতেজ হৃদয়,

হীন অশ্রুজল ধরে না নয়নে।"....[৯]

এরপর তাঁর 'স্ত্রীলোক ও পুরুষ' প্রবন্ধটি ১৮৯০ সালের ফাল্গুন সংখ্যা ভারতী ও বালক পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। এখানে তিনি স্বীকার করেন, 'ইংলন্ডে বঙ্গমহিলা' সম্পর্কে অনেক মতামতই প্রকাশিত হয়েছে যা অপরিণত। এছাড়া এখানে তিনি সংসারে স্ত্রীলোকের স্থান এবং স্ত্রী পুরুষের পারস্পরিক সম্পর্কের বিষয়গুলিও দেখান। এর পাশাপাশি নারীমুক্তি আন্দোলনের কথাও বলেন। এমনকি 'ইংরেজ মহিলার শিক্ষা ও স্বাধীনতার গতি' এবং 'সংসারে নারীর ক্ষমতা' প্রবন্ধেও তিনি ইংল্যান্ডের নারীমুক্তি আন্দোলনের কথা বলেন। এছাড়া 'ইংল্যান্ডে শিক্ষা ও স্বাধীনতার গতি' প্রবন্ধে তিনি ইংল্যান্ডে স্ত্রী শিক্ষার উন্মেষ ও বিকাশের ধারাকে কাল অনুযায়ী চারটি পর্যায়ে বিভক্ত করেছেন- প্রথম পর্যায়ে অন্তর্ভুক্ত করেছেন রানি প্রথম এলিজাবেথের সময়, দ্বিতীয় পর্যায়ে রানি অ্যানের কাল, তৃতীয় পর্যায়ে রানি ভিক্টোরিয়ার প্রথম দিক এবং চতুর্থ পর্যায়ে তাঁর শাসনের শেষ দিক। তাঁর প্রদত্ত ইতিহাস সংক্ষিপ্ত, কিন্তু এর মধ্যে তাঁর যে ইতিহাস চেতনা প্রকাশ পেয়েছে তা বেশ স্পষ্ট। ইংল্যান্ডের এই নারী আন্দোলনের কথা বলতে গিয়ে যে দুটি নাম বিশেষভাবে উঠে আসে তাঁরা হলেন- মিসেস মিলিসেন্ট ফসেট এবং মিসেস অ্যানি বেসান্ট। সামগ্রিকভাবে নারীদের শিক্ষা ও বিভিন্ন ধরনের অধিকার প্রতিষ্ঠায় বিশেষ ভূমিকা পালন করেছিলেন অ্যানিবেসান্ট। পরে তিনি ইংল্যান্ড ত্যাগ করে ভারতবর্ষে

স্থায়ীভাবে বসবাস করায় এই ভূমিকায় ছেদ পড়ে। এদের আন্দোলনের ফলে কেবল যে মহিলাদের উচ্চশিক্ষার দাবি মেনে নেওয়া হয় তাই নয়, কৃষ্ণভাবিনীর মতে, মিসেস বেসান্টের মতো মহিলার তুমুল আন্দোলনের ফলেই বিবাহিত মহিলার সম্পত্তিতে অধিকার ও বিবাহ বিষয়ক আইনের যথেষ্ট সংশোধন হয়। এমনকি কৃষ্ণভাবিনীর বিশ্বাস এই আন্দোলনের মুখে ভোটাধিকারের দাবিও একদিন স্বীকৃত হবে। তবে যাই হোক ইংরেজ মহিলারা সীমিত মাত্রায় ভোটাধিকার লাভ করেন প্রথম মহাযুদ্ধের পর।

এরপর 'বিলাত-ভেল্কি' (প্রকাশকাল সাহিত্য; কার্তিক – চৈত্র, ১৯২৭) নামক প্রবন্ধে বিলিতি সবকিছুকে ভাল বলার মনোভাবকে তিনি লজ্জাজনক বললেও তাঁর ইংরেজ প্রীতি অটুটই ছিল। এজন্য যখনই তিনি স্বদেশের কোনো ধর্মীয়-সমাজিক প্রতিষ্ঠান, কুসংস্কার অথবা ক্ষুদ্রতার সমালোচনা করেছেন, তখনই প্রতি তুলনা হিসাবে তিনি পাশ্চাত্যকে হাজির করেছেন।

এছাড়া কৃষ্ণভাবিনীর বক্তব্যের মধ্যে যে কথাটি বারবার উঠে এসেছে তা হল আন্দোলনের মাধ্যমেই অধিকার প্রতিষ্ঠিত হয় কান্না অথবা অনুময় দিয়ে নয়, পরবর্তী কালে এই মতেরই সমর্থন করেন বেগম রোকেয়া। এই চেতনা জাগে শিক্ষার মাধ্যমে। উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে ভদ্র পরিবারে স্ত্রী শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা অন্তত নীতিগতভাবে স্বীকৃত হয়েছিল। কৃষ্ণভাবিনী মনে করতেন অস্তিত্বের প্রয়োজনে শিক্ষার দরকার। শিক্ষার উপযোগিতা নিয়ে তিনি লেখেন 'শিক্ষিত নারী' প্রবন্ধটি।

এমনকি মেয়েদের শিক্ষা নিয়ে যখন আপত্তির নানা দিক উঠত তখন তারও প্রতিবাদ করেছেন কৃষ্ণভাবিনী জানিয়েছেন প্রকৃতি নারীদের গৃহবাসিনী, পিঞ্জরবাসিনী অথবা চিরকারারুদ্ধা করেও সৃষ্টি করেননি। এমনকি সেকালে সবাই প্রত্যাশা করতেন,

শিক্ষিত অথবা অশিক্ষিত যাই হোন না কেন, মহিলারা স্বাধীন চিন্তা না করে বরং নীরবে স্বামীর দেখানো পথেই এগিয়ে চলবে বিনা বিচারে। কারণ স্বামী, সন্তান এবং সংসারের জন্যেই তাঁদের জীবন নিবেদিত থাকত। পাশ্চাত্য ভাবধারায় বিশ্বাসী কৃষ্ণভাবিনী এ ধারণা পুরোপুরি মেনে নিতে পারেননি। তিনি বলেন, মেয়েদের জীবন পুরুষদের জন্যই নিবেদিত—এ অসভ্য সমাজের চিন্তা। তিনি লেখেন—

> "স্ত্রী জাতি এ জগতে কেবল জ্ঞানবুদ্ধিহীনা হইয়া দাসত্ব করিবার
> জন্যই সৃজিত হয় নাই, কিম্বা পুরুষের ক্রীড়ার নিমিত্তও গঠিত নহে।
> পরোপকার ও অন্যের জন্য জীবন ধারণ করা যেমন নারীর উদ্দেশ্য,
> রমনী তেমনি নিজের নিমিত্তও বাঁচিয়া থাকে।" [১০]

এই 'নিজের নিমিত্ত বাঁচার' ধারণার সঙ্গে পুরুষ স্বার্থের যে একটা দ্বন্দ্ব আছে, তিনি স্পষ্ট ভাষায় তা দেখান। মেয়েরা নিজের জন্যে বাঁচতে গেলে পুরুষের স্বার্থহানি ঘটে এবং তখনই তাঁরা অত্যাচারের মাধ্যমে মেয়েদের আটকে রাখার চেষ্টা করেন। তাঁর প্রবন্ধে পুরুষ সমাজের স্বার্থ এবং ভন্ডামি সম্পর্কে তিনি যে বক্তব্য উপস্থিত করেন তাঁর আগে অন্য কোনো বাঙালি নারীর রচনায় লক্ষ করা যায় না। যদিও কৃষ্ণভাবিনীর তিরিশ বছর আগে কৈলাসবাসিনী দেবী অস্ফুট স্বরে অনুরূপ অভিযোগ করেছিলেন, তবে তাঁর ভাষায় কৃষ্ণভাবিনীর মতো স্পষ্টতা আদৌ ছিল না। এমনকি কৃষ্ণভাবিনী অত্যাচারের যে বিশ্লেষণ দেন, কৈলাসবাসিনীতে তাও অনুপস্থিত, তবে এই ভন্ডামির স্বরূপ রোকেয়া আরও ধারালোভাবে উন্মোচন করেছেন। আর এই কৃষ্ণভাবিনীই যখন 'স্ত্রীলোক ও কাজের মাহাত্ম্য' প্রবন্ধে বলেন প্রফুল্ল থাকা মহিলাদের প্রথম গুণ পরিচ্ছন্ন থাকা মহিলাদের দ্বিতীয় এবং রন্ধন তৃতীয়, স্ত্রীজাতির প্রধান কর্মক্ষেত্র গৃহ, আর প্রধান কর্ম ঘরের কাজ, তখন

মেয়েদের শিক্ষা, স্বাধীনতা এবং সামাজিক ভূমিকা সম্পর্কে যিনি অত্যন্ত প্রগতিশীল তাঁরই একটি রক্ষণশীল মনোভাবের প্রকাশ ঘটে। অর্থাৎ তাঁর ক্ষেত্রেও স্ববিরোধ কিছু কম ছিল না এটা দেখতে পাওয়া যায়। হয়তো বা সময়ের কারণেই। মেয়েরা কর্মদক্ষ হবে তবে চাকরি ও অর্থ উপার্জন করবে এটা কৃষ্ণভাবিনী মেনে নিতে পারেননি অথচ রোকেয়া দেখা যায় এরই তীব্র প্রতিবাদ করেছেন। অবশেষে বলা যায় তিনি আধুনিক হয়েও, স্বাধীনতার প্রতি আসক্ত হয়েও, বেশি বয়সে পৌঁছে তিনিই ঐতিহ্যের সঙ্গে আপোস করেছেন।

পূর্বোক্ত লেখিকাদের দিকে দৃষ্টিপাত করলে আমরা দেখব এরা সকলেই কোনো না কোনো দিকে আলাদা। কিন্তু সকলের মধ্যেই একটা সাধারণ সুর শোনা যায় সেটা শিক্ষার আকাঙ্খা এবং অবরোধের যন্ত্রণা। তবে প্রায় সকলেই স্বামীর সান্নিধ্যে ও প্রেরণায় শিক্ষালাভ করেছেন কেবল রাসসুন্দরী ছাড়া। এখানে রাসসুন্দরীর সঙ্গে অন্যান্যদের পার্থক্য। প্রথম দিকের লেখিকা হিসাবে রাসসুন্দরীকে দেখে বোঝা যায় শিক্ষলাভ করাই ছিল তাঁর প্রধান আগ্রহ। তবে তাঁর ক্ষেত্রেও বাল্যবিবাহ ও পর্দাপ্রথার ভয়াবহতা লক্ষ করা গেছে। এরপর জ্ঞানদানন্দিনী দেবী কেবল পোষাকের মাধ্যমে ও বিলেত যাওয়ার মাধ্যমে সমাজের বিরোধিতা করলেও কৃষ্ণভাবিনী কিন্তু কেবল বিলেত যাওয়ার মধ্যেই থেমে থাকেনি তাঁর মন আরও বিস্তৃত। তিনি তাঁর সমাজকে ইংল্যান্ডের সাথে মিলিয়ে দেখেছেন এবং যা কিছু ভাল তাকে গ্রহণ করেছেন– এখানেই জ্ঞানদা নন্দিনী দেবীর সঙ্গে কৃষ্ণভাবিনীর পার্থক্য। আবার দেখা যায় প্রায় সকলেই প্রতিবাদী মনের অধিকারী হওয়া সত্ত্বেও কেমন যেন ঐতিহ্যবাহী ধারনার সঙ্গে আপোস করেছেন। এখানেই তাঁদের সকলের মধ্যে স্ববিরোধিতা। আবার সমাজের মানুষের ধারনা শিক্ষা পেলে নাকি মেয়েরা অবাধ্য হয়ে উঠবে—এই যে স্ত্রীশিক্ষা বিরোধী ধারনা এটার প্রতি কৈলাস বাসিনী যতটা জোর

দেন এবং প্রতিবাদ করেন রাসসুন্দরী দেবী কিন্তু ততটা পারেননি। কৃষ্ণভাবিনী পুরুষ সমাজের স্বার্থ ও ভন্ডামি নিয়ে যে বক্তব্য রাখেন তা কৈলাসবাসিনীতেও নেই। এখানেও কৃষ্ণভাবিনী ও কৈলাসবাসিনীর বাসিনীর মধ্যে পার্থক্য। আর রোকেয়া এই অত্যাচারের স্বরূপকে আরও বিস্তারিত ভাবে উন্মোচন করেছিলেন পরবর্তী সময়ে। এইভাবেই আমরা তাঁদের লেখার মাধ্যমে ওই সময়ের ছবি দেখতে পেলাম।

পর্দাপ্রথা ভেঙে বিলেত যাওয়ার মধ্য দিয়ে যারা সমাজের বুকে আঘাত করেছিলেন তাঁদের মধ্যে তরু দত্ত, অরু দত্ত, রাজকুমারী বন্দ্যোপাধ্যায়, স্বর্ণলতা ঘোষ, সুনীতি দেবী, কাদম্বিনী গাঙ্গুলি প্রভৃতি নাম উল্লেখযোগ্য। এরকমই অভিনয় জগতেও যাঁরা অসম্ভবকে সম্ভব করেছিলেন তাঁরা হলেন গোলাপসুন্দরী, বিনোদিনী, কিরণবালা, তিনকড়ি দাসী, কুসুমকুমারী, তারা সুন্দরী, কাননদেবী প্রভৃতি বিদুষী নারীরা। এই যে মেয়েদের এগিয়ে চলার একটা পথ যেখানে কতজনের ভাবনা চিন্তা, বাধা ইত্যাদি নানা দিক দেখলাম সেখানে যাঁরা তাঁদের ভিতরের অনুভুতিকে জাগিয়ে নানান ধরনের প্রতিবাদের মাধ্যমে নিজেদেরকে প্রকাশ করেছেন তাঁদের কয়েকজনের কথাই জানলাম অল্প আলোচনার মধ্যে দিয়ে। তবুও যার নাম না করলে এই শতকের কথা শেষ করা যায় না তিনি হলেন স্বর্ণকুমারী দেবী (১৮৫৬-১৯৩২)। তিনি সেই সময়ের প্রথম সারির পাঁচ জনের মধ্যে একজন ছিলেন। এছাড়াও মহিলা রচিত প্রথম বাংলা উপন্যাসের জন্য বিদেশিনী হ্যানা ক্যাথারিন ম্যলেন্স এর নাম উল্লেখযোগ্য, তাঁর ‘ফুলমণি ও করুনার বিবরণ’ আখ্যান হিসাবে বেশ হৃদয়গ্রাহী। এইভাবেই আরও অনেকের কথা না বলার মধ্যে দিয়েই এই সময়ের লেখিকাদের আলোচনা এইখানেই শেষ করলাম।

এরপর মেয়েরা এই সময় উত্তীর্ণ হয়ে যখন বিশ শতকের দোরগোড়ায় তখনই তারা তাদের অর্জিত অভিজ্ঞতা উপলব্ধীর ভিত্তিতে জীবন ও জগৎকে দেখে নিতেই নতুন পথের পথিক হয়েছিল। যুক্তির দ্বারা নারী তখন পুষ্ট। এইভাবেই নারী সেদিন বিভিন্ন পরিস্থিতি ও অবস্থানকে অন্য ভাবধারায় ভাবতে শিখেছিল। উনিশ শতক থেকে বিশ শতকে উত্তরণ ভাবধারায় ব্যাপ্তির প্রকাশ ঘটিয়েছিল। এই ভাবেই নারীর চেতনা ও চিন্তাধারা পেল আরও উর্বর ভূমি। যে ভূমিতে নারীর মন পেল অনেকটা স্বাধীন ভাবে বিচরণের পথ। নারী মন তখন দর্শন, যুক্তি, বিজ্ঞানে আরও সমৃদ্ধ। এই প্রাপ্তি ও সমৃদ্ধিকে আঁকড়ে ধরে বাংলা সাহিত্য জগতে তাঁরা যা কিছু সৃষ্টি করে গেছেন তার অবদান অসামান্য। যেন এক একটা সময়ের দলিল হয়ে অমরত্ব লাভ করেছে তাঁদের সাহিত্য। এইভাবে নারীর নিজস্ব পরিসর খুঁজে নেওয়ার তাগিদে এসময় অনেকে লেখালিখি করেছিলেন তাদের প্রত্যেকের নাম সাহিত্যে অমরত্ব লাভ করেছে। এখন আমরা এই অধ্যায়ের বিশ্লেষণে শৈলবালা ঘোষজায়ার সমসাময়িক কয়েকজন লেখিকার অভিজ্ঞতা, উপলব্ধীর কথা জেনে নেব। এই অভিজ্ঞতা ও উপলব্ধীর উপর ভিত্তি করে তাঁদের ভাবনার মধ্যে কতটা তফাত এই সমস্ত বিষয় তাঁদের সৃষ্ট সাহিত্যের মাধ্যমে দেখে নেওয়ার চেষ্টা করব।

এ প্রসঙ্গে প্রথমে আমরা আবার যদি সাহিত্য জগতের দিকে চোখ রাখি তাহলে দেখতে পাব মুসলিম পরিবারের এক মহিলা বেগম রোকেয়াকে। ইনি চিন্তার জগতে এক আত্মপ্রতিষ্ঠিত ব্যক্তিত্ব। বুদ্ধি মনন এবং দার্শনিক চিন্তা মিলিয়ে তিনি যেন নিজের সময়ের থেকে একশো বছর এগিয়ে ছিলেন। নারীদের অর্থনৈতিক মুক্তি, ধর্মের দোহাই দিয়ে শোষণ এবং শিক্ষার গুরুত্ব প্রভৃতি ছিল তাঁর আগ্রহের বিষয়। এছাড়াও নিজে অবরোধে ছিলেন বলে অবরোধের যন্ত্রণা তিনি খুবই ভালোভাবে বুঝতে পেরেছিলেন এবং সেই

কারণে এই প্রথার বিরুদ্ধে তিনি ক্রমাগত লড়াই করেছেন। রোকেয়ার কাছে শিক্ষা ছিল নারী মুক্তির হাতিয়ার নারী পুরুষের বৈষম্য তিনি মানেননি। মেয়েরা সমাজের অর্ধাঙ্গ আর এই অর্ধাঙ্গ ছাড়া বিকলাঙ্গ সমাজের উন্নতি যে কোনোমতেই সম্ভব নয় একথা তিনি নানাভাবে বলেছেন। পণ প্রথা এবং বাল্য বিবাহের বিরোধী ছিলেন তিনি। নারীর ভোটাধিকার ও সম্পত্তির অধিকারের জন্যও তিনি লড়াই করেছেন সমাজের বিরুদ্ধে। পাশাপাশি ছিল তাঁর নিখাদ দেশপ্রেম।

রোকেয়ার ষোলো বছরে বিবাহ হয় সাখাওয়াত হোসেনের সঙ্গে। স্বামীর প্রেরণায় তিনি ইংরাজি ও উর্দু শিখেছিলেন। ভাগলপুরে স্বামীর সঙ্গে থাকার সময় থেকেই রোকেয়া 'নবনূর', 'মহিলা' প্রভৃতি পত্রিকায় কবিতা ও প্রবন্ধ লেখেন। তিনি আঞ্জুমানে খাওয়াতীনে ইসলাম নামে এক মহিলা সংগঠনের সাথে যুক্ত ছিলেন। রোকেয়ার জীবনে ত্রিমুখী ব্যক্তিত্বের প্রকাশ লক্ষ করা যায়—তিনি প্রথমত শিক্ষাব্রতিনী, দ্বিতীয়ত সমাজ সংস্কারক এবং তৃতীয়ত লেখিকা। মুসলিম নারীদের অন্ধত্ব ঘোচাতে গিয়ে তাঁকে বারবার গোঁড়াদের রোষানলে পড়তে হয়েছে, তবুও তাঁর সমাজ, ধর্ম, বিজ্ঞান সম্পর্কে স্বচ্ছ ধারণা তিনি আমাদেরকে দিয়ে গেছেন সাহিত্যের মাধ্যমে। শুধুমাত্র বর্ণ পরিচয় বা প্রাথমিক স্কুলশিক্ষাকে তিনি যথার্থ বলে মনে করেননি। স্ত্রী শিক্ষা বলতে তিনি এমন শিক্ষাকে বুঝিয়েছেন যা তাদের অধিকার সচেতন করে তুলবে, আত্মবিশ্বাস ও আত্মমর্যাদা জাগিয়ে তুলবে এবং স্বাধীনতার প্রেরণা সঞ্চার করবে। তাঁর রচনায় যে বিষয়গুলি প্রাধান্য পেয়েছে তা আলেচনার মাধ্যমে দেখে নেওয়ার চেষ্টা করবো।

'ডেলিশিয়া হত্যা'-য় ইংরেজ কন্যা ডেলিশিয়ার সাথে তুলনায় ভারতবর্ষীয় মজলুমা-র আত্মমর্যাদা অভাবের কথা উল্লেখ করে রোকেয়া বলেছেন এর প্রধান কারণ স্ত্রী শিক্ষার

অভাব। ডেলিশিয়ার স্বাধীনচেতা মনোভাব ও প্রখর আত্ম মর্যাদাবোধ সম্পর্কে বলতে গিয়ে উচ্চভাব ও সুমার্জিত রুচির প্রসঙ্গে সুশিক্ষার প্রয়োজনের কথা বলেছেন। রোকেয়া 'অর্ধাঙ্গী' প্রবন্ধে শিক্ষাকে অত্যাচার থেকে মুক্তির মহৌষধ বলে জানিয়েছেন। মানসিক ও শারীরিক উভয় শিক্ষার প্রয়োজনীয়তার কথাই তিনি আলোচনা করেছেন, বলেছেন মেয়েদের ব্যায়াম চর্চার প্রয়োজনীয়তার কথাও। শারীরিক শিক্ষার অঙ্গ হিসাবে লাঠি ও ছোরা খেলা শেখার কথাও উল্লেখ করেছেন তিনি। এছাড়া সম্পত্তিতে মেয়েদের ভাগ নিয়েও কথা বলেছেন। তাঁর শিক্ষা সম্পর্কিত ধারণা ছিল গতানুগতিকতার ঊর্ধ্বে। শিক্ষাকে যে তিনি অর্থ উপার্জনের হাতিয়ার হিসাবে দেখেননি তার উল্লেখ পাই 'স্ত্রী জাতির অবনতি' নামক প্রবন্ধে। রোকেয়া মনে করেন সুগৃহিনী হওয়া ও সন্তান লালনের জন্যও শিক্ষার প্রয়োজন। আবার কেবল পুঁথিগত বিদ্যাই নয় নারীদের দেশ ও জাতি সম্পর্কে উদ্বুদ্ধ করে তোলাও শিক্ষার অন্যতম উদ্দেশ্য। শিক্ষার লক্ষ্য কেবল পেশাজীবী মানুষ গড়া নয় সত্যকার মানুষ গড়া। এই প্রবন্ধে নারী পুরুষের সমানাধিকারের কথাও বলেছেন তিনি। এখানে শিক্ষাকে তিনি কেবলমাত্র বিমূর্ত ধারণা হিসাবে উপস্থাপন করেননি বা শিক্ষাকে একমাত্র অর্থ উপার্জনের হাতিয়ার হিসেবেও দেখেননি। প্রবন্ধে শিক্ষাকে তিনি নিম্নোক্ত ভাবে ব্যাখ্যা করেছেন-

> "শিক্ষার অর্থ কোন সম্প্রদায় বা জাতি বিশেষের অন্ধ অনুসরণ নহে। ঈশ্বর যে স্বাভাবিক জ্ঞান বা ক্ষমতা দিয়াছেন, সেই ক্ষমতাকে অনুশীলন দ্বারা বৃদ্ধি করাই শিক্ষা। ... যদি আমরা অনুশীলন দ্বারা হস্তপদ সবল করি, হস্ত দ্বারা সৎকার্য করি, চক্ষু দ্বারা মনোযোগ সহকারে দর্শন করি, কর্ন দ্বারা মনোযোগ পূর্বক শ্রবণ করি এবং চিন্তাশক্তি দ্বারা

আরও সূক্ষ্মভাবে চিন্তা করিতে শিখি—তাই প্রকৃত শিক্ষা। আমরা

কেবল পাস করা বিদ্যাকে প্রকৃত শিক্ষা বলি না।" [১১]

এছাড়াও এই প্রবন্ধে তিনি নারীরা এই যে অত্যাচার ভোগ করে তার কারণ দেখাতে গিয়ে বলেন এরা অত্যাচারিত হতে হতে যেন এটা অভ্যাসে দাঁড়িয়ে গেছে তাঁদের। তাই সমস্ত কিছু থেকেই রেহাই পাবার জন্য নারীর আগে সচেষ্ট হওয়া দরকার একথা স্পষ্ট জানান তিনি। তাঁর 'অবরোধ বাসিনী' প্রবন্ধটি প্রকাশ পায় ১৯৩১ সালে। এই প্রবন্ধে তিনি পর্দাপ্রথার কথা বলেছন এবং দেখিয়েছেন এটা এতটাই প্রবল যে গৃহে কেউ আগুনে পুড়ে মরলেও ঘরের বাইরে বেরোতে পারবে না। এই প্রথা নারী নিপীড়নের একটি শক্তিশালী হাতিয়ার। এ বিষয়ে তিনি খুবই সচেতন ছিলেন। পর্দার নামে নারীদের গৃহবন্দী করে রাখার যে ব্যবস্থা সেই অবরোধ থেকে মুক্ত হওয়া নারী মুক্তির অন্যতম একটি শর্ত। প্রচলিত পর্দা প্রথার বিরুদ্ধে অবরোধ বাসিনী' একটি প্রতিবাদ। ভবিষ্যৎ বংশরক্ষার জন্য রোকেয়া বাল্যবিবাহ রোধ করার কথা বলেছেন। নারী সমাজ দীর্ঘদিন যাবৎ পুরুষতন্ত্রের শাসন ও শোষণের অধীন থেকে পুরুষতন্ত্রের অন্যায় বিধি-বিধানকেই নিজের অভ্যাসে পরিণত করে ফেলেছে। আর এ কারণেই নারীসমাজ নিজের শক্তি ও সাহস নিয়ে দাঁড়ায় না। তারা ক্রমে পুরুষের দাসে পরিণত হয়েছে। তবে যাই হোক বাল্যবিবাহ রোধ করার কথা বলার মধ্যে দিয়ে সমাজকে নিয়ে রোকেয়ার চিন্তা লক্ষ করা যায়। তিনি বাংলাদেশের শিশু মৃত্যুর হার দেখে বিচলিত হয়ে প্রতিকারের পরামর্শ দিয়েছেন—

"আমাদের ভবিষ্যৎ বংশ রক্ষার জন্য দুটি বিষয় দরকারী হয়ে

পড়েছে দেখছি। প্রথম স্ত্রী শিক্ষার বহুল প্রচার; দ্বিতীয়

বাল্যবিবাহ রহিত করা।" [১২]

এরকম করে স্ত্রী শিক্ষার কথা ও অবরোধ প্রথার বিরুদ্ধে কথা বলতে গিয়ে রোকেয়া তাঁর অনেক রচনায় শাস্ত্রীয় বচন উদ্ধৃত করেছেন। তবে এরই পাশাপাশি দু-একটি রচনায় তিনি যে যুক্তিবাদ, মুক্ত দৃষ্টি ও সাহসিকতার পরিচয় দিয়েছেন তার তুলনা আজকের দিনেও বিরল।

১৯০৪ থেকে ১৯০৮ সালের মধ্যে স্বামীর জীবিত অবস্থায় রোকেয়ার 'সুলতানার স্বপ্ন' প্রকাশ পায়। তিনি নারীর নিজস্ব দক্ষতা ও শক্তিতে বিশ্বাসী ছিলেন এবং নারীসমাজের মধ্যে সেই অবস্থা জাগাতে চেষ্টা করেছিলেন। এর অন্যতম প্রমাণ বেগম রোকেয়ার 'সুলতানার স্বপ্ন' সেখানে সামাজিক, রাজনৈতিক ব্যবস্থার বর্ননা দিয়েছেন যা পুরুষ শাসিত ব্যবস্থার চেয়ে অনেক উত্তম।

তাঁর 'পদ্মরাগ' উপন্যাসটি প্রকাশ পায় ১৯২৪ সালে। এই উপন্যাসের নায়িকা সিদ্দিকা ওরফে জয়নবের কথা থেকে বেগম রোকেয়ার নারীর অর্থনৈতিক স্বাধীনতা বিষয়ক মতবাদের সুস্পষ্ট পরিচয় পাওয়া যায়। সিদ্দিকার প্রতিটি বক্তব্য মুক্ত বুদ্ধির পরিচায়ক, বৈধ ও যুক্তিসঙ্গত এবং তিনি নিজস্ব-অধিকার সম্পর্কে সচেতন। এখানে নায়িকা যখন বলেন—

> "আমি সমাজকে দেখাইতে চাই একমাত্র বিবাহিত জীবনই নারী জন্মের চরম লক্ষ্য নহে, সংসার ধর্মই জীবনের সারধর্ম নহে।" [১৩]

তখন বুঝতে অসুবিধা হয় না যে সিদ্দিকার এই বক্তব্য আসলে রোকেয়ারই বক্তব্য।

বাঙালি সমাজে প্রচলিত বরপণ গ্রহণের রীতিকে রোকেয়া বিদ্রূপ করেছেন। পণপ্রথা আজকের দিনেও আমাদের সমাজে প্রচলিত। আর এই পণপ্রথাকে কেন্দ্র করে 'নিরীহ বাঙালী' প্রবন্ধে লিখছেন—

> "আমাদের অন্যতম ব্যবসায় পাশ বিক্রয়। এই পাশ বিক্রেতার নাম
>
> 'বর' এবং ক্রেতাকে শ্বশুর বলে। এক একটি পাশের মূল্য কত
>
> জান? অর্ধেক রাজত্ব ও এক রাজকুমারী।" [১৪]

এখানে তিনি বলেছেন নিরীহ বাঙালি এখন আর নিরীহ নেই সাহসীতে পরিণত হয়েছে। এখানে বরপণের পাশাপাশি স্বদেশী আন্দোলনের ইঙ্গিত স্পষ্ট। তাঁর 'মতিচুর'-এর 'সৃষ্টিতত্ত্ব' গল্পে আছে সত্যাগ্রহের উল্লেখ।

'জ্ঞানফল ও মুক্তিফল' নামক রূপকথায় সাময়িক ও রাজনৈতিক নানা বিষয়ের প্রতিবিম্ব আছে। রূপকের খোলস ছাড়িয়ে দেখলে বোঝা যায় 'জ্ঞানফল' গল্পে লেখিকা বর্ণিত 'কনক দ্বীপ'-টি আসলে ভারতবর্ষ। আর বিরাট সাগরের পরপারের সেই 'পরী স্থান' হল ব্রিটেন, 'জিন বনিক'-রা আর কেউ নয় ব্রিটিশ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানী। ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর অর্থনৈতিকশোষণের এই প্রক্রিয়ার পাশাপাশি ভারতবর্ষের জাতীয় জাগরণে ইউরোপীয় জ্ঞান বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির সদর্থক অবদান সম্পর্কেও লেখিকার সচেতনতার পরিচয় পাওয়া যায়। মুক্তিফল' গল্পে শতপুত্রের জননী আসলে শৃঙ্খলিত দেশমাতা। ১৯০৭ সালে সুরাট অধিবেশনে দলের সভাপতি নির্বাচনকে কেন্দ্র করে চরমপন্থী ও নরমপন্থীদের মধ্যে বিরোধে চরমপন্থীদের জয় হয়। এখানে আবেদন নিবেদনের চাটুকারবৃত্তিধারী নরমপন্থিদের বিদ্রূপ করেছেন প্রবীণ চরিত্রটির মধ্যদিয়ে। স্বরাজলাভ সম্পর্কে অনাস্থা গল্পের অন্যান্য অংশে দেখা যায়। আর ধীমান চরিত্রের

মাধ্যমেই রোকেয়া যেন বলতে চেয়েছেন কাঁটার ভয়ে পশ্চাদপদ হলে চলবে না, সবকিছু উপেক্ষা করে এগিয়ে যেতে হবে। এছাড়া 'নিরুপম বীর' (১৯২৯) ও 'আপীল' কবিতার মধ্যেও তাঁর দেশপ্রেমের প্রকাশ লক্ষ করা যায়। এমনকি তাঁর বিজ্ঞান চেতনারও প্রকাশ লক্ষ করা যায় তাঁর কিছু গ্রন্থে। চিন্তার অচলায়তন সম্পর্কে সংশয় প্রকাশই হল তাঁর বিজ্ঞান চেতনার সবচেয়ে বড় পরিচয়। বুদ্ধিকে তিনি শ্রেষ্ঠত্বের মাপকাঠি বলেছেন। এই বুদ্ধির কথা বলতে গিয়ে অনেকে বলেন নারীদের বুদ্ধি কম যেহেতু পুরুষদের থেকে তাদের মাথা ছোটো। এই ধারনা যে ভুল তার প্রমাণ দিতে হাতির প্রসঙ্গ এনে রোকেয়া বলেছেন যে হাতির মাথা তো মানুষের মাথার থেকে বড় তবে তার বুদ্ধি কম কেন? এখানেই তাঁর বিজ্ঞান মনস্কতার পরিচয়। এভাবেই রোকেয়া তাঁর প্রতিবাদী ও সংশয়ী মনের ওপর ভর করে হয়ে উঠেছিলেন পরিপূর্ণ এক ব্যক্তিত্ব।

পরবর্তী আরও একজন সমসাময়িক লেখিকা হলেন অনুরুপা দেবী। তিনি স্বনামধন্য লেখক ভূদেব মুখোপাধ্যায়ের নাতনি। জন্মসূত্র থেকেই পাওয়া পরিবার ও তাঁর মামাবাড়ির পরিবার ছিল সাহিত্য জগতের সঙ্গে যুক্ত। তাই লেখাপড়া ও সাহিত্যচর্চার ক্ষেত্রে ততটা বেগ পেতে হয়নি তাঁকে। মাত্র ১০ বছরে বয়সে তাঁর বিয়ে হয়ে গেলেও শ্বশুরবাড়ির পরিবেশে তার জীবনে বাধা আসেনি। তাই এই পরিবেশ প্রাপ্তি ও নিজের আগ্রহে তিনি শিক্ষা গ্রহণ করেছেন। তার এই সুশিক্ষা, সাহিত্যচর্চা ও লেখালিখির হাত ধরে তিনি বাংলা সাহিত্যকে দিয়ে গেছেন- 'পোষ্যপুত্র' (১৯৩২), 'বাগদত্তা' (১৯১৪), 'মন্ত্র শক্তি' (১৯১৫), 'জ্যোতিঃহারা' (১৯১৫), 'মহানিশা' (১৯১৯), 'মা' (১৯২০), 'পথহারা' (১৯২২), 'গরিবের মেয়ে' (১৯২৬) ইত্যাদির মত বিশিষ্ট কয়েকটি উপন্যাস।

এই সমস্ত লেখাগুলিতে উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধ ও বিশ শতকের প্রথম দুই দশক এইসময় পর্বের ছাপ লক্ষ করা যায়। ধনী জমিদার, মধ্যবিত্ত শ্রেণী তার রচনায় নির্মিত চরিত্র। তার রচনা সম্পর্কে শ্যামাপ্রসাদ সরকার যে মতামত রেখেছেন তা হল -

"আদর্শবাদী অনুরুপা ছিলেন স্পষ্টভাষী, অনেক অপ্রিয় কথা প্রকাশ্যে বলতে তিনি দ্বিধা করতেন না যে আত্মপ্রত্যয় নিয়ে জন্মেছিলেন- তাঁর রচিত সাহিত্যে সেই সুর ধ্বনিত হয়েছে।" ১৫

তাঁর লেখা সাহিত্যের অল্প বিস্তার বিশ্লেষণ করলে তাঁর উপলব্ধির জগতকে চিনে নিতে পারব। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে তাঁর দেওয়া এক বক্তৃতা যা পরবর্তীকালে 'সাহিত্য ও সমাজ' প্রবন্ধ গ্রন্থের মধ্যে 'ভারতীয় সাহিত্যে ভারতীয় সমাজের আদর্শ' নামে স্থান পেয়েছিল সেখানে তিনি সমাজ ও সাহিত্যের মধ্যে সম্পর্ক নিয়ে কথা বলেছেন এবং সেখানে সনাতন ঐতিহ্যের প্রতি একটা সমর্থন দেখা গেছে। তাঁর কিছু রচনা আলোচনা প্রসঙ্গে এগুলি আরো স্পষ্ট করে বোঝা যাবে।

প্রথমেই 'পোষ্যপুত্র' উপন্যাসের বিষয়ে চোখ রাখলে দেখতে পাব- সংসার জীবনযাত্রা ও স্বামীকে প্রবল ভক্তির ছবি। সেখানে বিনোদ চরিত্র আধুনিক মনের অধিকারী তাই সে শিক্ষালাভ করে অন্ন সংস্থানের জোগাড় করার উদ্দেশ্যে পিতার সঙ্গে বিরোধ করে বাড়ির বাইরে বের হয়ে যায়। প্রথমে গন্তব্যহীন অবস্থায় ঘুরে বেড়ানোর পর অসুস্থ হয়ে শিবানী নামের চরিত্রের বাড়িতে আশ্রয় নেয় এবং পরে নিজেকে নীরদ কুমার বলে পরিচয় দেয়। সেদিন শিবানীর মাও অনুপস্থিত। বাড়ি ফিরে মা একটু রাগ করলেও ছেলের হাতে হীরার আংটি আছে দেখে ঘরজামাই করার অভিলাষ জন্মায় মনে। অনেক দ্বিধাদ্বন্দ্বের পর শিবানী ও নীরদ কুমারের বিয়ে হয়ে যায়। পরে পাত্রের কোন সহায় সম্বল নেই জেনে শিবানীর মায়ের সঙ্গে মনোমালিন্য হয় এবং বাড়ি ছেড়ে চলে যায় নীরদ।

তখন থেকে স্বামীর কোনো খোঁজ না পেলেও শিবানী শাঁখা সিঁদুর ত্যাগ করেনি পাছে স্বামীর অকল্যাণ হয়। এই ভাবনার বশেই এই ভাবেই প্রতিব্রতা নারীর স্বামী নামের এই ভাবনার প্রতি অগাধ ভক্তি দেখা যায়। তাইতো কেবল স্বামীর স্মৃতি নিয়ে কাটিয়ে দেবার বহুদিন পর যখন স্বামীর অসুস্থতার খবর পাঠানো চিঠি পায় তখন তাকে সংশয় নিয়ে বলতে শোনা যায়-

"যদি এ বিশ্বাস আমার ভেঙ্গে যায়, যদি সত্য জানতে পারি,

আমি - আমি - বিধবা, তবে কি নিয়ে থাকবো শান্তি।" ১৬

এই ভাবেই শুধুমাত্র বিয়ে হয়েছে এবং নীরদ কুমার তার স্বামী এই কথা মনে রেখেই তার জীবন কেটে যায়। আর কোনো দায়িত্বই তার স্বামী নেয়নি। তবুও তার স্বামী অন্ত প্রাণ দেখা গেছে। এবং স্বামীর সঙ্গে দেখা হওয়ার দৃশ্য দিয়ে রচনা শেষ এই ভাবেই সনাতন ঐতিহ্যের প্রতীক হিসাবে শিবানী চরিত্র কে প্রতিষ্ঠা করে লেখিকা তার নিজের অন্তরে যে ওই আদর্শকে পোষণ করেছেন তার প্রকাশ ঘটতে দেখা গেল।

এরপর 'মহানিশা' উপন্যাসে অভাবের সংসারে কন্যা জন্মানোর যে পরিণাম তা দেখা যায়। দরিদ্র মা সৌদামিনী অপর্ণা কে জন্ম দেয়, সে কোনরকমে বেড়ে ওঠে পরে এক ঘরে চার হাজার টাকার বিনিময়ে তার বিয়ে ঠিক হয় কিন্তু যিনি টাকা দেবেন অর্থাৎ মায়ের দাদা মশাই তিনি মারা যাবার পর টাকা না পাওয়ার কারণে বিয়ে স্থগিত হয়ে যায়। এরপর সৌদামিনীর অসুস্থতা ও তাদের উপর অত্যাচার দেখা গেছে এমনকি কুপাত্রে জোরপূর্বক অপর্ণার বিয়ে দেবার মত ভাবনাও করেছে আত্মীয় স্বজনরা। তবে যাই হোক সব কিছুর বাইরে গিয়ে নায়িকা অপর্ণা যখন অপছন্দের পাত্রকে বিয়ে করতে নারাজ তখন সেই অনিচ্ছা সবার সামনে প্রকাশ করে এবং বাড়ি থেকে বেড়িয়ে যায়। এই যে

বিয়েকে কেন্দ্র করে সেই সময়ে নিজের মত প্রদান সত্যই অভিনবত্ব দান করে লেখায়। এমনকি এখানে মেয়ে বলে সম্পত্তির অধিকারেও আসে বাধা। যে কারণেই মায়ের দাদা মশাইয়ের সম্পত্তিও তারা পায়নি সেকথা স্পষ্ট হয় যখন বেহারী (দাদা মশাইয়ের চাকর) বলে-

> "যথার্থ উত্তরাধিকারী বিহীন এর একমাত্র দৌহিত্রীও
>
> মাতামহের অতুল সম্পত্তির এক কণা স্পর্শ যোগ্য নহে।
>
> সে অধিকার পাইবে কে কোথাকার চির অপরিচিত জ্ঞাতি সন্তান।" ১৭

বোঝাই যাচ্ছে সম্পত্তির অধিকারী মেয়েদের তখনও হস্তক্ষেপ করার মত কোনো আইন আসেনি। অপর্ণা এ বিষয়ে প্রতিবাদ জানালেও অর্থনৈতিকভাবে স্বাবলম্বী না হওয়ার কারণে সেই প্রতিবাদও কোন মাত্রা পায়নি সেদিন। এখানে পরবর্তী বর্ণনায় অপর্ণার নির্মল নামের চরিত্রের সঙ্গে বিয়ে দেখানো হয় কিন্তু নির্মল কাজ-কর্মের ক্ষেত্রে আরেক জন্মান্ধ কন্যা ধীরাকে বিয়ে করে। পরে ধীরা সব জানতে পেরে নির্মলকেই স্বামী মানে এবং মৃত্যুকে বেছে নেয়। এক্ষেত্রে ধীরা চরিত্র কে কেন্দ্র করে তার পিতা সম্পত্তি বিভাজনের ক্ষেত্রে অভিনব ভাবনার প্রকাশ করেছেন। তিনি জন্মান্ধ কন্যার জন্য উইল করে সম্পত্তি ভাই ও বোনকে সমানভাবে ভাগ করে দিয়েছিলেন। এই ভাবেই এই রচনায় নারীর প্রতিবাদ, সম্পত্তির অধিকার, পণপ্রথা, মেয়েদের স্বাবলম্বী হওয়ার ভাবনা এই সমস্ত কিছু দেখিয়েছেন লেখিকা।

'মা' উপন্যাসও খুব জনপ্রিয়। এখানেও মনোরমা চরিত্রের মধ্য দিয়ে স্বামীর প্রতি একাগ্রতা ও ভক্তির ছবি দেখা যায় পূর্বের উপন্যাসের মতো। মনোরমাকে পণের টাকা শোধ না হওয়ার জন্য বাপের বাড়ি পাঠিয়ে দিয়ে পুনরায় বিয়ের ঘটা দেখা যায়। মনোরমার

বাচ্চা পর্যন্ত হলেও তার প্রতিও বাবা হিসাবে কোনো কর্তব্য পালন দেখা যায়নি। তবুও মৃত্যু শয্যায় স্বামীকে দেখার জন্য আকুল থাকে মনোরমা। এখানেই স্বামী নামক ভাবনায় সনাতন আদর্শকেই প্রাধান্য দিয়েছেন লেখিকা। এদিকে ব্রজরানীও মনোরোমার সন্তানের কাছে মা ডাক শোনে এবং মাতৃত্বের স্বাদ পায়, যা তার কাছে শ্রেষ্ঠ। এভাবেই মাতৃত্ব ও স্বামীর প্রতি ভক্তি প্রাধান্য পায় মেয়েদের জীবনে। রামায়ণের যুগের সীতা থেকে মনোরমা এরা প্রত্যেকেই যেন দুঃখ পাবে দুঃখ ভোগ করবে তবুও স্বামীর কোন বিষয়ে প্রতিবাদ জানানোর ভাষা বেরোবে না। এখানেই লেখিকার পুরানো ঐতিহ্যকে লালন করার মত মানসিকতা প্রকাশ পায়। এই অনুরূপ ভাবনার পুনরাবৃত্তি দেখা যায় 'গরিবের মেয়ে' উপন্যাসের নীলিমা চরিত্রের মধ্যে দিয়ে। তবে এখানে নীলিমার স্বামী তার সঙ্গে না থাকলেও নীলিমা বাবার জমানো টাকার অধিকার পেয়ে একটা স্কুল খুলে জীবন কাটিয়ে দেবার কথা ভেবেছে। এই ভাবনার মধ্য দিয়েও লেখিকা একা থাকার মধ্যে দিয়েও জীবনে পূর্ণতা দেখিয়েছেন যা এককথায় অনবদ্য। এই ভাবেই পণপ্রথা, সতীন সমস্যা, পুরুষের বহুবিবাহ, স্বামীর প্রতি ভক্তি, মাতৃত্বকে শ্রেষ্ঠ ভাবা, নববধুর প্রতি শাশুড়ির আধিপত্যের আকাঙ্ক্ষা, সন্তানহীনার প্রতি সমাজের নিষ্ঠুর ব্যবহার, স্ত্রীর প্রতি পুরুষের অবহেলা, অসবর্ণ প্রেম সম্পর্ক কল্পনা না করা, একক জীবনে নারীর পূর্ণতা, জাতি, বর্ণ প্রথার প্রতি একনিষ্ঠতা দেখা যায়। তাঁর রচনার মধ্যে তবে কোথাও জাতিগত ভেদের কারণে মানুষে মানুষে ভেদ আনেননি। এখানেই তার উদার মনোভাবের পরিচয় পাঠকের কাছে উপস্থিত হয়।

এরপর নিরুপমা দেবীর সাহিত্যে তার ভাবনার ছবি দেখে নেবার চেষ্টা করব। বহরমপুরে তার পিতার বাড়ি শ্বশুরবাড়ি নদিয়া জেলার সাহারবাটি গ্রামে। দুই বাড়ি থেকেই পেয়েছেন সাহিত্যচর্চার পরিবেশ। তবে বাল্যবিধবা নিরুপমা বাবার বাড়িতে

পেয়েছে ভালোবাসা ও স্বাধীনতা। নিজের মায়ের সেবা যত্ন যেমন করেছেন শাশুড়ির সেবাযত্নও করেছেন। এইভাবেই নিজের কাজ কর্মের বাইরেও বাংলা সাহিত্যকে তাঁর বহু রচনায় সমৃদ্ধ করেছেন। এখন সেগুলোই বিশ্লেষণের মাধ্যমে সমাজের কোন বিষয় তাঁর হৃদয়কে নাড়া দিয়েছে তা দেখে নেওয়ার চেষ্টা করব।

তিনি কবিতা, উপন্যাস, ভ্রমণ কাহিনী নানা ধরনের লেখাতেই দক্ষতা দেখিয়েছেন। এখন আমরা তাঁর 'অন্নপূর্ণার মন্দির' (১৯১৩) উপন্যাসটি আলোচনার মাধ্যমে তাঁর ভাবনা-চিন্তা গুলি জেনে নেওয়ার চেষ্টা করব। ধনী, উদার মনের যুবক বিশ্বেশ্বরের চেষ্টায় দরিদ্র ব্রাহ্মনের চাকরি বাঁচে। এমন অবস্থায় প্রাণ বাঁচে বটে কিন্তু মাথার উপর কন্যার বিয়ের চিন্তা এসে হাজির হয়। অনেক খুঁজে নবগ্রামবাসী তিনকড়ি লাহিড়ীকে তিনশত টাকা পণের বিনিময়ে বিয়ে দিতে গিয়ে বসতবাড়ি বিক্রি করতে হয়েছে দরিদ্র ব্রাহ্মণকে। এত ঝামেলা করে বিয়ে দেবার পর মেয়ে সংসার, স্বামী এইসব কিছু বুঝে ওঠার আগেই বিধবা হয়ে ফিরে আসে। এই পরিস্থিতিতে যার বিয়ের মতো পরিস্থিতি বোঝার ক্ষমতা নেই, সে বিধবা হলেই বা কি অনুভূতি হবে। তাই সে যখন স্বামী মারা গেলেও কোন শোক প্রকাশ না করে তাতেও নানা কথা শুনতে হয়েছিল তাকে। এই উপন্যাসে বিশ্বেশ্বর ও তার মাসিমা সতীর সঙ্গে বিশ্বেরশ্বরের পুনরায় বিয়ের কথা ভাবলেও রচনাতে কিন্তু শেষ পর্যন্ত বিয়ে দেখা যায় না। এইখানেই কোথাও গিয়ে লেখিকা সেই পুরানো ভাবনা থেকে যেন বেরোতে পারে না তাই এড়িয়ে গেছেন। এরপরে সতীর বাবার মৃত্যু ও মায়ের অসুস্থতার কারণে যখন সংসার চালানো দায় হল তখন নরেন ভাদুড়ীর কুপ্রস্তাবে রাজি হয়ে সংসার বাঁচিয়ে নিজে আত্মহত্যা করে। পরে অবশ্য সে টাকা বিশ্বেশ্বর শোধ করে দিয়েছিল। বিশ্বেশ্বর এমনকি সাবিত্রীর বিয়ের ব্যাবস্থা করলেও পাত্রীর দিদি আত্মহত্যা করেছে শুনে পাত্রপক্ষ নানা কুকথা বলে এবং পণ বেশি চায়। এসব ঘটনার পর সাবিত্রীকে

বিশ্বেশ্বরই বিয়ে করে নেয়। এভাবেই বিয়ে না হলে জাত যাওয়ার প্রসঙ্গ, আর্থিক স্বচ্ছলতা না থাকায় নানান সমস্যার মধ্যে পরে আত্মহত্যার পথ বেছে নেওয়ার ছবি দেখা যায় এই উপন্যাসে।

'দিদি' (১৯১৫) উপন্যাসের কেন্দ্রীয় চরিত্র সুরমাকে কেন্দ্র করে সংসার জীবনে নানান বাদ বিবাদ, ভাললাগা, মন্দ লাগা, আভিমান প্রভৃতি বিষয়গুলো দেখানো হয়। এই রচনাটির মধ্যে নারী মনের নানান ভাবনাকে দেখিয়েছেন। নায়ক অমর তার বাড়ি থেকে ঠিক করা পাত্রী সুরমাকে প্রথম বিয়ে করেছেন, পরে কলকাতায় ফিরে চারুলতাকে তার মার মৃত্যু শয্যায় বিয়ে করার প্রতিশ্রুতি দেয়। প্রথমে চারুর কথা বাড়িতে জানাবে ভাবলেও, বলতে না পেরে চারুকে সঙ্গে নিয়ে কলকাতায় ভাড়া বাড়িতে থাকতে শুরু করেছিল। এভাবে থাকার কিছুদিন পর চারুকে সঙ্গে নিয়ে বাড়িতে গেলে সুরমার মনে কষ্টের শুরু হয়। এখানে চারুকে বোন ভাবলেও অমরের প্রতি সুরমার প্রচন্ড রাগ ছিল, তবে সেই রাগের বহিঃপ্রকাশ কম ছিল। একদিন অমর তার বাবার জমিদারি দেখাশোনার দায়িত্ব সুরমার উপর দিতে চাইলে তা মেনে নিতে না পেরে প্রচন্ড ক্ষোভে তাকে বলেছিল-

> " তুমি এখনো আমার কেউ নও, কখনো কেউ ছিলেও না" ১৮

এই উক্তিতে অমরের প্রতি রাগপ্রকাশ পায়, এমনকি অমরের কথায় তার মনে আঘাত লাগার বিষয় অমরকে স্পষ্ট করে জানিয়ে দেয় এবং চারুর প্রতি শ্রদ্ধায় তাকে চরিত্রবান ভাবতো এটাও সে জানিয়ে দেয়। এই ভাবেই এখানে বহু বিবাহের প্রসঙ্গ ও সুরমার প্রতিবাদ দেখা গেছে সুরমা কিন্তু শুধু প্রতিব্রতা নারীর মতোই আচরণ করেনি তিনি অধিকারের বিষয়ে তার কণ্ঠে প্রতিবাদের ভাষা শোনা গেছে। এত স্পষ্ট উত্তর, প্রতিবাদ, তখনই ফিকে হয়ে যায় যখন স্বামীর ঘরে গিয়ে এসব কথা বলার জন্য ক্ষমা চায়। প্রথমের

প্রতিবাদী সুরমা আর শেষের সুরমা যেন আলাদা ভাবমূর্তির আকার নেয়। এই সুরমা চরিত্রে আধুনিকতা আধুনিক মন লক্ষ করা যায়, বিধবা উমা চরিত্র যখন বিধবাদের কি কি পড়তে নেই জানতে চায় তার উত্তরে বয়স্ক বিধবারা নিয়ম মানবে, আর উমার মতো বিধবাদের মানতে হবে না বলে জানিয়ে দেয় তখনই তার মন কতটা আধুনিক বোঝা যায়। আবার মন্দাকিনী ও প্রকাশ চরিত্রের বিয়ের প্রসঙ্গে মত জানতে চাওয়ার মধ্যেও আধুনিকতার প্রকাশ দেখা যায়। এইরকম ভাবেই বিধবার বিবাহ প্রসঙ্গ উঠলেও শেষ পর্যন্ত বিয়ে দেখা যায় না, যার দ্বারা দ্বিধার প্রকাশ ঘটলো এখানেও পুরানো ধারণার প্রতি সমর্থন দেখা গেল তবে বিয়েতে মতামত জানতে চাওয়াতে অভিনবত্ব আছে।

'শ্যামলী' উপন্যাসে দেখা যায় দুই বোন শ্যামলী ও বিজলিকে কেন্দ্র করে রচনা বিস্তার লাভ করেছে। বড় মেয়ে বোবা তাই বিয়ে হয় না, এই অবস্থায় বড় মেয়েকে রেখে ছোট মেয়ের বিয়ের কথা ভাবাও সমাজ বিরুদ্ধ কাজ তাই এইরকম সমস্যায় পড়ে বাবার নাজেহাল অবস্থা। এক ঘরে হয়ে যাবার ভয়ে লুকিয়ে বিয়ের দিন প্রথমে বড় মেয়ে শ্যামলীর সঙ্গে পাত্র অনিলের বিয়ে দেয়। পরে জানাজানি হলে বাবা সমস্ত সমস্যার কথা বিস্তারিত জানিয়ে পরের লগ্নে ছোট মেয়ের সঙ্গে বিয়ে দিতে রাজি হয় তবে পাত্র অনিল শ্যামলির সঙ্গে বিয়েটাকে ছেলে খেলা ভাবেনি। তাঁকে মেনে নেয় স্ত্রী হিসাবে এবং পরে তার চিকিৎসার ব্যবস্থা করে। শ্যামলীর সুস্থ হয়ে ওঠা ও মা হওয়ার দৃশ্য আছে রচনায় আর স্বামী অনিলের উদার ও আধুনিক মনের পরিচয় আছে, যা দেখে পাঠকের মনে অনিলের প্রতি শ্রদ্ধা জাগে এইভাবে এখানে সমাজবিধানের নিষ্ঠুর ছবি দেখা যায়। এই রকম মানুষ যে চিকিৎসা পেলে সুস্থ হতে পারে এবং স্বাভাবিক জীবন যাপন করতে পারে এই ভাবনা সেই সময়ে লেখিকার মনে হয়েছিল যা অত্যন্ত আধুনিক মনকে প্রকাশ করে। এসব কিছুর ভিত্তিতে একথা মনে হয় সমস্ত ঘটনার বিবরণে লেখিকা কোথাও সমাজবিধান

লংঘন করে তার বিরোধিতা করার মতো কোনো ঘটনা দেখান নি, কোনরকম প্রতিবাদও করেননি। এখানে কোথাও গিয়ে সেই পুরাতনের সঙ্গে তাল মিলিয়ে চলার মানসিকতা দেখা গেল।

এরপর শান্তা দেবীর সময়কাল এর দিকে একটু চোখ রাখব। ১৮৯৩ থেকে ১৯৮৪ খ্রিষ্টাব্দ এই সময়কালের মধ্যে তিনি সাহিত্যের নানা রকম কাজকর্ম করেছেন আর সেই সাহিত্য আমরা পড়ে সমৃদ্ধ হয়েছি। বাবার কাজের সূত্রে এলাহাবাদ কনভেন্ট স্কুলে পড়াশোনা করেছে, শৈশবের অনেকটা সময় ওই এলাহাবাদেই কেটেছে শান্তা দেবীর। সীতাদেবী, শান্তা দেবী দুই বোন ছিলেন, পিতা হলেন রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় বিশিষ্ট প্রবাসী পত্রিকার সম্পাদক ছিলেন। প্রবাসী পত্রিকার প্রতিষ্ঠাতা হওয়ার দরুন বাড়ির পরিবেশে পড়াশোনার ধারা বজায় ছিল। সীতা এবং শান্তা দেবীর ছোট থেকেই বিভিন্ন সাহিত্যের সঙ্গে যুক্ত লোকজনদের সঙ্গে পরিচিতি গড়ে উঠেছিল। আর ব্রাহ্ম পরিবারে জন্ম হওয়ার জন্য তাদের মধ্যে অতটা বাধা ধরা কঠোর নিয়ম ছিল না। তারপরে এলাহবাদে বেড়ে উঠলেও মাঝে মাঝে কলকাতাতেও ফিরতেন এমনকি গ্রামের বাড়ি বাঁকুড়া সেখানেও যেতেন। সেই বাড়িতে তারা দিনযাপন করতেন স্কুল এবং কলেজ জীবন খুব উজ্জ্বল ছিল, পড়াশোনায় তারা খুবই কৃতিত্ব দেখিয়েছেন এবং বিভিন্ন রকম পুরস্কার পেয়েছেন পড়াশোনার জন্য। এমনকি বাড়ির পরিবেশ যেহেতু পড়াশোনার চল ছিল সেই সূত্রে বিভিন্ন শিল্পী এবং সাহিত্যের লোকজনদের সঙ্গে তাদের পরিচিতি ছিল। আঁকা, গান, বাদ্যযন্ত্র ইত্যাদি নানান কিছু শিখেছিলেন শান্তা দেবী। রবীন্দ্রনাথের কাছে সাক্ষাতে দেখা করার সুযোগ পেয়েছিলেন এবং পরিবারগত সূত্রে তাদের সাথে একটা পরিচিতি ছিল। তাঁর বিয়ের সময় পুরোহিত হিসাবে থাকার জন্য রবীন্দ্রনাথকে বলা হলেও পরবর্তীকালে তিনি সম্পন্ন করতে না পারায়, ডক্টর নীলরতন সরকার তার বিয়ের পৌরহিত্য

করেছিলেন। এইভাবে পড়াশোনার একটা পরিবেশে তিনি বেড়ে উঠেছিলেন, বিভিন্ন নারী প্রগতিমূলক এবং নারীর উন্নয়নের জন্য নানা আন্দোলনের কাজের সাথে তিনি যুক্ত ছিলেন। দেশ প্রেম তাঁর মধ্যে অত্যন্ত ছিল তাই তিনি দেশের কাজের জন্য বাইরে বেরিয়ে ছিলেন, বঙ্গভঙ্গ অরন্ধন প্রভৃতি নানা রকম উৎসবে তিনি যোগদান করেছিলেন। এই ভাবেই তিনি সাহিত্যচর্চা করতে থাকেন এবং বিভিন্ন লেখালেখিও করতে থাকেন। তাঁর লেখালিখির হাত ধরে আমরা যে রচনাগুলো পাই তাদের মধ্যে প্রথম একটি হল 'দুহিতা'। এই দুহিতা উপন্যাসে তিনটি প্রজন্মের মধ্যে ভাবনার তফাত দেখানো হয়েছে। ছেলে ও মেয়ের মধ্যে বৈষম্য নিয়ে ভেদাভেদই ছিল এই গল্পের বিষয়। কেন্দ্রীয় চরিত্র নারায়নী আর এই নারায়ণীকে কেন্দ্র করে তাদের তিনটে প্রজন্মের কাহিনীকে রচনায় দেখানো হয়েছে। নারায়নী পীতাম্বরের কন্যা ছিলেন, পিতা পুত্র সন্তান ও কন্যা সন্তানের মধ্যে একটা ভেদাভেদ করতেন এবং সেই সমস্যাটা তিনটে প্রজন্মের মধ্যে কিভাবে পার্থক্য তৈরি করছে, কিভাবে আলাদা ভাবনাচিন্তা তৈরি করছে সেটাই উপন্যাসের প্রধান বিষয়। তারপর নারায়ণীর বিয়ে দিয়ে দেয় একটা ধনী পরিবারে। নারায়ণীর বিয়ের পর কাত্যায়নীর বিয়ে একটা কানা ছেলের সঙ্গে ঠিক করে, কিছু টাকা পাওয়ার লোভে এইভাবে এই অসামঞ্জস্য এবং মেয়েদের প্রতি একটা অবহেলা রচনায় দেখা যায়। প্রথম প্রজন্ম তার বাবা, তার মানসিকতায় মেয়েদের সম্পর্কে যে ভাবনা সেটা তার একটা উক্তিতে দেখা যায়। তাই তিনি যখন বলেন-

" মেয়ে সন্তান হাজারই হোক পর বইত নয়। তার লাখ টাকা থাকলেও বাপ ভিখারী। নিজের মেয়ে হতেই এই জ্ঞান তোর হবে। এই আশীর্বাদ আমি করছি"। ১৯

কিন্তু বিবাহ সভায় তার মেয়ে নারায়ণী এই দৃশ্য দেখে থাকতে না পেরে বাবাকে প্রতিশ্রুতি দেয় এবং বলে-

" আমিও বাবা তোমার পায়ে হাত দিয়ে বলছি আমার ছেলেতে মেয়েতে কোনও প্রভেদ নেই। এ আমি তোমাদের দেখাব।" ২০

এইভাবে নারায়নী পিতাকে দেওয়া কথা তার জীবনে ধরে রাখার চেষ্টা করেছিলেন এবং সফল করার চেষ্টা করেছিলেন। তাই সম্পত্তির অধিকারের বিষয়ে এবং বেড়ে ওঠার বিষয়েও নারায়ণী তার পুত্র ও কন্যাকে সমান চোখে দেখেছিলেন। এমনকি মৃত্যুর সময় নারায়ণী তার কন্যাকে বলেছেন যে কাত্যায়নীর বিয়েতে বাবাকে কথা দিয়েছিল সে ছেলে ও মেয়েতে কোন ভেদ ভাব করবে না সেটা কতটা রাখতে পেরেছে সে জানে না কিন্তু সে নিজের মতো করে চেষ্টা করেছে। পরবর্তীতে কল্যাণীর মানসিকতাও দেখা গেছে সে মায়ের অনুরূপ মনোভাব নিয়ে বেড়ে উঠেছে, তার মধ্যে আত্মমর্যাদা প্রবল, তাই বিয়ের পর মায়ের দেওয়া গয়নাগাটির যে ভাগ মা তাকে দিয়েছে সে যত্নে রেখেছে এবং কোনদিন দাদার কাছ থেকে কোন কিছু চাইনি আত্মমর্যাদার জন্য, কিন্তু হীরালাল মানে কল্যাণীর স্বামী মাঝেমধ্যে মায়ের কাছ থেকে টাকা এবং দাদার কাছ থেকে টাকা আনার জন্য তাকে প্রলুব্ধ করলেও সে (কল্যাণী) কিন্তু সেকথা আমল দেয় না। সে প্রতিবাদ করে এবং শেষ পর্যন্ত এক হীরার গয়না যেটা তার দাদার মেয়েকে দেবার জন্য কল্যাণীর হাতে তার মা দিয়ে গিয়েছিল সেটাতে হিরালালের লোভ জন্মায় তখন খুব বুদ্ধি করে দাদার মেয়ের সাথে নিজের সৎ সন্তানের বিয়ে দিয়ে মায়ের কাছে দেওয়া কথা রেখেছিলেন। এইভাবে তিন প্রজন্মের ভাবনাচিন্তা প্রকাশ পেল এই রচনায়।

এরপর আর এক উপন্যাস 'অলোখ ঝোড়া' এই উপন্যাসে প্রেম এবং বিবাহ নিয়ে নানারকম ভাবনা দেখা গেছে, গ্রাম শহরের মধ্যে পার্থক্য, জীবনযাত্রায় ও মনোভাবে পার্থক্য এসবকিছু দেখা গেছে এবং বিভিন্ন প্রজন্ম অনুযায়ী বিয়ের ধারণা যে বিভিন্ন হতে পারে সেটাও দেখিয়েছেন এই রচনায়। এই উপন্যাসের কেন্দ্রে আছে সুধা ও সুধার প্রিয়

বান্ধবী হৈমন্তীর জেঠতুতো দিদি মিলি এই দুই প্রধান চরিত্র এদেরকে কেন্দ্র করে রচনার বিভিন্ন বিষয়গুলি দেখা গেছে। প্রথমেই সুধা পিতার কাছে খুবই যত্ন সহকারে বেড়ে উঠেছে এবং সমস্ত রকম সমর্থন সে বাবার কাছ থেকে পেয়েছে। তাই পরিবারের অন্যান্য সদস্য তার বেশি বয়সে বিয়ে করা, পড়াশোনা করা সমস্ত কিছু নিয়ে কথা বললেও বাবার সমর্থন, বাবার সহচর্য প্রতিটা মুহূর্তে তাকে এগিয়ে নিয়ে গেছে। অন্যদিকে মিলি নামক যে চরিত্র সেখানে মিলির ব্যারিস্টার ছেলের সঙ্গে বিবাহ ঠিক হয় কিন্তু প্রতিবাদী মিলি নিজের পছন্দের পাত্রকে বিয়ে করতে চায় এই নিয়ে জেদ ধরে এবং শেষ পর্যন্ত নিজের জেদেই জয়ী হয়। দেখা যায় বাবা মা যাকে ভালো বোঝে তাকে বিয়ে করাই ঠিক বলে মিলির বান্ধবি জানায়। তাদের মধ্যে কথোপকথন থেকে বোঝা যায় যে নিজের পছন্দ করা পাত্রকেই তারা বেশি সমর্থন করছে। তাই অন্য বান্ধবী যখন বাবা মাই ভালো বুঝবে সবথেকে একথা জানায় মিলি তার প্রতিবাদ করে এবং নিজের পছন্দ করা পাত্রকে বিয়ে করে। এইখানেই নিমন্ত্রিত হয়ে আসা সুধার মনে বিয়ের আগে ভালোবাসার সম্পর্ক তৈরি হওয়া যায় কিনা এই নানা রকম প্রশ্ন দানা বেঁধেছে। সুধা মিলির বিয়েতে থেকেছে এবং সেখানে সবাই ছেলে মেয়ে নির্বিশেষে নানা রকম ছবি তুলেছে এবং এই ছবি তোলার মধ্যেও আধুনিকতা লক্ষ করা গেছে তাদের মধ্যে কিন্তু কোন ভেদ ছিল না যে ছেলেদের সারি মেয়েদের সারি আলাদা হবে। ছবি তোলার ক্ষেত্রে এই স্বাধীন চিন্তা আধুনিকিকতার পরিচায়ক। এইভাবে বিয়েতে আসা তপন ও সুধার মধ্যে সম্পর্ক গড়ে ওঠার ছবি দেখা যায়। এইভাবেই সুধার নিজে পাত্র বেছে নেওয়ার মধ্যে দিয়েই আমাদের সমাজে চলা যে বিভিন্ন রকম পরিস্থিতি তার বিরোধিতা লেখিকা করেছেন। অধিক বয়সে বিবাহ, স্ব ইচ্ছায় পাত্র নির্বাচন, স্কুলে-কলেজে পড়া নারী-পুরুষের মধ্যে স্বাভাবিক মেলামেশা ও সহজ বন্ধুত্ব তৎকালীন সমাজে প্রথা ও সমাজবিধানকে অতিক্রম করে গেছে, এক্ষেত্রে

লেখিকার স্বতঃস্ফূর্ত সমর্থন দেখা যায়। পুত্র-কন্যার বৈষম্যও লেখিকা সমর্থন করেননি। এইভাবেই সমাজবিধানের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করেছেন এবং চেতনার বিকাশের ফলে সমাজবিধান অনেকটা ফিকে হয়ে যায়, সে বিষয়ই চোখের সামনে দেখতে পাওয়া গেল।

কথা সাহিত্যিক জ্যোতির্ময়ী দেবীর সাহিত্যকে বিশ্লেষণের আলোয় দেখে নেওয়ার চেষ্টা করব। আধুনিক পাঠকমনের খুব কাছাকাছিই আমরা খুঁজে পাই তাঁকে। আজও তাঁর গল্প, উপন্যাসে প্রবন্ধে, সমস্ত লেখালেখির জগৎ জুড়ে দেখতে পাই বাংলা আর বাংলার বাইরের সর্বভারতীয় সমাজে মেয়েদের অবস্থানের বাস্তব ছবি, তাদের জীবনের আত্যাচারের দৃশ্য। যেখানে যত নিপীড়িত, প্রবঞ্চিত, ভাগ্যতাড়িত মানুষ সেখানেই কীভাবে প্রসারিত করে দিয়েছেন তাঁর সমানুভবের মন তাও দেখতে পাওয়া যায়। এছাড়াও মেয়েদের অধিকার বোধের ব্যাপারটিকেও এনেছিলেন খুব সচেতনভাবে। সমাজের পিছিয়ে পড়া মানুষেরাই তাঁর সাহিত্যের অবলম্বন, যার অন্তর্ভুক্ত মেয়েরাও। তাঁর রচনার ভৌগলিক পরিধি যেমন বিস্তৃত, তেমনই মেয়েদের জীবনের বিপন্নতা ও ঐশ্বর্যের মুহূর্তগুলিকে তিনি চিনেছেন তাঁর নিজের জীবন দিয়ে, জেনেছেন বৈধব্যের তীব্র নিঃসঙ্গতা অনুভব থেকে। তাঁর কলমে বাঙালি মধ্যবিত্ত মেয়েদের স্বনির্ভর হওয়ার প্রচেষ্টা, বাঙালি হিন্দু সমাজের প্রত্যন্ত প্রদেশে থাকে যে অসংখ্য নারী, বারাণসীর বিধবা, অথবা পতিতালয়ের বেশ্যা, রাজস্থানের নির্যাতিতা নারী, দেশভাগ- এর শিকার হয়ে ওঠা নারী, মন্বন্তরে বিকিয়ে যাওয়া স্নেহ ও অস্তিত্ব এছাড়াও প্রবন্ধ, স্মৃতিচিত্র ও ভ্রমণ কাহিনী মিলে তিনি সমগ্র উত্তরভারতকে অনেকখানি তুলে ধরেছেন তাঁর কলমে। এখন আমি আমার পড়া রচনাগুলির সাপেক্ষে জ্যোতির্ময়ী দেবীর রচনাকে তিনটি শ্রেণীতে ভাগ করলাম-

(ক) দেশভাগ ও মন্বন্তর কেন্দ্রিক রচনা।

(খ) রাজস্থান কেন্দ্রিক রচনা।

(গ) পারিবারিক-সামাজিক রচনা।

ক। দেশভাগ কেন্দ্রিক রচনা-

ঔপনিবেশিক শোষণ, জাতি, ধর্ম, বর্ণ নির্বিশেষে ভারতের কোটি কোটি মানুষের ওপর বিদেশী শাসকের অত্যাচার-নির্যাতন, স্বাধীনতা সংগ্রামের দীর্ঘ ইতিহাস- এসবের মধ্যে দিয়েই এল ভারতের স্বাধীনতা। আর এই স্বাধীনতার সঙ্গে জড়িত হয়ে রইল দেশভাগ প্রসঙ্গ, এই দেশভাগ হাঙরের দাঁতের মত করাত চালিয়ে টুকরো করেছে ভারতকে, পাঞ্জাবকে কেটে দুভাগ করেছে। ভারতের নিজের মাটি, নিজের জল, আর ঘর সংসারকে ভাগ করে দু-টুকরো ছেঁড়া রুটির মতো একটাকে জুড়েছে পাকিস্তানের সঙ্গে আরেকটাকে জুড়েছে ভারতের সঙ্গে। এর ফলে ঘটেছে প্রাণহানি, মানুষ স্বজনহারা, আশ্রয়হারা হয়েছে। বহু মানুষের ভোগান্তির কারণ এই দেশভাগ কেন হল তা বুঝতে চাইলে আমাদের ইতিহাসের দিকে দৃষ্টিপাত করতে হবে।

এইভাবে সমাজ জীবনে বড় আঘাত এসে লাগল ১৯৫০ সালে দাঙ্গার ফলে। যাতে রাতারাতি মানুষ ভিটে মাটি ছাড়া হল, ‘পার্টিশন’ শব্দটার সঙ্গে যুক্ত হয়ে পড়ল আরেকটি ইংরেজি শব্দ ‘রিফিউজি’। দাঙ্গা জন্ম দিল এক বিশাল উদ্বাস্তু প্রবাহর। এইভাবেই দেশভাগ মানুষের জীবনকে নিমেষে টালমাটাল, ক্ষতবিক্ষত করে দিল। সেই ক্ষত দাগ রেখে গেছে হাজার হাজার নরনারীর জীবনে। দেশ ভাগই এনে দিয়েছে দুটি সম্প্রদায়ের মধ্যে হানাহানির পরিবেশ, সাম্প্রদায়িকতা হয়ে উঠেছে দেশজোড়া একটা সমস্যা। যার থেকে উত্তরণের পথ খোঁজা আজও চলছে। এই দেশ বিভাগের ভয়াবহ দুর্দিনের ছবি ভেসে

উঠেছে জ্যোতির্ময়ী দেবীর কথাসাহিত্যে। তিনি দেখেছেন এই দুর্যোগের দিনে নারীর শরীরের ওপর সম্মানের ওপর আঘাত। ঘরছাড়া হওয়ার যন্ত্রণা থাকে নারী পুরুষ উভয়েরই কিন্তু তার ওপর সম্মানহারা নারীর লাঞ্ছনা এই যন্ত্রণায় আরেকমাত্রা যোগ করে। এই গৃহহারা, স্বজনহারা, আত্মযন্ত্রণায় দগ্ধ নর-নারীকে আমরা দেখব জ্যোতির্ময়ী দেবীর 'এপার গঙ্গা ওপার গঙ্গা' উপন্যাসে, 'এপার গঙ্গা ওপার গঙ্গা', 'সেই ছেলেটা', 'রক্তের ফোঁটা', 'টিনের মাংস' প্রভৃতি গল্পে।

এ প্রসঙ্গে আমরা প্রথমেই যদি 'এপার গঙ্গা ওপার গঙ্গা' গল্পটাকে লক্ষ্য করি সেখানে দেখতে পাব নারীর সতীত্ব রক্ষার জন্য আত্মবিসর্জন। এখানে সুদাম- দুর্গার মধ্য দিয়ে এই বিভৎস যন্ত্রণা লক্ষ্য করা যায়। এপার থেকে ওপারে যাওয়ার জন্য টাকা আনতে স্বামী স্ত্রীকে রেখে যায় স্টেশন মাস্টারের বাড়িতে। টাকা আনলে স্ত্রীকে নিয়ে সে ওপারে যেতে পারবে। এই প্রসঙ্গে দেখি প্রথমে সুদামের নিরুপায় অবস্থা। তার নিজের কাছে কেবল ছিল পাঁচ টাকা যা কলকাতা যাবার জন্য দুজনের উপযুক্ত মূল্য নয়, এখানে তাকে ২৫ টাকা চাইল নিরাপত্তা রক্ষীরা যা তার সামর্থ্যের বাইরে। দুর্গা স্বামীর কানে কানে বলে তার ভাইদের কাছ থেকে আনতে। এভাবে সংশয়ে কাটানো রাতে দালালের গলায় শোনা যায়-

> "তুমি চলে যাও সুদাম। টাকা নিয়ে এসো, আমরা তোমার বৌকে দেখব।" [২১]

এই কথা কানে আসা মাত্রই গায়ে শিহরণ দিয়ে যায় দুর্গার, ভয়ে কাঠ হয়ে থাকে সে। তবে অবশেষে অনেক সংশয়ের পরে সুদাম স্টেশন মাস্টারের হাতে পায়ে ধরে কাতর অনুনয় জানিয়ে বলে-

> "আমি যাব আর আসব ওকে আপনার পোলাপান মনে করবেন ও

এছাড়া যা হয় করে একটু ফুটিয়ে নেবে ওর ‘মায়ের’ কাছে আপনার

বিবিসাহেবের কাছে। চিঁড়ে মুড়ি খাবে। সঙ্গে আছে। দু'তিন দিন

বই তো নয়। মা জানের কাছে থাকবে।” ২২

এখানে দেখা যায় স্টেশন মাস্টার বলে তোরা তো আমাদের ঘরে খাবি না, তখনই জাতপাত প্রসঙ্গ স্পষ্ট হয়ে ওঠে। তবে এই বলে রেখে সুদাম চলে যায় টাকা আনতে। অপেক্ষায় দিন গোনে দুর্গা। তিনদিন কেটে গেলেও সুদাম আসে না। ক্রমে ক্রমে দুর্গাও যেন স্টেশন মাস্টারের বোঝা হয়ে পড়ে। অবশেষে ফাজিল ছোঁড়ারা যখন বলে-

“বিবিসাহেব ওকে কেন ঘরে পুষে ধরে রেখেছ! বিদেয়

করে দাও যেখানে ইচ্ছে চলে যাক।” [২৩]

তখন ভয়ে দুর্গা কাঠ হয়ে যায়। আবার স্টেশনের কুলীরা হিহি করে হেসে বলে-

“সে আবার আসবে টাকা নিয়ে! ঘাড় থেকে নাবিয়ে বেঁচেছে বলে! এবার ছুঁড়িই

কত টাকা রোজগার করে নেবে দাওনা ছেড়ে। আমরা খদ্দের দেখে দেব।” [২৪]

এই সমস্ত কথা শুনে দুর্গার এক নিমেষে হার হিম হয়ে যায়। অসহায় কাতর মেয়ে একনিমেষে এই কথার ইঙ্গিত বুঝতে পারে। অবশেষে যখন পাশের ঘর থেকে বিবিসাহেব আর স্টেশন মাস্টারের কথা শুনতে পেল তখন ভাবল-

“তাহলে কি করবে সে? ওই রাক্ষস দলের হাতেই এরা ছেড়ে

দেবে ওকে?” [২৫]

এই জিজ্ঞাসায় ক্ষত বিক্ষত মন নিয়ে অসহায়, অবমানিত দুর্গা নিজের সতীত্ব রক্ষার জন্য পুকুরে ডুবে আত্মবিসর্জন দেয়। অবশেষে ২১ দিন পর তার স্বামী ফিরে এল। দুজনের

ফিরে যাবার আনন্দ দুর্গার মৃত্যুর খবরে চুরমার হয়ে গেল। শুরু হল আত্মযন্ত্রণা। দুর্গার মৃত্যু সুদাম মানতে পারেনি, এমনকি স্ত্রীকে ফিরে পেতে প্রায়শ্চিত্য করতে, মুসলমান হতেও রাজি। পাগলের মত সে দুর্গাকে খুঁজে ফেরে লোকের ভিড়ে, আর চেঁচিয়ে ডাকে-

"দুর্গা রে দুগ গা!" ২৬

এইভাবে সুদাম-দুর্গার আত্মযন্ত্রণা, অসহায়তা ও আত্ম-বিসর্জন দেখা গেছে এই গল্পে। যা একান্তই দাঙ্গারই ফল।

খ। মন্বন্তর কেন্দ্রিক রচনা-

চল্লিশের দশক ভারতবাসীর কাছে যুদ্ধ, আন্দোলন, মহামারী, দাঙ্গা, দেশভাগ আর ক্লান্ত বিষন্ন স্বাধীনতার দশক। এই সময়কার দুর্দশার চিত্র বিভিন্ন সাহিত্যিকদের লেখায় উঠে আসে যা ওই দশকের সঙ্গে মানুষের পরিচয় করাতে সহায়তা করে। এরকমই ভয়াবহ দিনগুলির চিত্র আমরা জ্যোতির্ময়ী দেবীর দেশবিভাগ কেন্দ্রিক রচনাগুলির মধ্যে যেমন পেয়েছি, তেমনি পেয়েছি মন্বন্তরের ঘটে যাওয়া মানুষের দুর্দশা, দুর্ভোগ, অনাহার, না খাওয়ায় মৃত্যু প্রভৃতি দুর্দশার চিত্র। তাঁর মন্বন্তর কেন্দ্রিক রচনাগুলির মধ্যে দেখা যায় নিরন্ন মানুষের চিত্র, আশ্রয়হীনতার ও স্বজন হারানোর চিত্র। এরকম করে দেখা যায় মানুষ ক্ষুধার আগুনে জ্বলে কঙ্কালে পরিণত হওয়ার দৃশ্য।

এরপর আমরা 'নীলচোখে' গল্পটিতে মন্বন্তরের চিত্র আরো ভয়াবহ ভাবে দেখতে পাব। গল্পের প্রকাশকাল **১৩৫১**, ভাদ্র। গল্পের শুরুতেই দেখি হ্যারিসন রোডের ওপর কর্পোরেশনের একটা লরি দাঁড়িয়ে আছে আর পথের দু ধারে ফুটপাতে নরনারী বালক বালিকাতে ভরা। পাশে ছেঁড়া কাঁথা ন্যাঁকড়া, হাতে মাটির সরা, টিনের মগ এনামেলের বাসন দু-একখানি করে নিয়ে সব বসে আছে। ফ্রী কিচেন, লঙ্গরখানা গৃহস্থ বাড়ি থেকে

অনেকেই খিচুড়ি, ভাত, ফেন পেয়েছে। যারা পায়নি তারা সন্ধ্যায় পাবে এই আশায় আছে। হঠাৎ ফুটপাথের ওপর লরি আসছে, লরি আসছে একটা গোল উঠল আর তখনই যে যেরকম ভাবে পারল কেউ লোকের বাড়ির দেউড়িতে কেউ পান দোকানের নীচের খুপরিতে লুকিয়ে পড়ল। বাকি বয়ে গেল বহুজন। এ. আর. পি.-র লোকেরা লরি থেকে নেমে বাকিদের লরিতে তুলে নিল এবং এভাবে বোঝাই লরি শহরতলির শেষ প্রান্তে থামল।

এরপর দেখা গেল লাল, কালো সেপাই আর তাদের কালো কর্মচারীরা বৈকালিক অবসরটুকু উপভোগ করবার জন্য বেরিয়েছে। এভাবে তারা একটা জনহীন নিস্তব্ধ গ্রামের প্রান্তরে এসে পড়ে। এবং ঝোপের তলায় কি একটা নড়তে দেখে ওখানে কে ? বলে জিজ্ঞাসা করে। মা সাড়া না দিলেও বাচ্চার কান্না বুঝিয়ে দেয় মানুষের উপস্থিতি। তখন অন্যান্যরা হিন্দিতে তাকে প্রশ্ন করলে সে কিছু বুঝতে পারে না। তবে কেরানী যখন তাকে কোথা থেকে এসেছে সে এটা জানতে চায় তখন তার কথা বুঝতে পেরে সে পাঁশকুড়া ইস্টিশন থেকে এসেছে বলে জানায়। তখন কেরানী আবার অতদূর থেকে তার এখানে আসার কারণ জানতে চাইলে মহিলাটি জানায়-

"খেতে পেলাম না বাবু। ঘরে যা ধান ছিল, তা সরকারী লোকেরা নিয়ে গেল, যে ট্যাকা ধরে দিলে তা মহাজনে নিয়ে নিলে। ভাবলাম, আউস ধান হলে ঘরে দুটো খেতে পাব তাও ভেসে গেল হেজে গেল।"[২৭]

একলা এসেছে কিনা জিজ্ঞাসা করলে মেয়েটি জানায়-

"না বাবু, ভাই ছিল সোয়ামী ছিল, গেরামের লোক আরও সব ছিল। তাদের সবাইকে হোগলা কুঁড়েয় তুলেছিল।"[২৮]

হঠাৎ সকলে চুপ হয়ে যায়। কেরানী আবার তারা কোথা গেল জিজ্ঞাসা করল। এবারে মেয়েটি কেঁদে ফেললো। বলল ভাইয়ের পেটের অসুখ জোয়ারি সেদ্ধ খেয়ে, তারপর পা ফুলল, স্বামী জ্বরে পড়ল। তখন স্বামী তাদের বলেছিল বাবু এই জোয়ারি-বাজরা খেলে ছেলেরাও আর বাঁচবে না কিন্তু ভাত চাইলে তাকে শুনতে হয়েছিল—

"মরবিইতো তা আজ নয় কাল। বাঁচবি নাকি?" [২৯]

মেয়ে কেঁদে চোখ মুছতে লাগল। এই ঘটনার পর তারা তাদের কাছে যা ছিল তাই মেয়েটাকে দিল। এই সময় বালকটি এগিয়ে এসে ওই মানুষদের দেওয়া বিস্কুট আর চকলেট নিলে ক্ষুধার্ত জননী হাত থেকে দুখানা ছিনিয়ে একটি কোলের শিশুর হাতে দিল, একটি নিজের মুখে পুরল। এরপর গোরারা চিন্তিত মুখে শিস দিতে দিতে ক্যাম্পের দিকে ফিরল। এরা পাঁচজন প্রায় একসঙ্গেই ঘোরে। কয়েকদিন পরে সেই বনের পথে তাদের সম্মুখে এসে দাঁড়াল একটি বুভুক্ষু বালক। সে সঙ্কোচে, ভয়ে, দ্বিধায় তাঁদের সম্মুখে দাঁড়িয়ে বলল-

"সায়েব, একটা বিস্কুট দেবে?" [৩০]

শুধু কেরানী তার পকেট থেকে একটু যা ছিল বের করে দিলেন। সাথে অন্যরাও দিলেন। একটু পরে তাকে জিজ্ঞাসা করলেন তোর মা আর ভাই কই। তখন বালক কেঁদে ফেললে বললে—"পরশু ভাইডারে শেয়ালে টেনে নিয়ে গেছে মার জ্বর হয়েছিল, ঘুমিয়ে পড়েছিল।" [৩১]

তারপর মা শেয়ালের পিছনে তাড়া করে আর ফেরেনি। এরপর তারা বালকটিকে কোথাও রেখে দিল। এইভাবেই এই গল্পগুলোর মধ্যে ফুটে উঠেছে নিরন্ন মানুষের আশ্রয় হারানোর যন্ত্রণা, স্বজন হারানোর যন্ত্রণা, কষ্টের জীবন-টাকে টিকিয়ে রাখার যন্ত্রণা।

গ। রাজস্থান কেন্দ্রিক রচনা-

জ্যোতির্ময়ী দেবী, রাজস্থানের জয়পুর স্টেটের সুপরিচিত প্রধানমন্ত্রী সংসার চন্দ্র সেনের পরিবারে জন্ম নেন। তাঁর পিতা মন্ত্রী অবিনাশচন্দ্র সেন। তাঁর জন্মস্থান রাজস্থানের জয়পুরে। যে ভূমি তাঁর জন্মভূমি, সেখানকার খাদ্য ও পানীয়ে তিনি জীবনের প্রথম স্বাদলাভ করেছেন, যে ভূমিতে তিনি চোখ মেলেছেন ও বাল্যকাল অতিবাহিত করেছেন সে ভূমির কথা একান্ত সহজ ও সুন্দর করে তিনি লিখবেন, এ তো অতি স্বাভাবিক সত্য কথা। তাইতো তাঁর রচিত রাজস্থানকেন্দ্রিক রচনাগুলিতে রাজস্থানের নানান ছবিকে তিনি সুন্দর করে ফুটিয়ে তুলেছেন। মহৎ ও উজ্জ্বল কুলে জন্মলাভ করার ফলে রাজস্থানের মর্মর প্রাসাদগুলির অন্তঃপুর তাঁর কাছে অচেনা ছিল না। যেমন তিনি সাধারণ মানুষের জীবনযাত্রা দেখেছেন তেমনি দেখেছেন রাজ্যের অভিজাতদের অনুদঘাটিত জীবনলীলা, অথচ সাধারণ ভাবে কারও পক্ষে এই দুইকে একসঙ্গে দেখার সৌভাগ্য হবার কথা নয়। তাঁর পিতা-পিতামহের প্রাসাদে তাঁর পক্ষে তা সম্ভব হয়েছিল। আর সে কারণেই আমরা তাঁর হাত থেকে পেয়েছি রাজস্থান নিয়ে অজস্র কাহিনী। সে কাহিনীতে রাজা, রাজমাতা, লালজী সাহেব থেকে পাত্রী, পাশোয়ান, পর্দায়েত, বড়ারণ, বাঁদী, সর্দার, ঠাকুর সাহেব, শেঠ, শেঠানী, সিপাহী- বহুস্তরে বিন্যস্ত রাজপুত অভিজাত সমাজ ও সেই সঙ্গে অজস্র দুঃখী দরিদ্র সাধারণ মানুষ সমান শক্তিতে ও প্রত্যয়ে, সমান মহিমা ও ঔজ্জ্বল্যে আপন আপন লীলা করে গিয়েছে। সমস্ত ক্ষেত্রেই তা গভীর মমতা ও সহানুভূতিতে পরিপূর্ণ। সকলের জন্যই লেখিকার অকপট শ্রদ্ধা ও প্রেম সুপরিস্ফুট। তাঁর গভীর প্রাত্যহিক পরিচয়ের মধ্য দিয়ে রাজস্থানের সমগ্র জীবনকে তিনি যেভাবে দেখেছেন তা দিয়ে নানান সাহিত্য রচনা করেছেন। তাঁর রচিত রাজস্থানকেন্দ্রিক কয়েকটি রচনা হল—'বেটি কি বাপ', 'সেপাই পিসিমা', 'লালজী সাহেব', 'মাজীসাহেব', 'খুশনজরজী', 'শেঠানিজী', 'আরাবল্লির আড়ালে', 'সুমেরু রায়' ও 'নারীশালা ও হারেম নারী' প্রভৃতি।

এ প্রসঙ্গে আমাদের প্রথম আলোচ্য 'বেটি কি বাপ' গল্পটি। এখানে বড় হয়ে উঠেছে মেয়ে হওয়ার বিষয়টি। একটা গ্রামের সমস্ত অধিবাসীদের জন্য কুয়োতলা ছিল যেখানে গ্রামের প্রত্যেকে জল নিতে আসত। একদিন এক প্রৌঢ়া তিনটি বালিকার সঙ্গে সেখানে এলে আগে থেকেই তার বউমার কন্যা সন্তান হওয়ার সংবাদ জানে এমন একজন তাকে ব্যাঙ্গ করে জিজ্ঞাসা করে-

"কি ভাই নাতি হয়েছে"? ৩২

তখন প্রৌঢ়া বচসা করে ওখান থেকে চলে যায় এবং তাদেরকে শুনিয়ে যায়-

"কেন কি হয়েছে তা তো তুমি দেখেই এলে সকালে আবার জিজ্ঞেস করছ কেন? তামাসা করছ?" ৩৩

এখানে আসলে ওই প্রৌঢ়ার দুই সন্তান কুশল সিং ও সম্ভ সিং। কুশল সিং-এর দুই মেয়ে একটি ছেলে আর সম্ভ সিং-এর চারটে মেয়ে। এই রাজপুত পরিবারে মেয়ে বেশি হবার খোঁটা এই প্রৌঢ়াদের বাড়ি থেকেই কেও আগে দিয়েছিল তাই প্রৌঢ়াকে আজ তারা ব্যাঙ্গ করে বলেছে। পরের পর এই মেয়ে হওয়ার যন্ত্রণাটা এতটাই তীব্র যে একসময় ছোটো ছেলের কনিষ্ঠ কন্যা সন্তানটি জন্মলাভ করলে ঠাকুমা খুশি হয়নি। কেবল ওইটুকু মেয়েকে অফুরন্ত স্নেহ দিয়েছিলেন তার জেঠু কুশল সিং। আদর করে ভাইঝির রূপ দেখে নাম দিয়েছিল পদ্মিনী। একসময় কুশল সিং-এর শহরে ডাক পড়েছে কুচকাওয়াজের জন্য। তাই জেঠু ও বাবা দুজনেই একই সময়ে কাজের সূত্রে বাইরে যায়। এই সময় ঠাকুমা সমস্ত বালক-বালিকাদের রক্ষণাবেক্ষনের দায়িত্ব নেয়। এই সময় চারিদিকে হাম হয় কিন্তু তার বাড়ির চৌকাঠ পার হয় না এই রোগ ভোগ। একদিন ফিরে আসে বাবা ও জেঠু, এসে কিন্তু আর বাচ্চা মেয়েটিকে দেখতে পেল না। জেঠু খুবই কান্নায় ভেঙে পড়ে।

কিন্তু অকালমৃত্যুর কারণ অনুসন্ধান করে তাকে একসময় তাঁর মায়ের উদ্দেশ্যে বলতে শোনা যায়-

“তবে এবারে ছটি মেয়ে দেখে একটু বেশী অম্মল দিয়েছিস্। বেশী ভেবেছিলি কিনা। তাই মাত্রা বেশি হয়ে গেছে।” ৩৪

এখানে অম্বল’ অর্থে আফিংকে বোঝানো হয়। তখনই মৃত্যু রহস্য স্পষ্ট হয়ে ওঠে। আসলে বেশি সংখ্যক মেয়ে হলে বাবাকেও পরিচিত হতে হত 'বেটি কি বাপ বলে’ এটা অপমানজনক। আর এই কারণেই এভাবে একটা ছোটো শিশুকে হত্যা করতেও দ্বিধা করে না ওই প্রৌঢ়া।

ঘ। পারিবারিক ও সামাজিক রচনা-

বঙ্কিম পরবর্তী ভারতীয় সাহিত্যের উপাদানকে মেয়েদের চোখ দিয়ে দেখলে সত্যই নতুন সুর বেজে ওঠে। হিন্দু যৌথ পরিবার ও গার্হস্থ্যের আদর্শে গড়ে ওঠা বাংলা উপন্যাসে মেয়েরা একটি আদর্শমন্ডিত রূপ, জাতীয় জীবনের প্রতীক। এই অন্তঃপুর ও গার্হস্থ্যের মধ্যে মেয়েদের যে রূপ তা জ্যোতির্ময়ী দেবীর কাছে পরাধীন। তাঁর জীবন সংগ্রাম থেকেই জন্ম নেয় নারীবাদী চেতনা, যা হয়ে ওঠে সাহিত্য শিল্পকর্মের মূল উপাদান। আসলে উনিশ শতকের শেষের দশকে জন্মেও জ্যোতির্ময়ী দেবী অন্তঃপুরের গন্ডি সহজে পেরোতে পারেননি এবং এই সীমাবদ্ধতা তিনি মেনে নিতেও পারেননি। এই পরাধীন জীবন তাঁকে স্বস্তি দিত না। তাই প্রতিবাদের হাতিয়ার হিসাবে তিনি বেছে নিয়েছিলেন কলমকে। শৈশবে বিবাহ, ভরা যৌবনে বৈধব্য, আচার বিচার মেনে চলা এই ছিল তাঁর জীবন। এমনি করে জীবনের চলার পথে যা তাঁর হৃদয়কে নাড়া দিয়েছে তাকেই ফুটিয়ে তুলেছেন তাঁর সাহিত্যের আঙিনায়। এইভাবেই তিনি যেমন দেশভাগ ও মন্বন্তরের কাহিনী, রাজস্থানের

অন্তঃপুরের দৃশ্যাবলীর বর্ণনা দিয়েছেন, তেমনই এই সমাজে ও পরিবারে নারীর ভূমিকা কী ছিল তাকেও দেখার ও দেখানোর চেষ্টা করেছেন। তাঁর নারী যেমন মাতৃত্বে অটল তেমনি তার মধ্যে পরিবারে মানিয়ে চলার মানসিকতাও স্পষ্ট। কেবল এখানেই নারীর সীমাবদ্ধতা নয়। নারীকে তিনি দেখিয়েছেন প্রেমিকা হিসাবে, কন্যা হিসাবে, বধূ হিসাবে, মাতা হিসাবে আবার কখনও বা বার্ধক্যের কবলে পড়ে চূড়ান্ত অসহায় অবস্থায়, পাশাপাশি তাঁর লেখায় কুসংস্কার আবদ্ধ নারীও দুর্লভ নয়। আবার কখনও তাঁর নারী সংসারের বাধা সত্ত্বেও শিক্ষিত হওয়ার মানসিকতা দেখিয়েছেন। আবার নারীকে কেন্দ্র করেই বিবাহ প্রসঙ্গে দেখা যায় রঙ কালো হওয়ার সমস্যা, অসবর্ণ বিবাহে সমস্যা, একান্নবর্তী পরিবারের ভাঙন প্রভৃতি প্রসঙ্গ। এই সমস্ত বিষয় যে রচনা গুলিতে দেখা যায় সেগুলি হল— 'আমি এম পি', ‘আগাছা’, ‘পঞ্চাশোর্ধে’, ‘জননী’, ‘স্ত্রীধন’, ‘তিমির সম্ভবা’, ‘চিরকালিনী’, ‘সেই মেয়েটি’, ‘বাজিকরের ছেলে’, ‘যাচঞা’, ‘রাজযোটক’, ‘একানড়ে’, ‘জবালা’, ‘সিন্নকের তেরো নম্বর ফ্ল্যাট’, ‘গঙ্গাফড়িং’, ‘পুত্রেষ্টি’, ‘অজাত’, ‘সন্ন্যাসী’, ‘দরদস্তুর’, ‘বিশাখা’, ‘ললিতা’, ‘যশোধরা’, ‘গোবিন্দ’, ‘নারায়ণ চন্দ্রা ও বেণু’ প্রভৃতি গল্প ও ‘বৈশাখের নিরুদ্দেশ মেঘ’ শীর্ষক একটি উপন্যাস। এই সমস্ত রচনাগুলিতেই নানা পটভূমিকায় অবতীর্ণ হয়েছে নারী।

‘তিমির সম্ভবা’ গল্পটিতে একটি অনাথ মেয়ে মনিকার এই সমাজে কষ্ট করে কাটানো জীবনের চিত্র দেখা যায় পাশাপাশি দেখা যায় শিক্ষাকে এগিয়ে চলার মন্ত্র হিসাবে গ্রহণ করার মনোভাব। এখানে মনিকা দাস যখন কলেজে পড়াশোনা করত তখন শীকর তাকে খুবই পছন্দ করত এবং একসময় তাকে প্রেম সম্ভাষণও জানিয়ে শীকর বলে—

> “জাত গোত্র কূল-পরিচয়ের চেয়ে কি মানুষ পরিচয়ই আরো বড় নয়?” ৩৫

একথা শুনে মনিকা সেদিন উৎফুল্লও হয়নি ও হতাশও হননি খালি ধৈর্য ধরেছেন। যেদিন মনিকা সত্যই কলেজে পড়াশুনা শেষ করে বাড়ি গেল সেদিন সে একটা চিঠিতে সে যে অনাথ এটা জানায় এবং তার ঠিকানা দেয় শীকরকে। কিন্তু চিঠি পেয়ে মনিকার সঙ্গে দেখা করার মত সময় শীকরের থাকলেও মনিকার চিঠিতে তার আসল পরিচয় পেয়ে সে গেল না। মনিকা অপেক্ষাতুর মন নিয়ে বাড়ির পথে রওনা দিল। মনিকা কিন্তু জানত আসবে না শীকর তবুও যে ঠিকানা শীকরকে সে দিয়েছিল সেই স্টেশনে অপেক্ষাতুর দুটো চোখ শীকর কি আসছে এটা দেখার জন্য যেত। একদিন সত্যই শীকরকে সে ওই স্টেশনে দেখতে পেয়েছিল কিন্তু সঙ্গে ছিল শীকরের স্ত্রী। তখন এক নিমেষে মনিকা অতীতের কথা ভাবলেও শীকরের মনে কিন্তু সেই কলেজের দিনগুলির কথা উদয় হল না। তবে মনিকাও নিজের একটা তেজ বজায় রাখার জন্য পাশেই বসে থাকা এক অপরিচিত শিখ যুবকের হাত ধরে শীকরকে বুঝিয়ে দিতে চাইল সে একা নয়। এমনই আচরণ করল শিখ যুবকের সঙ্গে যাতে শিকর বুঝতে পারে সেও একা নেই। এই রকমই যন্ত্রণা পায় মনিকা। ভাবতে থাকে একসময় সে এত গালভরা বুলি শুনিয়েছিল প্রেম পাওয়ার জন্য কেবল অনাথ জানতে পেরে আজ তার আর কোনো অস্তিত্বই নেই শীকরের কাছে। তবে যাই হোক মনিকা তার সম্পদ শিক্ষা ও বুদ্ধির মধ্য দিয়ে বেঁচে থাকার শক্তি পেয়েছে।

'সেই মেয়েটি' গল্পের দিকে চোখ রাখলে দেখতে পাব ভক্তনদের মেয়ের জটিল জীবন। দেখা যায় যমুনা বাঈ একসময় গল্পের কথক মাঈীর স্বামীকে ভালবাসত। কিন্তু সে সমাজে তাদের প্রেম দৃষ্টি কটু তাই ভালোবেসেও হাসিমুখে প্রেমাস্পদকে ত্যাগ করেছিল সে। আর নিজেকে কখনো তার সামনে নিয়ে যায়নি। এইভাবে ভক্তনদের মেয়ে হওয়ার কারণে প্রেমের জন্য আত্মত্যাগ দেখা যায় যমুনা বাঈ-এর মধ্য দিয়ে। 'চিরকালিনী'

গল্পটির দিকে দেখলে দেখতে পাব- সেখানে জুঁই নামক একটি পতিতালয়ের মেয়েকে। একদিন এক বৃষ্টির দিনে কয়েকটা যুবক তাদের বাড়িতে আসে এবং তারা পড়াশোনা করে কিনা জানতে চায়। এই সময় জুঁই ও মল্লিকা দুইজনই তাদের এই প্রশ্নে খুশি হয়। তাদের সঙ্গে কথা বলার মধ্যদিয়ে একরকমের ভালো লাগা তৈরী হয়। একসময় ভালো লাগা থেকে ভাল করে বাঁচার তাগিদ জুঁই মেয়েটির মধ্যে লক্ষ করা যায়। এভাবে ভালো করে বাঁচার তাগিদ দেখে অন্যান্যরা তাকে নানারকম কথা বলে সেটাও তাকে সহ্য করতে হয়। সে এই বৃত্তি ছেড়ে লোকের বাড়িতে কাজ করে সুস্থ জীবনযাপন করতে চেয়েছিল। একসময় সে কাজের খোঁজে বেরোলেও তার আচার আচরণ, পোষাক দেখে তাকে কেউ কাজ দেয় না। তখন তার মন হতাশায় ভরে যায়। দেখা যায় তার বাড়ির দরজা সে বন্ধ রেখে নিশ্চুপ ভাবে ভাবতে থাকে। আবার পূজার দিন ভিড়ের মধ্যে সেই যুবককে সে দেখতে পায়। এগিয়ে যেতে থাকে ভিড়ের দিকে তখন এক মহিলাকে সন্তান কোলে নিয়ে যুবকের পাশে দেখে জুঁই। সে বালকটাকে দেখতে থাকে এক বিস্মিত দৃষ্টিতে। তখন বালকের মা বলে দেখ কেমন তাকিয়ে আছে যেন ভস্ম করে দেবে। এমনকি সেই যুবকও তাকে চিনতে পারল না। যুবকটি তার স্ত্রীকে তখন সামলাতে থাকে। এই দৃশ্য দেখে জুঁই সত্যই বিস্ময়ীভূত হয়ে যায়। এখানেও তাকে যেন মানুষ হিসাবে ভাবা হল না। সে তো কোনো উদ্দেশ্য নিয়ে শিশুর দিকে তাকায়নি তবুও তাকে কেন এরকম কথা শুনতে হল। সে যেন এ সমাজে থেকেও অন্যদের থেকে আলাদা তাইতো সুস্থভাবে বাঁচতে চাইলেও তার কাজ মেলে না এমনকি নিজের ইচ্ছায় কারোও ওপর তাকানোর স্বাধীনতাও যেন নেই তার। এভাবেই দেখা যায় সে যে জীবনটা পেয়েছে সেটা চায় না আর যেটা পেতে চায় সেটা পায় না এভাবেই তার মধ্যে এক মানসিক সংঘাত তৈরী হয়।

'দরদস্তুর' গল্পে দেখি কালো মেয়ের বিয়েকে কেন্দ্র করে দরাদরি। এখানে এই সমাজ মেয়েদের মধ্যেই এই প্রশ্ন সৃষ্টি করে যে তাদের নিয়ে গিয়ে যখন কাজই করাবে তাহলে বিয়ের আগে গান জানে কিনা, শিক্ষিত কিনা, হাতে করা আছে কিনা এসব দেখে কেন, এখানে নিভাকে কেন্দ্র করে এই দরদস্তুর দেখা যায়। সে না চাইলেও সমাজ যেন তাকে ছাড়ে না। সমাজ যেন তার ঘাড়ে বিধি-নিষেধের বোঝা চাপিয়ে দিয়েছে। তার পিতা কিন্তু হৃদয়হীন মানুষ নয় সাধারণ মমত্ব বোধও তার মধ্যে আছে কিন্তু পুরুষের ব্যক্তিস্বভাব যাই হোক না কেন দাম দিতে হয় মেয়েটিকেই। এই গল্পে যেমন নিভাকে দাম দিতে হয়েছে।

মানব জীবন ও সমাজ জীবনকে অন্তরঙ্গভাবে জানবার ও চেনবার ক্ষেত্রই হল কথাসাহিত্য। আর এই কথাসাহিত্যের ধারায় শৈলবালা ঘোষজায়া একটি উল্লেখযোগ্য নাম। তিনি মেয়েদের শিক্ষায়, প্রতিবাদে, আর্থিক স্বাবলম্বনে, পরিবার পরিচালনায়, সন্তান লালনে ও মাতৃত্বে, কঠোরতায়, প্রেমে প্রস্ফুটিত করে তুলেছেন। তিনি যেভাবে তাঁর রচনায় নারীদের দেখিয়েছেন তা কতটা অভিনব সেটা বুঝতে গেলে তাঁর সমকালীন বেগম রোকেয়া, অনুরূপা দেবী, নিরূপমা দেবী, শান্তা দেবী, জ্যোতির্ময়ী দেবী প্রমুখ লেখিকাদের লেখারদিকে তাকাতে হবে। শিক্ষা, সমাজ সকল দিক থেকেই উপরিউক্ত লেখিকাদের নায়িকারা কীরকম ভাবে কাটাচ্ছে তাদের জীবনযাত্রা তা লক্ষ করা যেতে পারে। এ প্রসঙ্গে প্রথমেই আসি বেগম রোকেয়ার কথায়, তিনি একটু বাকিদের থেকে সময়ের হিসাবে এগিয়ে থাকলেও এই যুগের হিসাবে তিনিই প্রথম মেয়েদের অর্থনৈতিক সাবলম্বনের কথা উপলব্ধি করেন এবং নারী- পুরুষের সমান আধিকারের কথা বলেছিলেন যা অতুলনীয়। তিনি স্বামীকে প্রভু রুপে দেখানি, অর্ধাঙ্গ বলে দাবি জানিয়েছেন। পুরুষরা ধর্মের ভয় দেখিয়ে নারীদের শোষণ করেছে এই উপলব্ধি সত্যই আধুনিক মনের পরিচয়

দেয়। তিনিই প্রথম এই লিঙ্গ ভিত্তিক শ্রেণী শোষণের কথা বলেছিলেন। এমনকি তিনিই প্রথম নিজেকে ধর্ম ও সমাজের বাইরে গিয়ে নিজেকে ভারতীয় হিসাবে পরিচয় দেবার সাহস জুগিয়েছিলেন, তাঁর আগে কাউকে এভাবে ভাবতে দেখা যায় না। এইভাবে শিক্ষা, স্বাস্থ্য, নানান অসঙ্গতিতে রোকেয়ার প্রতিবাদ যুগের আবেদনকেও ছাড়িয়ে যায়, এইখানেই তিনি অসাধারণ।

এরপর অনুরূপা দেবীর রচনার দিকে চোখ রাখলে দেখতে পাব প্রথাগত শিক্ষাকে তিনি গুরুত্ব দেননি। মেয়েদের স্কুল-কলেজে পাঠানো, পাশ করা প্রভৃতির প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেননি কিন্তু মেয়েদের ঘরের পড়াকেও অস্বীকার করেননি। তবে তাঁর বর্ণনাতেই মেয়েদের শিক্ষিত হওয়া মানে রামায়ণ, মহাভারত পাঠকে বুঝিয়েছেন, চিঠিপত্র লেখাকে বুঝিয়েছেন অর্থাৎ সংসার জীবনে আরও স্বাচ্ছন্দ্য ও গতি আনাতেই শিক্ষার সার্থকতা। তাইত 'জ্যোতিঃহারা' গ্রন্থের নায়িকা অনিমা শিক্ষাকে ব্যবহার করেছে নানা পরহিতকর কাজে, স্কুল স্থাপন করেছে তবে জীবনে সফলতা পায়নি এবং শেষ পর্যন্ত জীবনে সংসার ধর্মকেই আদর্শ বলে মেনে নিয়েছে। নারী স্বাধীনতার বিষয়ে স্বেচ্ছাচারিতা ও উচ্ছৃঙ্খলতা বৃদ্ধি পাবে এই ধারণা থেকে পুরুষতান্ত্রিক সমাজের মতো সমান মানসিকতা আমরা তার মধ্যে দেখি যা তাঁর রচনাতেও দেখতে পাওয়া যায়। এছাড়া তাঁর 'পোষ্যপুত্র', 'মহানিশা', 'মা', 'মন্ত্রশক্তি', 'গরীবের মেয়ে' প্রভৃতি উপন্যাসগুলিতে হিন্দু নারীর দাম্পত্য জীবনের আদর্শ, এবং স্বামীর প্রতি নারীর অবিচল নিষ্ঠার দিকে লেখিকা পাঠকের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন। এছাড়াও আছে দরিদ্র, নিঃসম্বল পরিবারে কন্যা সন্তান জন্মানোর পরিণাম, পণপ্রথা, নারীত্ব, সতীত্ব, মাতৃত্ব, বহুবিবাহ, বিধবা বিবাহ প্রভৃতি বিষয় তাঁর রচনায় দেখা যায়। এছাড়াও তিনি তাঁর নারীদের শিক্ষিত করে প্রতিষ্ঠিত না করলেও আর্থিক অস্বচ্ছলতা যে নারীর বঞ্চনার একটি কারণ তা তিনি উপলব্ধি করেছিলেন এবং সেই কারণে

'মহানিশা' উপন্যাসের ধীরা চরিত্রকে বঞ্চনা থেকে মুক্তি দেওয়ার জন্য আর্থিক স্বচ্ছলতা দিয়েছেন তিনি। তবে বিবাহের প্রসঙ্গ তুললেও কোন চরিত্রকে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ করেনি এখানেই পুরানো ভাবধারাকে সমর্থন করতে দেখা গেছে।

শিক্ষা সম্পর্কে নিরুপমা দেবীর ভাবনা অনুরূপা দেবীর মতই। তাঁর রচিত 'অন্নপূর্ণার মন্দির', 'উচ্ছৃঙ্খল', 'দিদি', 'শ্যামলী' প্রভৃতি উপন্যাসগুলিতে চোখ রাখলে দেখা যাবে- সমাজবিধান, রক্ষণশীলতা এবং এগুলিকে মেনে চলার প্রবণতা। নারী হয়ে জন্মানো অপরাধ, সমাজবিধান কি করে একটা পরিবারকে নির্যাতন করে তার দৃশ্য, দরিদ্র পরিবারে কন্যার পিতার লাঞ্ছনা, সমাজপতিদের শাসনদন্ড, নারীদের আর্থিক অস্বচ্ছলতা ও সমাজের চাপ থেকে আত্মহত্যার পথ বেছে নেওয়া প্রভৃতি বিষয় লক্ষ করা যায়। ব্রাহ্মসমাজের প্রভাবে পড়ে হিন্দু পরিবারে নারী শিক্ষার প্রসার কিছুটা শিথিল হয়ে আসার পরিচয় পাওয়া গেলেও লেখিকার মধ্যে দ্বিধার পরিচয় 'দিদি' উপন্যাসে লক্ষণীয়। সমাজবিধান অনুযায়ী বড় সন্তানের আগে না বিবাহ হলে আর বিবাহ স্থির হয়ে যাবার পর ভেঙে গেলে জাতিচ্যুত করা হবে এই বিষয় লক্ষ করা যায়। তাঁর রচনায় সমাজ বিধান অত্যন্ত ক্রিয়াশীল, এর বিরুদ্ধে প্রতিবাদ দেখা যায় না, বিধবা বিবাহের প্রসঙ্গ এলেও তাঁর রচনায় তিনি এড়িয়ে যান। বিধবা বিবাহ আইন স্বীকৃত হলেও তিনি নিশ্চুপ থেকেছেন। আনুরুপা দেবীর মতোই একরকম পথেই হেঁটেছেন তিনি।

শান্তাদেবীর রচনায় শিক্ষাকে স্বনির্ভরতার, আত্ম বিকাশের পথ হিসাবে দেখা যায়। শান্তাদেবী, অনুরূপা দেবী ও নিরুপমা দেবীর থেকেও আধুনিক প্রগতিশীল শিক্ষায় বেড়ে উঠেছিলেন। আর এই জীবনে পরিবেশের ভিন্নতার কারণেই শিক্ষাকে কেন্দ্র করে তাঁর ভাবনায় মৌলিক পার্থক্য। শান্তাদেবীর জীবনে পাওয়া প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষার ছোঁয়া তাঁর

রচনায় ধরা আছে। এছাড়াও শান্তাদেবী ব্যক্তিজীবনে অরন্ধন, বঙ্গভঙ্গ প্রতিরোধ, রাখিবন্ধনের মত দেশপ্রেমমূলক কাজে অংশগ্রহণ করেছিলেন। তাঁর রচনায় পুত্র ও কন্যা সন্তানের মধ্যে বৈষম্য ও এই বৈষম্যকে কেন্দ্র করে কন্যা সন্তানের প্রতিবাদ প্রভৃতি বিষয় লক্ষ করা যায়। এছাড়া শিক্ষাকে নিয়ে প্রবীণদের কটাক্ষ, গ্রাম ও শহরের জীবনযাত্রার পার্থক্য, প্রেম ও বিবাহকে কেন্দ্র করে নর-নারীর মানসিক দিক, প্রচলিত প্রথাকে কেন্দ্র করে নবপ্রজন্মের প্রতিবাদ ও অভিমত, পাত্র নির্বাচনের হাতিয়ার রূপে শিক্ষা, নিজের মত অনুযায়ী বিবাহ করা, অধিক বয়সে বিবাহ, নারী-পুরুষে স্বাভাবিক মেলামেশাও সহজ বন্ধুত্ব প্রভৃতি বিষয়গুলি লক্ষ করা যায়। অর্থাৎ সনাতন প্রথার বিপরীতমুখী চলন- এটাই তাঁর রচনা বৈশিষ্ট্য।

জ্যোতির্ময়ী দেবী নারীমুক্তির নির্ভুল দৃষ্টিকোণ চিনেছিলেন। তাঁর গড়া নারী চরিত্রগুলিকে বিচলিত হতে দেখা যায় নারী-পুরুষের অবস্থান-বৈষম্যে, আর্থিক স্বাধীনতাকে ভিত্তি করে নিজের পায়ে দাঁড়িয়েছে, খুঁজে নিয়েছে নিজের পথ, পুরুষ-নিরপেক্ষ ভাবে খুঁজে নিয়েছে নিজের জীবনের সংজ্ঞা। আমাদের সমাজে মেয়েদের অবস্থান যে কোথায় তাই তিনি খুঁজে চলেছেন তাঁর সাহিত্যে। মধ্যবিত্ত মেয়ের স্বনির্ভর হওয়ার প্রয়াস, বারানসীর হিন্দু বিধবার অসহায়তা, রাজস্থানের নির্যাতিতা নারীর বেদনা, পতিতালয়ের নারীর জীবন- এই রকম নানান দৃষ্টিকোণ থেকে নারী জীবনের বিচিত্র টুকরো ছবি স্থান পেয়েছে তাঁর রচনায়। এছাড়াও দেশভাগ ও মন্বন্তরের মত রাজনৈতিক অভিঘাতের কবলে পড়ে নারীর যন্ত্রণার চিত্রও তাঁর লেখায় স্পষ্ট। জ্যোতির্ময়ী দেবীর রচনার স্বাতন্ত্র্য আরও এক জায়গায় শিক্ষা তাঁর নায়িকাদের কাছে পুরুষের যোগ্য সঙ্গিনী হবার জন্য নয়, নিজেদের প্রয়োজন ও স্বসম্পূর্ণতার জন্য তাদের শিক্ষা। এছাড়া তাঁর স্বাতন্ত্র্যতা চোখে পড়ে অন্য অরেকটি ক্ষেত্রে। তাঁর নারীরা বিদ্রোহে হঠাৎ জ্বলে ওঠেনা তারা সকলেই শান্ত

সমুন্নত। জীবনের মার সহ্য করতে হলেও, তাতে সংকল্পচ্যুত হয় না জ্যোতির্ময়ী দেবীর নায়িকারা, তাঁর সুতারা, সুপ্রিয়া, বীনা- সবাই খোঁজে নারীর এক নতুন পরিচয়, নারীত্বকে ছাপিয়ে পৌঁছে যায় মানুষ পরিচয়ে।

শৈলবালা ঘোষজায়ার রচনার প্রধান বিষয়ই হল অবহেলিত, বঞ্চিত ও অবদমিত নারীসমাজ। সমাজে নারী-পুরুষের বৈষম্যকে তিনিও দেখান। এছাড়াও সংসারে পুরুষের কর্তৃত্ব, শিক্ষা, স্বাস্থ্য, ধর্ম, জীবনযাপন প্রণালী প্রভৃতি ক্ষেত্রে নারী-পুরুষে অসাম্য, ধর্ম, মেয়েদের বেশি বয়সে বিবাহ, চাকরি, বাইরে যাওয়া অর্থাৎ বহির্জীবনকে দেখার আকাঙ্খা, বুদ্ধিমত্তার জোরে আত্মপ্রতিষ্ঠা, সাধুদের কপটাচারের বিরুদ্ধতা, জাতপাত সমস্যা, সমাজে নারীর অবস্থান প্রভৃতি দিকগুলি তাঁর রচনায় দেখা যায়। তাঁর রচিত ‘সেখ আন্দু’, ‘ঘৃণাহতা’, ‘জন্ম-অভিশপ্তা’, ‘অভিশপ্ত সাধনা’, ‘তেজস্বতী' প্রভৃতি রচনাগুলির মধ্যেই উপরিউক্ত বিষয়গুলি দেখতে পাওয়া যায়। এছাড়াও পিতৃতন্ত্রের দম্ভ ‘জামাইবাবু’ নামক গল্পের জামাইবাবু চরিত্রের মধ্যে দিয়ে দেখা যায়, সেখানে মেয়েদের শক্ত শাসনে রাখার কথা বলা হয়েছে, যেখানে পুরুষের দৃষ্টিতে মেয়েরা আলাদা জাত বলে চিহ্নিত হয়েছে। মেয়েদের সম্মানটা কোথায় সে প্রশ্নের উত্তরে যেন এক নারীবাদী আন্দোলনেরই ডাক দিয়ে গেছেন যা পাঠক সমাজের কাছে অনন্যরুপে ধরা দেয়। নারীর শিক্ষাকে প্রাধান্য দিয়েও শিক্ষিতা, চাকুরীরত নারীর উপরও অত্যাচার হওয়ার ছবি দেখিয়েছেন ‘জন্ম অভিশপ্তা’ উপন্যাসে, এখানে অর্থনৈতিকভাবে স্বাবলম্বী হওয়ার পরও নারীকে স্বামীর হাতে নৃশংস ভাবে মার খেতে দেখা গেছে। এইভাবে এখানে ভায়োলেন্সের ছবি দেখা যায়।

আর্থিকভাবে স্বাবলম্বী না হওয়া নারীকেও একই সমস্যায় পড়তে দেখা গেছে ‘অরু’ উপন্যাসে, এখানে স্বামীর মৃত্যুর পর বৈধব্য প্রাপ্তির মধ্যে দিয়ে নারীকে এসব

সমস্যা থেকে মুক্তি পেতে দেখা গেছে, সবশেষে শিক্ষার মাধ্যমে জীবনে বেঁচে থাকার পথ পেতে দেখা যায়। এছাড়াও 'বিনীতাদি' উপন্যাসে শিক্ষিতা নারীকে মুক্ত ভাবে থাকতে চাওয়ার জন্য বিয়ে না করে একা থাকার পথ বেছে নিতে দেখা যায়। এভাবে নারীকে বিবাহ, ঘরের কাজে আটকে না রেখে স্বাধীন, স্বনির্ভর করে দেখিয়েছেন। 'গঙ্গাপুত্র' উপন্যাসে লালু নামের ডোম চরিত্র, যাকে তার কাজের জন্য এক ব্রাহ্মন অন্তরের শ্রদ্ধা জানিয়েছে, এইভাবেই ব্রাহ্মনের থেকেও মহৎ করে তোলার মধ্যে দিয়ে সেইসময়ের হিসাবে যেন এক আলাদা ভাবনার প্রকাশ ঘটিয়ে অভিনবত্ব দেখিয়েছেন। এছাড়াও 'সেখ আন্দু' যে সময় লিখছেন সেখানেও মুসলমান যুবক আন্দু ও হিন্দু বিধবার প্রেম এবং হিন্দু মনিবের পরিবারের সঙ্গে ভালো সম্পর্ক দেখিয়ে সে সময় জাতপাতের উর্দ্ধে গিয়ে মানবতাকে বড় করে তুলেছেন, পাশাপাশি বিধবার মধ্যে প্রেমের অনুভূতি থাকলেও তাদের বিয়ের দৃশ্য না দেখানোর মধ্যে দিয়ে পুরানো ধারণাকে প্রাধান্য দেওয়ার মনোভাব দেখা যায়। তবে বিধবা বিবাহের ক্ষেত্রে তাঁর উপলব্ধি থেকে প্রান্তিক নিম্নবর্ণের জীবন যাত্রায় বিধবার বিবাহকে অনেকটা সহজ করে দেখিয়েছেন, তাই তাঁর ভাবনার মধ্যে বিধবার বিয়ে দেওয়ার ক্ষেত্রে সমাজের অবস্থান গুরুত্বপূর্ণ। এসবকিছু ভাবনা তাঁর থাকলেও বিধবাকে কোথাও তিনি নিয়মপালনের গণ্ডিতে বাঁধেননি। এখানেও তিনি দেখার দিক থেকে একটা আলাদা মাত্রা পেয়ে যান। এইভাবেই মেয়েদের শিক্ষা, স্বাস্থ্য, আর্থিক স্বাধীনতা, মানবতা, জ্যোতিষ বিদ্যার প্রতি বিশ্বাস, মানুষে-মানুষে বিরোধ, পাহাড়ি মানুষের জীবনযাত্রা, লেখালিখি করতে নানান বাধাবিপত্তি, টাকার দাপটে জমিদার শ্রেণীর মানুষের কুকর্ম চাপা পড়ে যাবার ঘটনা, সমাজে পুলিশের ভুমিকার বাস্তব চেহারা প্রভৃতি সাহিত্যে তুলে ধরেছেন, যা তাঁর সময়ের থেকে অনেক এগিয়ে। এইভাবেই তাঁর লেখা স্বমহিমায় স্বাতন্ত্র্যতা লাভ করেছে।

তথ্যসূত্র

১। গোলাম মুরশিদ, ১৯৯৩, নারী প্রগতির একশো বছর : রাসসুন্দরী থেকে রোকেয়া', ঢাকা, অবসর, পৃষ্ঠা- ৬০

২। ঐ, পৃষ্ঠা- ৪

৩। ঐ, পৃষ্ঠা- ৩৬

৪। রাসসুন্দরী দেবী, ১২৮৩ বঙ্গাব্দ, আমার জীবন (প্রথম সংস্করন, কলকাতা, পৃষ্ঠা- ৩১

৫। গোলাম মুরশিদ, ১৯৯৩, নারী প্রগতির একশো বছর : রাসসুন্দরী থেকে রোকেয়া, ঢাকা, অবসর, পৃষ্ঠা- ৫৭

৬। ঐ, পৃষ্ঠা- ৭২

৭। ঐ, পৃষ্ঠা- ৯২

৮। ঐ, পৃষ্ঠা- ১০০

৯। ঐ, পৃষ্ঠা- ১০৭

১০। ঐ, পৃষ্ঠা- ১১৭

১১। আবদুর রাউফ ও অন্যান্য সম্পাদিত, ২০০৬, রোকেয়া রচনা সংগ্রহ : মতিচূর (প্রথম খন্ড), স্ত্রীজাতির অবনতি, কলকাতা, বিশ্বকোষ পরিষদ, পৃষ্ঠা- ২৩

১২। আবদুর রাউফ সম্পাদিত, ২০০৬, রোকেয়া রচনা সংগ্রহ : 'মতিচূর (দ্বিতীয় খন্ড), শিশুপালন, কলকাতা, বিশ্বকোষ পরিষদ, পৃষ্ঠা- ১১৭

১৩। উদ্ধৃত, হাসনা বেগম, নৈতিকতা, নারী ও সমাজ, ১৯৯০, ঢাকা, বাংলা একাডেমি, পৃষ্ঠা-১০। আমরা দেখেছি অধ্যাপক মোঃ আবদুল মান্নান, খানমমেরী, নারী ও রাজনীতি, ২০০৬, ঢাকা, অবসর, পৃষ্ঠা- ২৭৫

১৪। আবদুর রাউফ সম্পাদিত, রোকেয়া রচনা সংগ্রহ, মতিচূর (প্রথম খন্ড), নিরীহ বাঙালী, কলকাতা, বিশ্বকোষ পরিষদ, ২০০৬, পৃষ্ঠা– ২৮

১৫। অরুন্ধতি সুর (রায়), জুলাই ২০১১, নারীর কলমে নারীর কণ্ঠ : আইন এবং সমাজ বিধান (১৯১৪-১৯৪৫), কলকাতা, সহযাত্রী, পৃষ্ঠা- ৭৬

১৬। ঐ, পৃষ্ঠা- ৭৮

১৭। ঐ, পৃষ্ঠা- ৭৯

১৮। ঐ, পৃষ্ঠা- ৯৫

১৯। ঐ, পৃষ্ঠা- ১০৭

২০। ঐ, পৃষ্ঠা- ১০৮

২১। জ্যোতির্ময়ীদেবী, ১৩৮০ আষাঢ়, সোনা রুপা নয়, কলকাতা, মিত্র ঘোষ, পৃষ্ঠা- ৪৪

২২। ঐ

২৩। ঐ, পৃষ্ঠা- ৪৫

২৪। ঐ

২৫। ঐ

২৬। ঐ, পৃষ্ঠা- ৪৮

২৭। ঐ, পৃষ্ঠা- ৪৭২

২৮। ঐ

২৯। ঐ

৩০। ঐ, পৃষ্ঠা- ৪৭৩

৩১। ঐ

৩২। ঐ, পৃষ্ঠা- ৩৬০

৩৩। ঐ

৩৪। ঐ, পৃষ্ঠা- ৩৬৯

৩৫। ঐ, পৃষ্ঠা- ১৮২

উপসংহার

শুরুর কথার হাত ধরে ‘শৈলবালা ঘোষজায়ার কথাসাহিত্য (নির্বাচিত): একটি মূল্যায়ন’– নামক অভিসন্দর্ভটি যেভাবে বিশ্লেষণের মাধ্যমে অধ্যায় ভিত্তিক ভাবে সেজে উঠেছে তা নিম্নরূপ-

ভূমিকা, লেখিকার ব্যক্তিজীবন ও দেশ-কাল-পটভূমি, সাহিত্যকৃতির দুই ধারা, শৈলবালা ঘোষজায়ার রচনার গদ্যশৈলী, সমকালীন মেয়েদের লেখালিখির জগৎ ও শৈলবালা ঘোষজায়া, উপসংহার ও গ্রন্থপঞ্জি। প্রত্যেকটা অধ্যায়ের কথা শেষে এখন সিদ্ধান্তের উপস্থাপনা পর্ব। এই সূত্রে প্রতিটা অধ্যায়ের কিছু কথা বলে নেবার পালা।

প্রথম অধ্যায় ‘লেখিকার ব্যক্তিজীবন ও দেশ–কাল–পটভূমি’ এখানে লেখিকার সময়কালের রাজনৈতিক পরিসর, মেয়েদের রাজনীতিতে বাড়ির বাইরের কর্মকান্ড, মেয়েদের শিক্ষা লাভের কথা, ভোটদানের প্রয়োজনীয়তা, মেয়েদের জীবনচর্যা, কর্মসংস্থান ইত্যাদি নানান বিষয়কে দেখানো হয়েছে। এই সূত্রে এই সময়কার কিছু ঘটনা যা তাঁর মনকে নাড়া দেয় সেরকম দৃশ্যও সাহিত্যে প্রকাশ করতে দেখা যায়। তাই সাহিত্য ও সমাজ যেন মিলেমিশে একাকার।

দ্বিতীয় অধ্যায় ‘সাহিত্যকৃতির দুই ধারা’-

(ক) শিক্ষামূলক রচনা।

(খ) সমাজ কেন্দ্রিক রচনা।

শিক্ষামূলক রচনার মধ্যে মেয়েদের শিক্ষা, যুক্তিপূর্ণ কথা বলা ও সাবলম্বী হওয়ার ছবি দেখা যায়। এছাড়াও শিক্ষাকে বেছে নিয়ে নারী কখনও যুক্তিবাদী কখনও স্বনির্ভর। তবে

স্বনির্ভর হয়েও নারীকে স্বামীর অত্যাচারের শিকার হতেও দেখা যায়। পাশাপাশি শিক্ষিত নারী লেখাকে পেশা হিসেবে বেছে নিলে তাকেও এক ঘরে করে রাখার মত ঘটনা আমরা পেয়েছি তাঁর সাহিত্যে।

শিক্ষার পাশাপাশি আসে সমাজের বিভিন্ন দিক যেমন- জাতির ভিত্তিতে পেশা নির্বাচন, ধর্মগুরু স্থানীয় মানুষের সান্নিধ্যে বিপদে পড়ার মতো ঘটনা, নারী হরণ, সতীত্ব নষ্ট ও খুনের দৃশ্য, টাকা দিয়ে জমিদার শ্রেণীর মানুষের কুকর্ম চাপা পড়ে যাবার বিষয়, ইমানদারীর প্রসঙ্গ, পাপ–পূণ্য ভাবনা, সমাজে পুলিশ –এর ভূমিকার প্রসঙ্গ প্রভৃতি দেখা যায়।

তৃতীয় অধ্যায় ‘ শৈলবালা ঘোষজায়ার রচনার গদ্যশৈলী’– এখানে যে সমস্ত বিষয়কে উপস্থাপনা করে দেখিয়েছি তা একেবারে অন্যরকম। শৈলবালা ঘোষজায়ার রচনা সম্ভারের যে পরিসর, তা প্রাচুর্যের আতিশয্যে ভরপুর। সেই সম্ভারে আছে গল্প, উপন্যাস, নাটক প্রভৃতি নানাবিধ প্রকরণ। কথাসাহিত্য নিয়ে আলোচনার সূত্রে যে সমস্ত রচনার সঙ্গে পরিচিত হয়েছি তা থেকে লেখন রুচি, মেজাজ, চরিত্র যা তরতরিয়ে এগিয়ে যায়। তাঁর গদ্যরীতি অত্যন্ত সুখ পাঠ্য, সেখানে শুরু থাকলেই শেষ করার ধাপে এগিয়ে যায় মন দ্রুত গতিতে। তাঁর সাহিত্যসম্ভারে থাকা গদ্যশৈলীর যে সমস্ত উপাদানে এ অধ্যায়টি অন্যরূপ লাভ করে, সেগুলি আলোচনায় সাজিয়েছি তা হল নিম্নরূপ-

১। চরিত্র অনুযায়ী ভাষা যোজনা।

২। শব্দদ্বিত্বের ব্যবহার।

৩। মেয়েলি ভাষা ছাঁদ।

৪। সাঙ্কেতিক ভাষার ব্যবহার।

৫। প্রশ্নোত্তর চলনের গদ্য ব্যবহার।

৬। কথন।

৭। কথনকাল-কাহিনীকাল, চরিত্র ও সংলাপ।

৮। লোকগত উপাদানের ব্যবহার।

৯। সমান্তরাল বাক্যের চলন।

সবশেষে ‘সমকালীন মেয়েদের লেখালেখির জগৎ ও শৈলবালা ঘোষজায়া’ এই অধ্যায়ে সমকালীন অন্যান্য লেখিকাদের সঙ্গে কোথায় মতের মিল ও কিভাবে তিনি দেখেছেন সেই বিষয়টা দেখানো হয়েছে। এখানে সমকালীন কয়েকজন লেখিকা যাঁদের কিছু ভাবনা দেখিয়েছি, তাঁরা হলেন- বেগম রোকেয়া, অনুরূপা দেবী, নিরুপমা দেবী, জ্যোতির্ময়ী দেবী, সীতা দেবী, শান্তা দেবী।

অন্তঃপুরের কড়া পর্দার আড়ালে কাটানো জীবনকে পিছনে ফেলে উনিশ শতকীয় নবজাগরণের আলোয় নারী যখন আলোকিত তখনই জগৎ ও জীবনকে বুঝে নেওয়ার তাগিদেই নারীর মনে জাগল শিক্ষার প্রতি আগ্রহ। তাইতো উনিশ শতকের গোড়ার দিকে খ্রিস্টান মিশনারীদের উদ্যোগে কলকাতা ও তার পার্শ্ববর্তী এলাকায় মেয়েদের শিক্ষা বিস্তারের কথা মাথায় রেখে বেশ কয়েকটি বালিকা বিদ্যালয় স্থাপিত হয়েছিল। সে সময় প্রতি ঘরে যে এই শিক্ষার আলো পৌঁছেছিল তা একেবারেই নয়। অক্ষরজ্ঞানের সঙ্গে স্বচ্ছলতার বিষয়টাও ছিল অঙ্গাঙ্গীভাবে ভাবে জড়িত। এছাড়াও মেয়েদের লেখাপড়া নিয়ে

রক্ষণশীল সমাজের মনোভাব ছিল কঠোর তাইতো সেদিন ঈশ্বর গুপ্তকেই মেয়েদের পড়াশোনা করাকে ব্যাঙ্গ করে কবিতা লিখতে দেখা যায়।

তবে যাই হোক সেদিন যে সমস্ত মেয়েরা এ সমস্ত বিদ্রূপ উপেক্ষা করে পুরুষের চোখে দেখা নারীর জীবনকে বাদ দিয়ে নিজেদের কলমে নিজেদের জীবনকে তুলে ধরতে এগিয়ে এসেছিলেন তারা চিরস্মরণীয় হয়ে আছেন ও চিরকাল থাকবেন। তাদের কলমের প্রতিটা বিন্দু অমরত্ব লাভ করেছে সাহিত্যের পাতায়। এইভাবে এই প্রতিকূল সময়েও যারা লেখার মাধ্যমে আত্মপ্রকাশ করেছেন সেই রকম কয়েকজন বিদুষী নারীর কিছু কথা এখন আমরা আলোচনার মাধ্যমে স্মরণ করার চেষ্টা করব। উনিশ শতকের হাত ধরে মেয়েদের লেখালিখির যে সূচনা বিশশতকে তার ব্যাপ্তি তাই এই সময়টা সম্পর্কে আমরা সংক্ষেপে জেনে নেওয়ার চেষ্টা করব।

উনিশশতকে মেয়েদের লেখালিখি নিয়ে ব্যাঙ্গ বিদ্রূপের ছবি আগেই দেখেছি। এছাড়াও সামাজিক মর্যাদার দিক থেকেও নারী ছিল পিছিয়ে। এই সময় পরিস্থিতির শিকার হয়েও যে কয়েকজন নারী নিজস্ব কাজের মধ্য দিয়ে সরবে বা নীরবে সমাজকে প্রতিবাদ জানিয়ে গেছেন তাঁদের মধ্যে রাসসুন্দরী দেবী, কৈলাস বাসিনী দেবী, জ্ঞানদা নন্দিনী দেবী, কৃষ্ণভাবিনী দাস, স্বর্ণকুমারী দেবী প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য।

যখন বিশ শতকের দোরগোড়ায় নারী উত্তীর্ণ তখনই তারা তাদের অর্জিত অভিজ্ঞতা-উপলব্ধীর ভিত্তিতে জীবন ও জগৎকে নতুনভাবে দেখে নিতে চেয়েছিল। যুক্তির দ্বারা নারী তখন পুষ্ট। এইভাবেই নারী সেদিন বিভিন্ন পরিস্থিতি ও অবস্থানকে অন্যভাবে দেখতে শিখে ভাবধারায় এনেছিল ব্যাপ্তি। নারী চেতনা ও চিন্তাধারা তখন পেয়েছিল আরও উর্বর ভূমি। যে ভূমিতে নারীর মন পেল অনেকটা স্বাধীন ভাবে বিচরণের পথ। নারী মন

তখন দর্শন, যুক্তি, বিজ্ঞানে আরও সমৃদ্ধ। এই প্রাপ্তি ও সমৃদ্ধিকে আঁকড়ে ধরে বাংলা সাহিত্য জগতে তাঁরা যা কিছু সৃষ্টি করে গেছেন তার অবদান অসামান্য। এইভাবে নারীর নিজস্ব পরিসর খুঁজে নেওয়ার তাগিদে এসময় অনেকে লেখালিখি করেছিলেন তাদের প্রত্যেকের নাম সাহিত্যে অমরত্ব লাভ করেছে। আমরা এই অধ্যায়ের বিশ্লেষণে শৈলবালা ঘোষজায়ার সমসাময়িক কয়েকজন লেখিকার অভিজ্ঞতা-উপলব্ধীর কথা জেনে মতামতের বিষয়টি বর্ণনা করেছি।

লেখিকার রচনার মাধ্যমে সমাজ, শিক্ষা যেমন দেখতে পেয়েছি তেমনই অন্যান্যদের সঙ্গে তাঁর ভাবনার তফাৎও দেখা গেছে। পাশাপাশি গদ্যশৈলীতে পটভূমি ও চরিত্রের নিরিখে ভাষা, লোকগত উপাদানের মাধ্যমেও সমাজকে দেখতে পাওয়া যায়। এইভাবেই লেখার মধ্যে সে যুগের সময়ের ছাপ আমরা যেমন পাই, তেমনই বর্তমান সময়েরও তাৎপর্য রেখে যায়। লেখার মাধ্যমেই তিনি বাংলা সাহিত্যকে সমৃদ্ধি দান করেছেন। এই সমৃদ্ধ সাহিত্যের আলোচনার হাত ধরে শুরু থেকে সিদ্ধান্তে পৌঁছানো পর্যন্তই হল আমার গবেষণা অভিসন্দর্ভের ইতিকথা।

গ্রন্থপঞ্জি

ক। আকর গ্রন্থ-

১। অরুন মুখোপাধ্যায় (সম্পা.), ১৪২৬ ব , শৈলবালা ঘোষজায়া সেরা পাঁচটি উপন্যাস, কলকাতা , মিত্র ঘোষ।

২। শৈলবালা ঘোষজায়া, ২০১৭, শেখ আন্দু, কলকাতা, চিরায়ত প্রকাশন।

৩। শৈলবালা ঘোষজায়ার গল্প সংকলন, ২০০০, কলকাতা , দে'জ ।

৪। শ্রী শৈলবালা ঘোষজায়া, আশ্বিন ১৩২৮ ব, জন্ম-অভিশপ্তা, কলকাতা, গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এন্ড সন্স।

৫। শ্রী শৈলবালা ঘোষজায়া, (বৈশাখ ১৩২৬ - ফাগুন ১৩২৭) ইমানদার, ভারতবর্ষ পত্রিকা।

৬। শ্রী শৈলবালা ঘোষজায়া, করুণা দেবীর আশ্রম, কলকাতা, গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এন্ড সন্স।

৭। শ্রী শৈলবালা ঘোষজায়া, চৈত্র ১৩২৯, অকাল কুষ্মাণ্ডের কীর্তি, কলকাতা, গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এন্ড সন্স।

৮। শ্রী শৈলবালা ঘোষজায়া, তেজস্বতী, কলকাতা, গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এন্ড সন্স।

৯। শ্রী শৈলবালা ঘোষজায়া, ফাল্গুন ১৩৩১ ব, অবাক, কলকাতা, গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এন্ড সন্স।

১০। শ্রী শৈলবালা ঘোষজায়া, রঙীন ফানুস, কলকাতা, গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এন্ড সন্স।

খ। সহায়ক গ্রন্থ–

১। অনামিকা চক্রবর্তী, বইমেলা ২০১৪, জ্যোতির্ময়ী দেবী জীবন ও সাহিত্য, কলকাতা, বঙ্গীয় সাহিত্য সংসদ।

২। অমিতাভ দাস, মার্চ ২০১৪ আখ্যানতত্ত্ব, কলকাতা, ইন্দাস পাবলিশার্স অ্যান্ড বুকসেলার্স।

৩। অমিত্রসূদন ভট্টাচার্য (সম্পা.), শ্রাবণ ১৪০৮, বিংশ শতাব্দীর নারী-ঔপন্যাসিক, কলকাতা, পূর্বা।

৪। অরুন্ধতী সুর (রায়), জুলাই ২০১১, নারীর কলমে নারীর কণ্ঠ : আইন এবং সমাজ-বিধান, কলকাতা, সহযাত্রী।

৫। অরূপ আচার্য (সম্পা.), জানুয়ারী ২০০৬, একান্তর একাদশী, কলকাতা, একান্তর।

৬। অলোক রায়, জানুয়ারি ২০১৬, বিশ শতক, কলকাতা, প্রমা প্রকাশনী।

৭। আশিসকুমার দে, জানুয়ারি ১৯৯২, সাহিত্যালোচনা ও শৈলীবিজ্ঞান, কলকাতা, সাহিত্য প্রকাশ।

৮। ইন্দিরা মুখোপাধ্যায়, এপ্রিল ২০২৪, প্রবাদের খইচুবড়ি, কলকাতা, মান্দাস।

৯। উদয় চাঁদ দাস, ফেব্রুয়ারি ২০০৯, আখ্যানের সম্প্রসারণ : উনিশ শতক বিশ শতক, বর্ধমান, বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়।

১০। উপেন কিসকু (সম্পা.), ভাদ্র ১৪০৫, লোকশ্রুতি, কলকাতা, লোকসংস্কৃতি ও আদিবাসী সংস্কৃতি কেন্দ্র।

১১। কল্যাণী বন্দ্যোপাধ্যায়, এপ্রিল ২০০৯, নারী শ্রেণী ও বর্ণ, কলকাতা, মিত্রম্।

১২। গোলাম মুরশিদ, জানুয়ারি ২০০১, নারী প্রগতি : আধুনিকতার অভিঘাতে বঙ্গরমনী, কলকাতা, নয়া উদ্যোগ।

১৩। গোলাম মুরশিদ, বইমেলা ২০১৩, নারী প্রগতির একশো বছর : রাসসুন্দরী থেকে রোকেয়া, ঢাকা, অবসর।

১৪। চিত্রিতা বন্দ্যোপাধ্যায় (রায়), আগস্ট ২০০৪, কলকাতা, অক্ষর প্রকাশনী।

১৫। ড. অরুণকুমার বসু, বৈশাখ ১৩৮৮, বাঙলা গদ্য জিজ্ঞাসা, কলকাতা, সমতট প্রকাশনী।

১৬। ড. জয়ন্তী মন্ডল, সেপ্টেম্বর ২০১৪, উনবিংশ শতাব্দীর স্ত্রীশিক্ষা আন্দোলন ও বাংলা সাহিত্য, কলকাতা, দে পাবলিকেশনস।

১৭। ড. মাধবী দে, এপ্রিল ২০০৩, শান্তা দেবী ও সীতা দেবী, কলকাতা, সাহিত্যলোক।

১৮। ড. শীলা বসাক, মার্চ ১৯৯৮, বাংলা ধাঁধার বিষয়বৈচিত্র ও সামাজিক পরিচয়, কলকাতা, পুস্তক বিপণি।

১৯। তপতী ভট্টাচার্য, এপ্রিল ২০০৯, প্রতীচ্য ভাবনা ও বঙ্গীয় নারী জাগরণ, কলকাতা, অরুণা প্রকাশন।

২০। তপোধীর ভট্টাচার্য, জানুয়ারী ২০০৭, নারীচেতনা : মননে ও সাহিত্য, কলকাতা, পুস্তক বিপনি।

২১। দূর্বা দেব, বইমেলা ২০০৭, আত্মজীবনীর স্থাপত্য, কলকাতা, বঙ্গীয় সাহিত্য সংসদ।

২২। দেবাশিস বসু, বইমেলা ২০১০, বাংলা ছড়ায় সমাজ ভাবনা, কলকাতা, একুশ শতক।

২৩। পবিত্র সরকার, ফেব্রুয়ারি ১৯৮৫, গদ্যরীতি পদ্যরীতি, কলকাতা, সাহিত্যলোক।

২৪। পবিত্র সরকার, বৈশাখ ১৪১০, লোকভাষা লোকসংস্কৃতি, কলকাতা, চিরায়ত প্রকাশন প্রাইভেট লিমিটেড।

২৫। পরেশচন্দ্র মজুমদার ও অভিজিৎ মজুমদার, পৌষ ১৪১৬, বাঙলা সাহিত্যপাঠ : শৈলীগত অনুধাবন, কলকাতা, দে'জ পাবলিশিং।

২৬। পায়েল বসু, মাঘ ১৪২৯, আঁকা ছবি লেখা ছবি, কলকাতা, দে'জ পাবলিশিং।

২৭। পুলক চন্দ (সম্পা.), জুলাই ২০০৮, নারীবিশ্ব, কলকাতা, গাঙচিল।

২৮। প্রসুন ঘোষ ও অহনা বিশ্বাস (সম্পা.), সেপ্টেম্বর ২০১৮, অন্দরের ইতিহাস : নারীর জবানবন্দী, কলকাতা, গাঙচিল।

২৯। বাসবী চক্রবর্তী (সম্পা.), নভেম্বর ২০১১, নারীপৃথিবী : বহুস্বর, কলকাতা, উর্বী প্রকাশন।

৩০। ভব রায়, বৈশাখ ১৪০৮, বাংলার লোকবৃত্ত ও লোকসংস্কৃতি বিচিত্রা, কলকাতা, জয়দুর্গা লাইব্রেরী।

৩১। ভারতী রায় (সম্পা.), জানুয়ারি ২০১৬, প্রবাসী- তে নারী, কলকাতা, আনন্দ পাবলিশার্স।

৩২। ভারতী রায় (সম্পা.), ডিসেম্বর ২০১৪, নারী ও পরিবার : বামাবোধিনী পত্রিকা, কলকাতা, আনন্দ পাবলিশার্স।

৩৩। মফিদুল হক, ২০০৯, নারীমুক্তির পথিকৃৎ, কলকাতা, কথা।

৩৪। মৈত্রেয়ী চট্টোপাধ্যায়, জানুয়ারি ১৯৯৯, বাঁধন ছেঁড়ার সাধন, কলকাতা, প্রতিক্ষণ পাবলিকেশনস্।

৩৫। যশোরধরা বাগচী, মার্চ ২০১২, নারী ও নারীর সমস্যা, কলকাতা, অনুষ্টুপ।

৩৬। রাজশ্রী বসু ও বাসবী চক্রবর্তী (সম্পা.), জুন ২০০৮, প্রসঙ্গ : মানবীবিদ্যা, কলকাতা, উর্বী প্রকাশন।

৩৭। শর্মিষ্ঠা দত্তগুপ্ত, মে ২০০৭, পথের ইঙ্গিত, কলকাতা, স্ত্রী।

৩৮। শিউলি বসাক, অগাস্ট ২০১৮, মনোভাষাবিজ্ঞানঃ শিশুর ভাষা, কলকাতা, চিলেকোঠা।

৩৯। শিশিরকুমার দাশ, বৈশাখ ১৪১৭, ভাষাজিজ্ঞাসা, কলকাতা, প্যাপিরাস।

৪০। শুক্লা ঘোষাল (সম্পা.), জুন ২০১৫, বঙ্গে নারী নির্যাতন ও নারীর উত্থান, কলকাতা, আনন্দ পাবলিশার্স।

৪১। শ্যামলী বসু, ২০১৮, সেকাল ও সেকালিনী, কলকাতা, সুবর্ণরেখা।

৪২। শ্রী পবিত্র সরকার (সম্পা.), ফেব্রুয়ারি ২০০১, ভারতের সমাজ ভারতের নারী, কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষৎ।

৪৩। শ্রী ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, মাঘ ১৩৫৭ ব, বঙ্গসাহিত্যে নারী, কলকাতা, বিশ্বভারতী গ্রন্থালয়।

৪৪। সঞ্চয়িতা পাল চক্রবর্তী ও পৃথা কুণ্ডু, জানুয়ারি ২০১৯, অনন্যাদের আখ্যান : ভাবনা-কর্মে বাঙালি নারী, কলকাতা, গাঙচিল।

৪৫। সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায়, পৌষ ১৪০৯ ব, উনিশ - বিশের কড়চা, কলকাতা, মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স।

৪৬। সর্বাণী রায়, সেপ্টেম্বর ২০০২, মানুষ, প্রকৃতি ও প্রাণীজগৎ লোকসংস্কৃতির দর্পণে, কলকাতা, পুস্তক বিপণি।

৪৭। সিদ্ধার্থ বসু, বইমেলা ২০১৯, সেকালের নারীদের জীবন ও তাদের চেতনা, কলকাতা, সুরঙ্গমা।

৪৮। সুতপা ভট্টাচার্য, আগস্ট ২০১২, মেয়েলি আলাপ, কলকাতা, পুস্তক বিপনি।

৪৯। সুতপা ভট্টাচার্য, জানুয়ারি ২০০০, মেয়েলি পাঠ, কলকাতা, পুস্তক বিপনি।

৫০। সুতপা ভট্টাচার্য, জুলাই ২০১৮, মেয়েদের স্মৃতিকথা, কলকাতা, সিগনেট প্রেস।

৫১। সুতপা ভট্টাচার্য, ডিসেম্বর ২০০৩, মেয়েদের লেখালেখি, কলকাতা, পুস্তক বিপনি।

৫২। সুদক্ষিণা ঘোষ, ২০১৬, জ্যোতির্ময়ী দেবী, কলকাতা, সাহিত্য অকাদেমি।

৫৩। সুদক্ষিণা ঘোষ, ২০১৮, স্বর্ণকুমারী দেবী, কলকাতা, সাহিত্য অকাদেমি।

৫৪। সুদক্ষিণা ঘোষ, মাঘ ১৪১৪ ব, মেয়েদের উপন্যাসে মেয়েদের কথা : 'কাহাকে' থেকে 'সুবর্ণলতা', কলকাতা, দে'জ।

৫৫। সুধীর চক্রবর্তী (সম্পা.), মার্চ ২০১০, মেয়েদের কথাকল্প, কলকাতা, অক্ষর প্রকাশনী।

৫৬। সুনন্দা সিকদার, নভেম্বর ২০১২, দয়াময়ীর কথা, কলকাতা, গাঙচিল।

৫৭। স্বপন বসু ও হর্ষ দত্ত (সম্পা.), সেপ্টেম্বর ২০২০, বিশ শতকের বাঙালি জীবন ও সংস্কৃতি, কলকাতা, পুস্তক বিপনি।

৫৮। হুমায়ুন আজাদ, ফাল্গুন ১৪২২, নারী, ঢাকা, আগামী প্রকাশনী।

৫৯। Chatman, Seymour (ed), 1971, Literary Style : A symposium, London & New York, Oxford University Press

৬০। -1978, Story and Discourse : Narrative Structure in Fiction and Film, Ithaca & London, Cornell University Press

৬১। Cobley, Paul, 2001, Narrative, London & New York, Routledge

৬২। Lewis, C. Day, 1947, The Poetic Image, London, Jonathan Cape

৬৩। Stanzel F. K, 1988, A Theory of Narrative, Trans. C. Geoedsche, Cambridge, New York & Melbourne, Cambridge University Press

গ। পত্রিকা পঞ্জি-

১। অধ্যাপক আনন্দদেব মুখোপাধ্যায় (সম্পা.), আগস্ট ২০১২, মঞ্জুলা বিশ্বাস স্মারক বক্তৃতা, কলকাতা, বঙ্গীয় জাতীয় শিক্ষা পরিষৎ।

২। অমিত্রসূদন ভট্টাচার্য (সম্পা.), বৈশাখ - আষাঢ় ১৪২২, বিশ্বভারতী পত্রিকা, কলকাতা, বিশ্বভারতী গ্রন্থনবিভাগ।

৩। উৎপল ঝা, শ্রাবণ ১৪২২, সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকা, কলকাতা, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ।

৪। ড. মীরাতুন নাহার (সম্পা.), জানুয়ারী ২০০০, লুকানো রতন, কলকাতা, সুরাহা সম্প্রীতি।

৫। তাপস ভৌমিক (সম্পা.), ২০১৪ বইমেলা, কোরক সাহিত্য পত্রিকা : বাংলা আত্মজীবনী ও স্মৃতিকথা সংখ্যা, কলকাতা, কোরক।

৬। তাপস ভৌমিক (সম্পা.), ২০১৭ বইমেলা, কোরক সাহিত্য পত্রিকা : লেখিকাদের লেখালেখি, কলকাতা, কোরক।

৭। দীপঙ্কর মল্লিক (সম্পা.), আশ্বিন ১৪২০, তবু একলব্য, কলকাতা, দিয়া পাবলিকেশন।

৮। দেবব্রত চট্টোপাধ্যায় (সম্পা.), মে ২০১০, পরিকথা : বিস্মৃত বাংলা উপন্যাস, কলকাতা, শৈলী।

৯। রফিকউল্লাহ খান ও অমিতাভ চক্রবর্তী (সম্পা.), আগস্ট ২০১৯, বীক্ষা : বাংলা ভাষা ও সাহিত্য বিষয়ক গবেষণা পত্রিকা, দিল্লী, বাংলা একাডেমি ট্রাস্ট ও ঢাকা, বাংলা ভাষা ও সংস্কৃতি পরিষদ।

১০। শ্রী অরুন কুমার গুপ্ত (সম্পা.), আগস্ট ২০০৩, মঞ্জুলা বিশ্বাস স্মারক বক্তৃতা, কোলকাতা, বঙ্গীয় জাতীয় শিক্ষা পরিষৎ।

১১। শ্রী উমেশচন্দ্র দত্ত (সম্পা.), জ্যৈষ্ঠ ১৩২১, বামাবোধিনী পত্রিকা, ৯ নং আন্টনিবাগান লেন, ইন্ডিয়ান প্রেস।

১২। শ্রী উমেশচন্দ্র দত্ত (সম্পা.), বৈশাখ ও জ্যৈষ্ঠ ১৩১০, বামাবোধিনী পত্রিকা, ৯ নং আন্টনিবাগান লেন, ইন্ডিয়ান প্রেস।

১৩। শ্রী উমেশচন্দ্র দত্ত (সম্পা.), আশ্বিন ১৩১৪, বামাবোধিনী পত্রিকা, ৯ নং আন্টনিবাগান লেন, ইন্ডিয়ান প্রেস।

১৪। শ্রী উমেশচন্দ্র দত্ত (সম্পা.), ভাদ্র ১৩১৪, বামাবোধিনী পত্রিকা, ৯ নং আন্টনিবাগান লেন, ইন্ডিয়ান প্রেস।

১৫। শ্রী উমেশচন্দ্র দত্ত (সম্পা.), মাঘ ১৩১৪, বামাবোধিনী পত্রিকা, ৯ নং আন্টনিবাগান লেন, ইন্ডিয়ান প্রেস।

১৬। সুবল সামন্ত (সম্পা.), শারদীয় ১৪২৫, এবং মুশায়েরা : নারী ঔপন্যাসিক সংখ্যা, কলকাতা, এবং মুশায়েরা।

১৭। সুবিমল মিশ্র, আষাঢ় ১৪১৯, সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকা, কলকাতা, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ।

১৮। পুলককুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, সেপ্টেম্বর ২০১৮, রবিবাসরীয়, কলকাতা, আনন্দবাজার পত্রিকা।

ঘ। বৈদ্যুতিন তথ্য

১।
https://www.boishakhionline.com/659/%E0%A6%B6%E0%A7%88%E0%A6%B2%E0%A6%AC%E0%A6%BE%E0%A6%B2%E0%A6%BE-%E0%A6%98%E0%A7%8B%E0%A6%B7%E0%A6%9C%E0%A6%BE%E0%A7%9F%E0%A6%BE%E